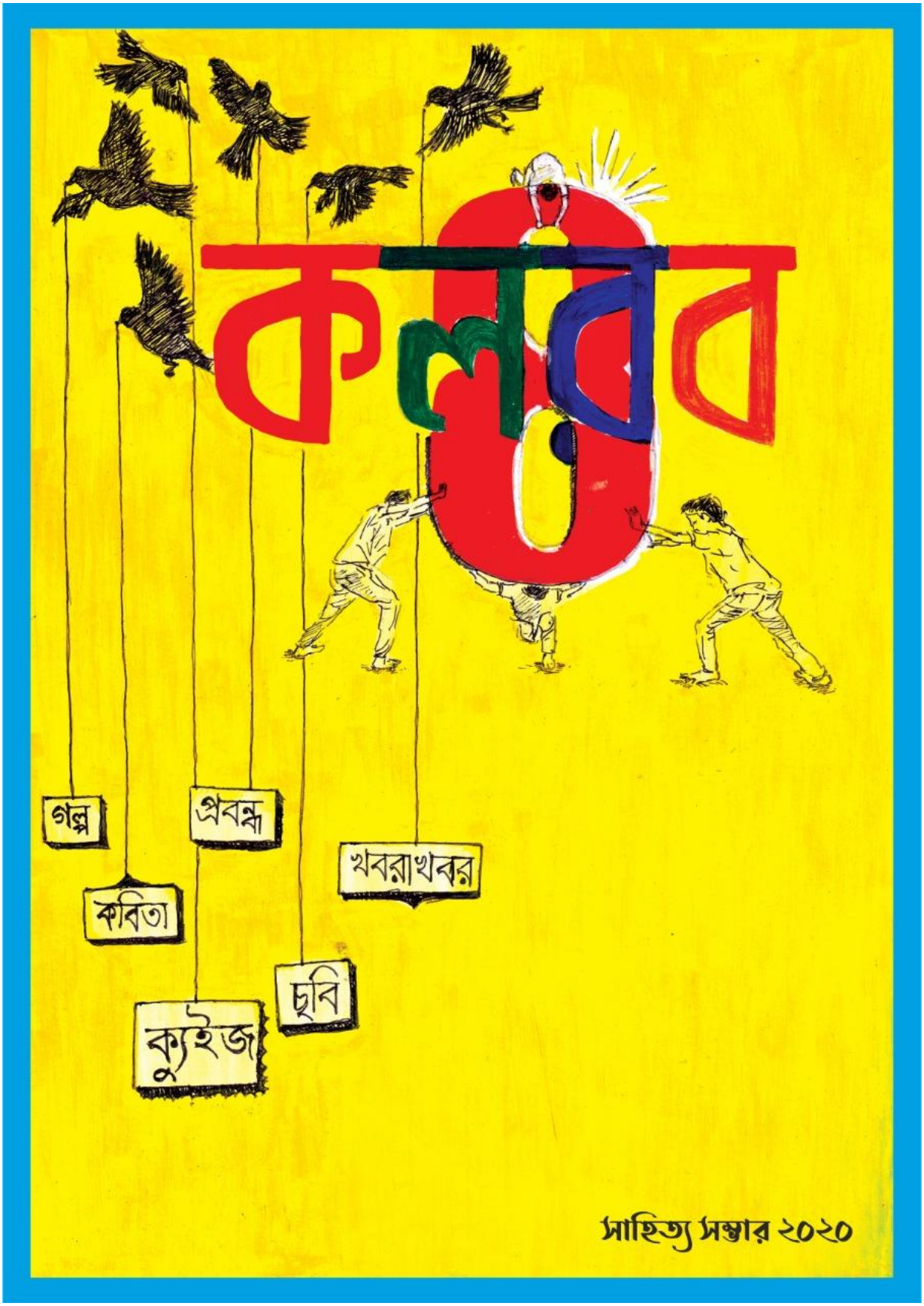
কলরব
গল্প
কবিতা
প্রবন্ধ
ক্যুইজ
ছবি
খবরাখবর
সাহিত্য সম্ভার ২০২০

কলরব

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

কলরব প্রকাশনী

কলরব এডুকেশনাল অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটি

আমডাঙ্গা * উত্তর ২৪ পরগনা

কলরব এডুকেশনাল অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটির পক্ষ থেকে
মো: রফিউল্লাহ্ কর্তৃক কলরব প্রকাশনী (আমডাঙ্গা, উত্তর ২৪ পরগনা) থেকে প্রকাশিত।

প্রচ্ছদ

রুপক ঘোষ

কলরবের নেপথ্যে

রুবিনা নাসরিন, রাসেদুল হক, মানবেন্দ্র সাহা,
আজহারুল ইসলাম, মোঃ আলী রেজা, রামিজ রাজা,
ফিরোজ আহমেদ, সুজাউদ্দিন মণ্ডল, সমীরণ সাপুই,
মোঃ নিজাম, সরফরাজ ইসলাম, ভাস্কর পাল

উপদেষ্টামণ্ডলী

সম্রাট মৈত্র, শমিক সেন, রেজাউল হক, ড. শেখ কামালউদ্দিন,
আহমেদ শাকির, ড. আসরফী খাতুন

কলরব সাহিত্য সম্ভার ২০২০ তে প্রকাশিত সমস্ত লেখাগুলির দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে লেখক/লেখিকার। যদি কোন লেখার সঙ্গে আংশিক বা সম্পূর্ণ মিল থাকে তবে 'টিম কলরব' কোনভাবে দায়ী নয়। প্রকাশনা সংস্থা ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোন অংশ কোন মাধ্যমের সাহায্যে কোনরকম পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত না মানলে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ISBN : 9788193843819

বিনিময় মূল্যঃ ন্যূনতম ৪০ টাকা

কলরবের কথা মুখ

চারে যে চমৎকার হয় তা সনাতন চলনের কাঙ্খিত প্রত্যাশা। আমাদেরও স্বকীয়তা ও সাধের সমাগমে লক্ষ্য বিশেষিত ছিল সেভাবেই। আকস্মিক অতিমারীর অভূতপূর্ব আক্রমণে সার্বিক যাপনের উপর নেমে এলো বহুমাত্রিক সংকট। আশঙ্কা আর অবকাশ হল সমার্থক। সমস্ত স্বাভাবিকতার প্রতি অবিশ্বাসের অবজ্ঞা যেন রোজনামচা। তবু এমনই কালবেলায় সৃজনের প্রতিস্পর্ধা নিয়ে চার বেলায় পা রাখল কলরব।

আয়োজনের প্রত্যাশিত আনুষ্ঠানিকতা এবারে রইল অনুপস্থিত। ব্যাধি শৃঙ্খলিত অনুশাসন মেনে হাতে -গরম সাহিত্য সম্ভার থাকলো ভবিষ্যতের উজ্জ্বল প্রত্যাশা হয়ে। সময়োচিত পন্থায় বর্তমানে কলরব উদ্ভাসিত হলো বৈদ্যুতিন সরণির বাতায়নে। জিয়ন কাঠি হয়ে দেখা দিল স্বজনদের নিরন্তর উৎসাহ ও অংশগ্রহণ। অন্ধকারের উৎস হতে আলো উৎসারিত হবেই। এই প্রত্যয় প্রাণে বপন করেই কলরব চারিদিকে হোক কল্লোলিত।

প্রকাশকের তরফে বিনীত অনুরোধ

‘কলরব এডুকেশনাল অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটি’ ‘দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট,1961’ দ্বারা স্বীকৃত একটি অলাভজনক সামাজিক সংগঠন। সারা বছর ধরে নানা সামাজিক কাজকর্ম করে থাকে এই সংগঠন। দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে কোচিং , 'পাঠযাপন' গ্রন্থাগার, কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা, ‘কলরব সাহিত্য সম্মাননা’ প্রদান ,বিনামূল্যে মকটেস্ট ,শিক্ষামূলক ভ্রমণ সহ আরো অনেক কিছু । কোভিড ১৯ মহামারী পরিস্থিতিতে শতাধিক পরিবারের হাতে খাদ্যদ্রব্য তুলে দিয়েছে এই সংগঠন ।

তাই আপনাদের সকলের কাছে বিনীত অনুরোধ দয়া করে এই পিডিএফ বা ই-বুক টি কারও সঙ্গে শেয়ার করবেন না । বিনিময় মূল্য দিয়ে তবেই পিডিএফ বা ই-বুক টি নেবেন । নিশ্চিত থাকবেন আপনার দেওয়া অর্থসাহায্য সামাজিক কাজে ব্যবহৃত হবে ---- কোন ছাত্র/ছাত্রী বই, খাতা বা সরাসরি অর্থ সাহায্য পেতে পারে অথবা ‘পাঠযাপন’ গ্রন্থাগারে নতুন বইয়ের সংযোজন হতে পারে। কলরবের হাত শক্ত করুন। কলরব পরিবারের পাশে সর্বদা আপনারা থাকবেন এই আশা রাখি।

Pdf বা e-book নিতে চাইলে নিচে প্রদত্ত সোসাইটির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে নূন্যতম ৪০ টাকা পাঠিয়ে স্ক্রিনশট ৮২৭৬৮৩৯৩৮০ নম্বরে বা facebook.com/kolorobecs এই ফেসবুক পেজের ইনবক্সে পাঠিয়ে দিন। Pdf বা e-book আপনাকে হোয়াটস অ্যাপ বা ই-মেলের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

Account Name : Kolorob Educational and Cultural Society

Bank Name : HDFC Bank Ltd.

Account No : **50100383733271**

IFSC : **HDFC0000352**

প্রাণিত বার্তা

ISSN 2394-5656

LALPARI NILPARI

No. WBBEN 11950/25/1/02/TC/439
Editor : **Asrafi Khatun**
Sub. Editor : **Layek Mainul Hoque.**
A.L. Mitra Lane, Tikepara, Near B.C. Road
Barabazar Masjid, Bardhaman-713101
(W.B), India.
Mob :- 9434330603, 9474041653

আই এস এস এন ২৩৯৪-৫৬৫৬

লালপরি নীলপরি

(শিশু পত্রিকা)
সম্পাদক - আসরফী খাতুন
সহ সম্পাদক-লায়েক মইনুল হক
পত্রিকা দপ্তর ঃ- মেঘনা, ৭২ বি. সি. রোড (সি. এম. এস. স্কুল সন্নিকট) পোঃ, থানা+জেলা ঃ- বর্ধমান-৭১৩১০১, (পঃ বঃ) ভারত, মোঃ- ৯৪৩৪৩৩০৬০৩, ৯৪৭৪০৪১৬৫৩

শুভেচ্ছাবার্তা

Date ২৪.৯.২০২০

মাননীয়
সম্পাদক মণ্ডলী
কলরব পত্রিকা
আমডাঙ্গা
উত্তর ২৪ পরগনা

টিম কলরব সম্পাদিত বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকা (চতুর্থ সংখ্যা) প্রকাশিত হবে শুনে উৎসাহিত বোধ করছি। সাহিত্য ও সমাজসেবামূলক কাজ অবশ্যই সামাজিক সুস্থতারই নামান্তর। সেই কাজ করে চলেছে এই 'কলরব' পত্রিকা। অন্যান্য কলরবে হারিয়ে না গিয়ে তারা তাদের দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে সচেতন থেকে সমাজকে উদ্বুদ্ধ করছে।

'কলরব' পত্রিকার সকল সদস্যদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। পত্রিকাটির শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক। ফুলে ফলে একদিন মহীরূহ হয়ে উঠুক এই 'কলরব' নামাঙ্কিত সদ্য অঙ্কুরিত চারাগাছটি — এই কামনা করি।

আসরফী খাতুন
২৪.৯.২০২০

DR. ASRAFI KHATUN
HEAD
DEPARTMENT OF BENGALI
JAMALPUR MAHAVIDYALAYA
PURBA BARDHAMAN

সূচিপত্র

চার এ চমৎকার

মা	কেয়া বাগচী	২
চৌমাথায়	সম্রাট মৈত্র	৪
চারমগজ	দীপিতা সেনগুপ্ত	৮
রামায়ণের চারমূর্তি	কাজরী পাত্র	১১

অগ্রপথিকের চার- আশিস

চার এ দিল পা	মহঃ নিজামউদ্দিন	১৫

কিশলয়ে কলরব

পাশের বাড়ি	রুকসানা খাতুন	১৯
এই পথ	তানিশা মীর	২০
ঘুরে দাঁড়াও প্রতিবার	ডলি শবনম	২১
আমার জীবনে লকডাউন	চৈতালি বেরা	২৩

কলরবে কলমকারী

ভেবে দেখেছো কি?	শেখ নিয়ামত ইসলাম	২৮
ওদেরও যে খিদে পায়	সাহা শোমী	২৯
রঙের বিন্দু	শ্রীজা দত্ত	৩০
যাপন	অঙ্কিতা চক্রবর্তী	৩১
সময়টা যে এমন	রিংকু নস্কর	৩৩
ফিরে এসো	অনির্বান ঘোষ	৩৪
বেঁচে থাকে শতাব্দীর গভীরে	সাবির আহমেদ হালদার	৩৫
সুখ	ধ্যানেশ	৩৬
নীল- নিশ্চুপ অভিমানী	অমিত্রজিৎ	৩৭
আমার জীবনে লকডাউন	সুমন বাজ	৩৮
ক্লান্ত বিকেল	সুকান্ত দাস	৩৯
খিদে	মেকাইল মন্ডল	৪০
সমুদ্রস্নান	রথীন পার্থ মন্ডল	৪১
সতর্কবাণী	চন্দন সুরভী নন্দ	৪২

ভাল লাগে	শেখ খায়রুজ্জামান ইসলাম	৪৩
স্বপ্ন	আসরফী খাতুন	৪৪
আড়াল	সাহিনুর রহমান	৪৬
ক্ষমা কোরো	মহঃ আজাহারুল ইসলাম	৪৭
হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট	সুমাল্য মৈত্র	৪৮
ছলা- কলা	স্বপন রায়	৪৮
একমুঠো চকলেট	পল্লবী সেনগুপ্ত	৪৯
জলরং	অনন্যা দেবরায়	৫১
একটি নদীর জন্ম	আহমেদ সাকির	৬০
আত্মহত্যার আগে	মৌমিতা ঘোষ	৭১
কনকাঞ্জলি	ঈপ্সিতা মিত্র	৭৮
ব্যাধি	স্বাতী মুখার্জি	৮৫
রাত জাগা ভোর	প্রতীতি চৌধুরী	৮৭
গল্পটা আম্লিক	উন্মনা মুখার্জি লাহিড়ী	১০৪
নতুন ঠিকানা	প্রিয়া ভট্টাচার্য্য	১০৮
সূর্যশেখর ও ডাইনিবুড়ি	শ্রীমন্ত দে	১১২
গুড ফ্রেইন্ড	মানবেন্দ্র সাহা	১১৮
আমার জীবনে লকডাউন	জয়ন্তী মুখার্জি	১২৬
আমকথা	রজত দত্ত	১২৭
একানব্বই বছরে টিনটিন	উত্তীয় ভট্টাচার্য	১৩৬
আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষণা	অরুণ কুমার ঘোষ	১৪১
আঁকিবুঁকিতে কলরব		১৫৪

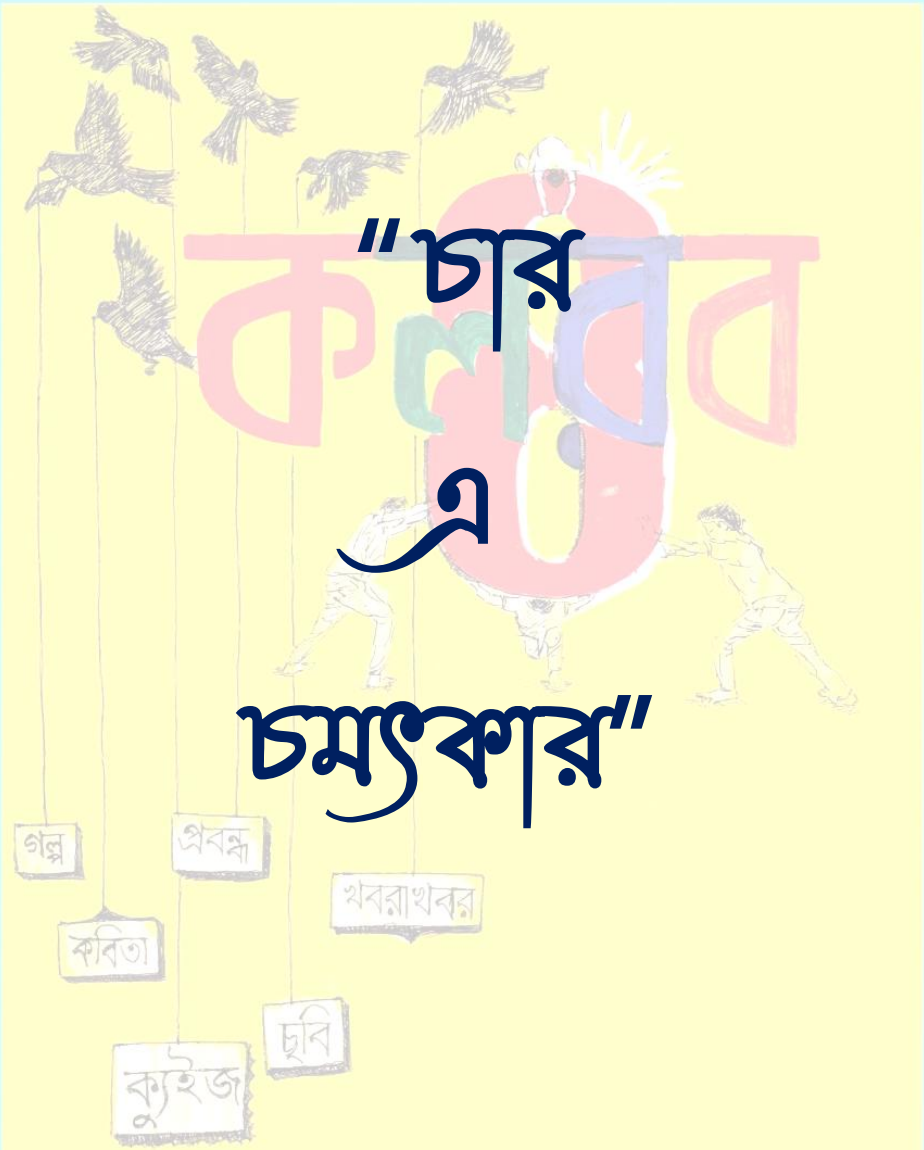
"চার
এ
চমৎকার"
গল্প
প্রবন্ধ
খবরাখবর
কবিতা
ছুবি
ক্যুইজ
সাহিত্য সম্ভার ২০২০

মা

কেয়া বাগচি

সরগমের চতুর্থ সুর হল মা। আবিশ্বে মা-এর মতো সমৃদ্ধ শব্দ বিরল। এমন তার সুরতান। এমনই তার ঐশ্বরিক মহিমা। পৃথিবীর প্রায় সকল মা একটি বিশেষতম একক উচ্চারণ। সকল জনগোষ্ঠীর শুদ্ধতম আবেগ ধরা দেয় এই শব্দে।

মা-কে ঘিরে আবেগের অনুরণন সকল ভৌগলিক সংকীর্ণতা ছাপিয়ে। সভ্যতার উষালগ্নে মাতৃতান্ত্রিক অভিধার গরিমায় দৃপ্ত ছিল মানবসমাজ। মৃত্তিকা, কর্ষণ ও ফসল; সকল উপাচার জুড়েই ছিল যেন নারীর মা হয়ে ওঠার যাপন। দ্য গডেস অফ কাল্ট অ্যান্ড ফার্টিলিটির প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে সিন্ধু সভ্যতার ' মাদার গডেস' ; মা রয়েছেন সেই তখন থেকেই।

মানবযাপন ধারন করে চলা ধর্মপ্রবাহে মা রয়েছেন স্বমহিমায়। তাই বুঝি মাতৃরূপে পূজিতা বিবিধ দেবীকল্পের কাছে মানুষ শক্তি ও সাহস কামনা করেছে। চেয়েছে চরণতলে লুটিয়ে শুভাশিস। ইসলামে মা বন্দিত হয়েছেন সুউচ্চ আদর্শে। পবিত্র কোরান ও হাদীশে মা-কে প্রদান করা হয়েছে এক অনন্য আসন। বাইবেলে মা মেরী হয়েছেন করুণা ও প্রেমের চিরন্তন আশ্রয়স্থল।

শিল্পীর অনুপ্রেরণায় উদ্ভাসিত হয়েছে মায়ের অপার্থিব রূপ। অসংখ্য মন্দিরগাত্রে রয়েছে মায়ের মুখচ্ছবি। মেদিনীপুরের আনন্দপুর গ্রামে কলসীকাঁখে বাংলা মায়ের মূর্তি অথবা বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় মন্দিরে স্তন্যদানরত মাতৃরূপ যেন বহন করে সেই ঐতিহ্য। আঁটপুর মন্দিরে আমরা প্রত্যক্ষ করি মমতাময়ী মায়ের শিল্পসত্য। অবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যামিনী রায়, অতুল বসু প্রমুখ অসামান্য শিল্পীদের কল্পনায় মা এসেছেন বিভিন্ন অনুষঙ্গে। পটশিল্পে, নকশিকাঁথায়, ব্রত আলপনার বিষয় হয়ে মা রয়েছেন স্নিগ্ধ এক অভয়াদাত্রী হয়ে।

মহাকাব্যে মা বিবৃত হয়েছেন বিভিন্ন আবেগের মর্মস্পর্শী প্রকাশে। মা কৌশল্যার প্রাণাধিক সন্তানের বনবাসের সংবাদে শোকাতুরা জননীর আর্তি টলিয়ে দিয়েছিল অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ। তেমনি শতপুত্রের শোকে কাতর গান্ধারীর বিলাপে চৌচির হয়ে গিয়েছিল মহা-সমরস্থল কুরুক্ষেত্র। উত্তর রামায়ণে দেখি লোকনিন্দার ভয়ে

বনবাসে বিসর্জিতা সীতার আপন হিতাহিত নিয়ে অনুপল ভাবনাও নেই। তার যাবতীয় উদ্বিগ্নতা আসন্ন সন্তানের মঙ্গল নিয়ে। আবার যমজ সন্তানলাভের খবরে মাতৃত্বের আনন্দে বিলীন হয়ে যায় তার সকল গ্লানি। একইভাবে মাতা মেরি, বিবি ফতেমা ও মা যশোদার মধ্যে অনুপমভাবে আবর্তিত হয়েছে মা ভাবনার সকল উদ্বেগ, আশা ও আশঙ্কা। কুমারসম্ভবে কালিদাস দেখিয়েছেন কন্যা পার্বতীর মহাদেবের গলায় বরমাল্যদান প্রসঙ্গে মা মেনকার দোলাচল। বাংলার মধ্যযুগের সাহিত্যে মা এসেছেন কখনও অপার স্নেহময়ী অথবা অসহায় জননীরূপে। মঙ্গলকাব্যে, বৈষ্ণব ও শাক্তপদাবলীর মাতৃবর্ণনা আমাদের মনে বারবার কড়া নাড়ে। সাধক কবি রামপ্রসাদ তাইতো বলেছেন"মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই, মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে. . . । "বিশ্বকবির ভাষায় "জননী তোমার করুণ চরনখানি হেরিণু আজি অরুণরূপে" অথবা "তুমি মিলেছ মোর দেহের সনে, তুমি মিলেছ মোর প্রাণেমনে। "বন্ধনহীনা মাতৃকল্পনা আবার দেশজননী ও বিশ্বজননীও বটে। মাক্সিম গোর্কির কলমে অঙ্কিত মা এভাবেই হয়ে উঠেন বিপ্লবের আলোকবর্তিকা। আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের শৌর্যবৃদ্ধি হয়েছে এমনি কতশত মায়ের আত্মত্যাগের অমলিন কথা।

গঙ্গাও যেমন মা, পদ্মাও তেমনি। নদী-মাকে আঁকড়েই মানুষ যে গেঁথেছিল সমাজ-নোঙর। "মধুর আমার মায়ের হাসি" তাই যেন সঙ্গীত, ছায়াছবি, বিজ্ঞাপন ছাড়িয়ে ডাকটিকিটের দুনিয়াতেও। টুসু গানেও কন্যার ভবিষ্যত নিয়ে জিজ্ঞাসাও সেই মায়ের কাছেই। সন্তানের প্রথম সম্বোধন হল মা। মা আবার প্রথম শিক্ষাগুরু। বিশিষ্ট সঙ্গীতশিক্ষকেরা বলেন যেসব শিক্ষার্থীরা খোলা গলায় ' সা' বলতে পারে না, তাদের ' মা' দিয়ে শুরু করাটাই সহজ। কারণ এটিই যে তার প্রথম ডাক। সপ্তক থেকে সপ্তকে চলে জীবন। মা হয়ে থাকে যাপনের পরম ধ্রুবপদ।

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

চৌমাথায়

সম্রাট মৈত্র

চৈত্র ভিম বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ইস্টবেঙ্গল রং ছড়িয়ে। তার চারিদিকে এখন অভূতপূর্ব নীরবতা। সন্ত্রস্ত জীবন এখন বাধ্য হয়েছে বন্দী ভূমিকা পালন করতে। একটা কাক এখন মাঝখানে উড়ছে, বসছে, লাফাচ্ছে, খুঁজছে। এই অদ্ভুত অবসরে ধুলো সরে স্মৃতিগুলো বার হতে চাইছে। অকারণে পিছুটানে স্ফটিক দানার মতো গল্পের মিছরি চিকচিক করছে কাকের ঠোঁটে। চৌমাথা আলস্য ভরে সেগুলো দেখতে লাগলো।

এক

আবিরে কাসরে মুখর মধ্যরাত্রি। স্বপন বুড়োর হাত থেকে সাজাদ ভাই তেরঙ্গা টা নিয়ে ভিকট্রি ল্যাপ দিতে লাগলো। তারই মধ্যে ঘুমঘুম চোখেভিড়ের মধ্যে রাহুল দা কে বলল তুমি না মদন লাল এর মত খেলো। ওদিকে কচি আর আরমান জিমি জিমি আজা আজা গাইছে। লর্ডসের বারান্দাতখন হাবুদের গাড়ি বারান্দার তলায় রাখা টিভি সেটে। কপিলের হাতে বিশ্বকাপ।

দুই

থরথর কাঁপছে মানুষটা। তার মাথাটা চাইছে সবাই। নেকড়েরা যেমন ভেড়ার পরম্পরায় পাপ খুঁজে নিতে চায়। কিন্তু এরা তো মানুষটার রোজনামচার কৌতুক কথকতার সঙ্গী। আজ তাদের চোখে ঘৃণা জিভে রক্ত। আসলে সিংজী তখনো জানতেন না অক্টোবরের একত্রিশ 1985 দিনটি ছিল অন্যরকম।

তিন

"রাজার ব্যাটা রাজা হয়, মোদের ভুলে সুখে রয়!"

আলাদা করে এটাই সবার মনের কথা। মিত্রদা চায়ে চুমুক মারতেন। তালে তালে নাচত পা জোড়া। আয়েসের অথবা আত্মবিশ্বাসে জোয়ার এলে এমন ছিল মিত্রদার সংকেত। মাথা রাজেশ খান্নার ছটা বাজতে পাঁচ করে বলতেন"...আই হেট দোজ

কুমীরের কান্না। "সবাই টুকুনকাকুর চায়ের বেঞ্চেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলত" আপনি বাঁচলে. . . । "তারপর সেইদিন আসলেই দোকানটাই বেবাক উধাও! দেশবরেন্য দশের অভিবাদন নিচ্ছেন সেখানেই। পাহারা কড়াকড়িতে নজরকারা। এলেবেলে পাবলিক অফ রিপাবলিক সব চাররাস্তার চারপাশে বেড়ার ওপারে। চৌমাথা অবাক হয়ে সেখানেই মিত্রবাবু ও বাকিদের ঘাম চকচকে গদগদ চোখে হাততালি দিতে দেখেছিল।

চার

ওরাই ছিল। খবর নিয়ে এসেছিল। জনপ্রিয় সমাজসেবী নিহত। প্রতিবাদের খড়পুতুলে ছ্যাঁকা খাচ্ছিল চৌমাথা। যেমন ইঁটপাথর লাঠি খেয়েছিল কোথাকার জমি দখলের জল চারমাথায় গড়িয়েছিল বলে। অনেকে কাজে যাওয়ার বদলে আনন্দ ও অস্বস্তির আবেগে কাটাকুটি খেলে বাড়ীমুখো হত এসব দিনে। তারপরে ঘরের ছেলে ঘরের মাঠে খেলতে পারবে না বলে সেই ওরাই চৌমাথায় গুছিয়ে শুয়ে খচাখচ ছবি তুলতে দিল। ওদিকে নাম ও মানছাড়া কতজন এসবে আটকে কত কিছু সত্যিই হারিয়ে ফেলত। চৌমাথা জানে ওরা এভাবেই সবাইকে ওয়াকিবহাল রাখতে চাইত। ওদের -ও "নইলে আমি নেই" কষ্টটা এভাবেই কম থাকত।

পাঁচ

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসে দূরপাল্লার বাস টা। সাদা নীলের তোলা হাত কেয়ার না করে। মাধ্যমিকের ফলে মাতোয়ারা কিশোর টাও সাইকেলে ছিল বেখেয়ালে। উড়ে পড়েছিল শরীরটা। ঝটপট হাসপাতালে চেষ্টা হলো। বাস পোড়াও দাবি উঠলো। মৃদু গলায় কি যেন বলল কারা? বোধ হয় যার গেল তার গেল রকমের কিছু।

ছয়

কুড়ি পাঁচ এ জিতছে সে। এখন বারাসতের দিক থেকে দশটা লরি আসলেও নিশ্চিন্ত। আরে বাবা এর নাম অভিজ্ঞতা । চৌমাথার উপরে বললে ব্যাকরণ এ ধরবে অথবা পড়বে শিখা মিসের গাট্টা। তাই কায়দা করে বলে তাদের বাড়িটা উত্তর কোণে ফিল্ডিং করে। লোডশেডিংয়ের বারান্দায় ভাই-বোনেদের সেভেনের বিজ্ঞ দাদা আগেই কলকাতার দিক নিয়েছিল। কেল্লাফতে। কলকাতার দিক থেকে 21 নম্বর লরি আসছে দেখে সে হালুয়া ওয়ালা আগেয়া গানে গলা ছাড়লো।

সাত

নাচ জানতো বটে মাইকেল। সে বচ্চনের ক্যাটারিং এর পাতা দেওয়া বল আর রাজেশের এক হাত তুলে এক পাক খাওয়াই বল। চক্রবর্তীর ডিস্কো পাবে পশ্চিমের দেবদারু গাছের তলায় শনিবার সঙ্গে আবার শোলে থেকে কালিয়া ডায়লগ। সিটি তালি আর খুচরো খেলত খুব। গাছটা কাটা পড়তেই। গাছটা কাটা পড়তেই মাইকেল মোর ছাড়া হল। কোথায় গেল? মনে আছে সে বলতো আই এম কলাকার মি সব জায়গায় দরকার।

আট

দরকার আছে বলেই ফিরে আসে। সুরোজ মোহনের কাচি চিরুনির বেঞ্চি চেয়ার, ইসমাইলের তুলো বালিশের চৌকি, স্যামসাং ফলের বাক্স মাঝেমধ্যেই তাড়া খেয়ে চারদিকে লুকিয়ে পড়তো। রাস্তা চওড়া ফতোয়া হাওয়া গরম রেখে দিত কদিন। তারপর পথ আরে বহরে যাই বদলাক, সাবধানী পায়ে ফিরে আসত সবাই। দরকার কখন মায়া তৈরি করে তা কি আগে থেকে বোঝা যায়?

নয়

লজ্জা না সংকোচ বোঝা দায়। একজনের মনে হয়েছিল দারুচিনি দ্বীপের ভিতর শ্রাবস্তীর কারুকার্য। অপরজনের চোখ কেড়েছিল উন্নত মম শির চেহারাটা। একজন বলেছিল এই ব্যাগটা তোমার। পছন্দ না হলেও আজকের জন্য নিতেই হবে। অন্যজন আশ্বাসের হাসিতে যোগ করেছিল শুধু আজকের নয় সবসময়ের জন্য নিলাম। এই পেনটা রাখ। আজকের গল্পটা এটা দিয়েই লিখ। হাতে হাত রেখে বাসে ওঠা হল। সেই প্রথম যুগলের সপ্তমীর কলকাতা অভিযানে।

দশ

অচলা উকুনে মাথা ঘষে ঘষে চুলকাতে থাকতো। ফাঁকা ভ্যান স্ট্যান্ডে ঘাওড়া পচা কেক, নেতানো বিস্কুটের টুকরো, পোকায় কাটা আপেল ঝুড়িতে তুলে নিত। নানি বুড়ি আপন মনে গান গাইতো হারান রে বাবা কোন মাছটা খাবা। দেবরাজ রাতকে

বিড়বিড় করে জিজ্ঞাসা করতো তেরা গালতি না মেরা কসুর? নিশিতে নিশ্চিন্তে চলত এদের নিশিযাপন। শুধু কিছুদিন পর নাম আর নাটকের ভঙ্গিগুলো যেত পাল্টে।

ধুলো খোটা বন্ধ করে কাকটা উড়ে গেল। মিছরি দানা গুলো আবার গেল মিশে । যাক ওরা ফিরে যাক চারিদিকে। চার রাস্তা থেকে নতুন গল্প এসে জড়ো হবে আবার। অন্ধকার গাঢ় হলে নাকি সূর্যদয় আসন্ন? চৌমাথা অপেক্ষা করতে লাগলো নতুন গল্প গুলোকে একে অপরের সাথে মিশিয়ে দেওয়ার জন্য।

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

চারমগজ

দীপিতা সেনগুপ্ত

বেশ অনেকদিন অবধি চারমগজ এর অমন নাম হল কেন বুঝতাম না। প্রথম প্রথম ভাবতাম বুঝি চার ধরনের উপকরণ বেটে ওই সাদা থকথকে পেস্ট বানানো হয়; পরে মুজতবা আলীর উপন্যাস পড়ে জানতে পারি এ আসলে তিন ধরনের বীজ (আখরোট, শসা, কুমড়ো) বেটে তৈরি হয় এবং এর আসল নাম চহারমগজ। যাহোক আজকে লেখার বিষয়ঃ চার নারীর মগজ, এদের মধ্যে একজন পাগল, একজন চোর, একজন জুয়াচোর আর অপরজন প্রেতাত্মা। উনিশ শতকে বাংলা চলিত গদ্যরীতির প্রবর্তক ছিলেন প্রমথ চৌধুরী। শুনেছি তিনি এবং তার স্ত্রী এমন পন্ডিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে নিজেদের মধ্যে ফরাসি ভাষায় রসালাপ করতেন। এই চারটি মগজ তাঁরই উপন্যাস ' চারইয়ারী কথা' র চার নারীর।

পাগলের কথা

এক জ্যোৎস্না বিধৌত রাতে পাগলটি রাস্তায় একা একা পায়চারি করছিলো। সেনও (চার ইয়ারের এক ইয়ার) তখন তার কল্পলোকে কোন ডেসডিমোনা কি বিয়াত্রিচ কে প্রত্যাশা করে এগিয়ে আসতে আসতে পাগলিনির দেখা পায়। এ দৃশ্যে পাগলিনী প্রথমে সেনকে দেখে মৃদু হাসে, তার চোখ হীরার মতো ঝকঝক করে। পরক্ষণেই শরীরের যাবতীয় যন্ত্রণা, কাতরতা তার মুখে ঝলকে ওঠে। সেন এর বিবরণ শুনলে বোঝা যায় যে এমন সৎ তার যন্ত্রণা যে তা যেকাউকে বাধ্য করবে তার কোমল নরম হাত দুটি নিজের হাতে টেনে নিতে। কিন্তু পরক্ষনেই পাগলিনি হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়ায়, তখন তার চোখে ফোটে ভয়! চার পাঁচ জন ইংরাজ তাকে তাড়া করলে সে চিৎকার করে ওঠে। তারা তাকে ধরে সেন-এর সামনে নিয়ে এলে সে হো হো করে হেসে ওঠে।' Love is both mystery and a joke' এ উক্তির যাথার্থ্য ফুটিয়ে তোলেন লেখক পাগলিনীর নিমেষে ভাববদলের মধ্য দিয়ে তার অসামান্য দক্ষতায়। এটিই সেনের প্রথম ও শেষ ভালোবাসা হয়ে থেকে যায়।

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

চোরের গল্প

সীতেশের (দ্বিতীয় ইয়ার) সঙ্গে চোরনীর দেখা হয় একটি বইয়ের দোকানে। সেখান থেকে আলাপ এগোতে থাকে এবং সেই স্থানে ও কালেই চোরটির হাতে সীতেশ তার হৃদয় সঁপে বসে থাকেন।কিন্তু শেষ দৃশ্যে চোরনী তার মোক্ষম উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে কেটে পড়ে। সীতেশের পকেট কেসে থাকা পাঁচটি গিনি হাওয়া হয়ে যায়! সীতেশের কাছে থেকে যায় কেবল একটি চিঠি, তাতে লেখাঃ' পুরুষ মানুষের ভালবাসার চাইতে তাদের টাকা আমার ঢের বেশি আবশ্যক'। সীতেশের কাব্যলোলুপ মায়ানিবিড় দুনিয়ার প্রতি এই ঘটনা একটি সপাট চড়।

জুয়াচোর এর সিজন

আগের দুই চরিত্রের ক্ষেত্রেই একটি নির্দিষ্ট দিনের গল্প বলা হয়েছে। কিন্তু এর পরবর্তী দুটি ঘটনাতেই কয়েকটি ভিন্ন এপিসোড রয়েছে। অর্থাৎ তাদের গরল ঢালতে বড় একটা ঝটিতি নেই। সোমনাথকে (তৃতীয় ইয়ার) একটি জার্মান মা-মেয়ে জুটি ' শাস্ত্রজ্ঞ' ভেবে তার গলায় ঝুলে পড়বার চেষ্টা করছিল। তাদের থেকে এই জুয়াচোর ওরফে রিণী তাকে উদ্ধার করেছিল, হেসপারাসের মতো। এই সন্ধ্যাতারাটি প্রথম দৃশ্যে এক রেস্তোরাঁয় সোমনাথ ও জার্মান মহিলা জুটির টেবিলের পাশের টেবিলে বসে ছিল তার প্রেমিকের সঙ্গে। সেখান থেকে সোমনাথের টেবিলের দিকে সে কড়া নজর রাখছিল। শেষমেষ সোমনাথকে উদ্ধার করে সে হোটেলের ঘরে গিয়ে দাবার ঘুঁটি সাজিয়ে বসে। এতে তার প্রেমিক বেশ ক্ষুব্ধ ও ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে। জুয়াচোর ভদ্রমহিলা ভালো করে জানতেন যে জার্মান পুরুষরা ঈর্ষা অর্থাৎ জেলাসি কেই ভালোবাসার মাপকাঠি মনে করে, তাই তিনি বেশ কয় মাস ধরে সোমনাথকে ভালোবাসার ভান করে শেষমেশ তার জার্মান প্রেমিককে চরম ঈর্ষান্বিত ও উত্তেজিত করে বিবাহ করতে বাধ্য করে। এই এপিসোডের শেষে সোমনাথের মুখে আমরা এই উক্তি শুনিঃ ' পৃথিবীতে যে ভালোবাসা খাঁটি তার ভিতরে পাগলামি ও প্রবঞ্চনা দুইই থাকে, ওইটুকুই তো ওর রহস্য।' আসলে এই সত্য হয়তো আমরা সকলেই জানি কিন্তু স্বীকার করতে চাই না কখনও। ভালোবাসার মানুষের প্রতি এক অভিকর্ষ বল আমাদের চোখের সামনে ধরে দেয় একটি রঙিন পর্দা, যে কারণে আমরা এই সাদা-কালোর ডুয়ালিটি কে অস্বীকার করে এক মেকি সুখ লাভের আশায় থাকি।

প্রেতাত্মার সিজন

এই গল্পটি শুরু হয় যখন তখনও প্রেতিনী মরে নাই। সে ছিল গল্পের কথক রায়ের দাসী। তারা দুজনেই মনে মনে একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যেকার সামাজিক দূরত্বকে লঙ্ঘন করে তারা কখনো কাছে আসতে পারেনি। কিন্তু দাসী মেয়েটি আশা ছাড়েনি। সে তার মালিকের বইগুলি পড়ে নিজেকে শিক্ষিত করে তুলছিল। একদিন রায় (চতুর্থ ইয়ার) সেই স্থান ছেড়ে কলকাতা ফিরে আসলে দাসীটি নার্স হয়ে কলকাতা যাওয়ার কথা পর্যন্ত ভাবে, কিন্তু ইতিমধ্যেই তার যক্ষ্মা হওয়ায় তাকে দেখতে হয়ে যায় বট্টিচেলির ছবির মত - লম্বা লম্বা আঙ্গুল, শীর্ণ দেহে বড় বড় চোখ। সেখানে এক ডাক্তার তাকে স্নেহ ও সেবা যত্ন করে সারিয়ে তোলে ও পরে তাকে বিবাহও করে। ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে তারা ডাক্তার ও নার্স জুটি হিসাবে গিয়ে জার্মান গোলায় নিহত হন। মরে প্রেত হয়ে যাওয়ার পরেও মেয়েটি দেখে, পূর্বে যেভাবে রায় অর্থাৎ তার মালিক তার দেহ ও মন অধিকার করে ছিল ঠিক তেমনই রয়েছে প্রেতিনীর দেহে-মনে।

চারটি ইয়ারের গল্প আসলে একেকটি রূপকথার মত তবে প্রতি ক্ষেত্রেই আমরা সমানভাবে বিব্রত হই। বাস্তবেও রূপকথা ও বিভ্রাট হাত ধরাধরি করে চলে। প্রকৃতির আকস্মিকতাকে চেতনার মুঠোয় ধরে ফেলবার ক্ষমতা আমাদের এখনো হয়নি- প্রতিটি গল্পেই রয়েছে এ সত্যের ছাপ। যাহোক, এই চার মগজ এর অনুপ্রেরণা আসলে লেখকের পরিচিত একজন নারীই, তার নাম কাতি (katie), তবে সে কোন রকম চুরি-চামারির সঙ্গে যুক্ত ছিল না। সে ছিল এক ক্রিমিনালের মেয়ে। এই কাতিকে ভেঙেই এই চারটি নারী লেখকের কলমে আসে। তাঁর পাণ্ডিত্য ও কল্পনাশক্তিই চারদেওয়ালের মধ্যে নানান বহির্বিশ্বের দৃশ্যকে ধরে দেয়।

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

রামায়ণের চারমূর্তি

কাজরী পাত্র

মহর্ষি ঠারে ঠারে ভাতৃপ্রেমের গূঢ় তত্ত্বটি বুঝিয়ে গেছেন একটি গোটা মহাকাব্য জুড়ে, রামায়নে নানান জটিল ডিসকাশন থাকা সত্বেও আমার কিন্তু সবসময়ই মনে হয়েছে এটি আদতে চার ভাইয়ের গল্প। এক হিসেবে দেখতে গেলে সম্পর্কের মাত্রা গুলো মহাভারতের চেয়ে বেশি দৃঢ় রামায়নে, রামায়ণ হতে যুদ্ধটুকু বাদ দিলে থাকে চার ভাই; এবং যুদ্ধ নাকি রাবণ নিজেই চেয়ে ছিলেন: যদি রাম এবং তার তিন ভাই সাধারণ মানুষ হন, তবে সীতা রইল রাবণের হাতে নতুবা রাবণের ভাগ্যে ঘটবে দেবতার হাতে মৃত্যু (অর্থাৎ নরক বাসের অর্ধেক ভাগ ডিসকাউন্ট)। সেই হিসেবে, আমরাও যুদ্ধকে যদি রাবনের সাথেই আমাদের আজকের আলোচনা থেকে সরিয়ে রাখি, তবে রইল পড়ে চার দাশরথি।

'চারমূর্তি' তো বললাম, কিন্তু দশরথ আর কৌশল্যার ছিল এক কন্যা, শান্তা। তিনি অবশ্য জন্মগ্রহণ করেন চার ভাইয়ের বহু আগে। অঙ্গদেশের রাজা, রোমপদ, সন্তানহীনতার কারণে মনোকষ্টে ছিলেন এবং বন্ধুর দুঃখ দূর করতে অযোধ্যারাজ দশরথ অঙ্গদেশের রাজা ও রানীর হাতে সমর্পণ করেন নিজ কন্যাকে। রাজা রোমপদ এবং রানী বর্ষিণী অত্যন্ত যত্নে প্রতিপালন করেন শান্তাকে, যিনি পরে ঋষ্যশৃঙ্গকে বিবাহ করেন।

কিন্তু এদিকে শান্তাকে দান করার পর, দশরথের সন্তান-সম্ভাবনা তলানিতে গিয়ে ঠেকলো। তার ওপর আবার শ্রাবণকুমারকে ভুলবশত মেরে ফেলায়, দশরথের ওপর খাঁড়ার মত ঝুলছে পুত্রশোকের অভিশাপ। এহেন সময়ে, ইংরেজিতে আমরা যাকে প্রফেসি বলি, সেই রকম বেশ কয়েকটি প্রফেসি পূর্ণ করার জন্য চার দাশরথির জন্মের ক্ষণ প্রস্তুত হয়ে এল। মনোরমা নদীর তীরে পুত্র-কামেষ্টি যজ্ঞ করলেন দশরথ। যজ্ঞের আগুন থেকে স্বয়ং অগ্নিদেব আবির্ভূত হয়ে এক নান্দনিক পায়েস দিলেন, যা খেলে রানীরা জন্ম দেবেন পুত্রসন্তানের।

কৌশল্যা আর কৈকেয়ী পায়েসের অর্ধেক ভাগ নিয়ে তা থেকে খানিকটা খানিকটা করে দিলেন সুমিত্রাকে। সিংহভাগ খাবার ফলে কৌশল্যার গর্ভে জন্ম নিলেন রাম, দুই

রানীর কাছ থেকে ভাগ পাবার ফলে যমজ সন্তান হলো সুমিত্রার। সূর্যবংশ-রঘুবংশ-ইক্ষ্বাকুবংশ আলোকিত করে জন্ম নিলেন চার ভাই: রাম, লক্ষণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন।

কথিত আছে, জন্মগ্রহণের পর শত্রুঘ্ন ও লক্ষ্মণ, সুমিত্রার দুই যমজ ছেলে, মহা কান্না জুড়ে দিল। সে কান্না থামার লক্ষণই নেই, দিনরাত এক করে কেঁদে চলেছে দুই ভাই। রাজগুরু বশিষ্ঠ বাতলালেন এক উপায়, দুই শিশুর দিকে তাকিয়ে তিনি বুঝলেন লক্ষ্মণ হলেন রামের এক অংশ, এবং শত্রুঘ্ন হলেন ভরতের। কৌশল্যার দেওয়া পায়েসের ভাগ থেকে লক্ষ্মণের জন্ম, আর কৈকেয়ীর পায়েসের ভাগ থেকে শত্রুঘ্নের। যেই মাত্র শিশু রামের পাশে রাখা হলো লক্ষ্মণকে এবং ভরতের সাথে শত্রুঘ্নকে, অমনি তাদের কান্না থেমে গেল এবং এইভাবে আজীবন রাম এবং লক্ষণ একই সাথে, একই দেহের দুটি অংশের মতোই রইলেন, ঠিক যেমন রইলেন ভরত ও শত্রুঘ্ন। বিষ্ণুর সপ্তম অবতার হলেন রাম, শেষনাগের অবতার লক্ষ্মণ, বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র এবং পাঞ্চজন্য শঙ্খ ভরত ও শত্রুঘ্ন রূপে জন্মগ্রহণ করেন।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে, হিন্দু দেব-দেবীদের সাধারণত চতুর্ভুজ রূপে রিপ্রেজেন্ট করার মুখ্য কারণ হলো, চার হাত অর্থাৎ চারটি দিকই দেবতার আয়ত্তের মধ্যে। যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া বেশিরভাগ সময়ই দেবতাদের হাত চারটি থাকে, যার দ্বারা বোঝানো যায় যে তাঁরা চারিদিকে বিরাজমান।

রামের জীবনের সাথে যেই প্রকারে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে লক্ষ্মণ, একইভাবে ভরত এবং শত্রুঘ্নও আজীবন সমস্ত অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছেন।

লক্ষণ ছিলেন সুদক্ষ কারিগর, এবং রাম ও সীতার বনবাসের সময় এবং লঙ্কার যুদ্ধে লক্ষ্মণের কারিগরী বিদ্যা বহুবার মুগ্ধ করেছে রামকে।

ধীর স্থির রামের আবেগপ্রবণ অংশ হলেন লক্ষ্মণ। অত্যাধিক ক্রোধ, ভালোবাসা এবং দুঃখ তাঁর অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ক্রোধবশত, লক্ষ্মণ রামের প্রতি আসক্ত শূর্পনখার নাক কেটে ফেললেন, সীতাকে ত্যাগ করার তীব্র সমালোচনা করেন তিনিই, আবার তিনিই রাম-বিনা জীবন ধারণ করবেন না বলে সরযূ নদীতে সলিল সমাধি গ্রহণ করেন। যমরাজের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাতের সময় যমরাজ রামের কাছে আশ্বাস চেয়ে নিয়েছিলেন যাতে দ্বিতীয় ব্যক্তি কক্ষে প্রবেশ করে বিরক্ত না করে। রাম

সম্মতি দিয়ে লক্ষ্মণকে দৌবারিক হিসেবে নিযুক্ত করলেন। এদিকে, বদরাগী দুর্বাসা মুনি এসে সমস্ত অযোধ্যার ওপর অভিশাপ দেওয়ার ভয় দেখাতে, লক্ষ্মণ অযোধ্যার বদলে নিজেকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়ে কক্ষে প্রবেশ করলেন দুর্বাসার আগমনের সংবাদ জানাতে। প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রাম লক্ষ্মণকে প্রাণে মেরে ফেলতে না পেরে, বশিষ্ঠের মতানুসারে ত্যাগ করলেন। রামের বিরহে সৌমিত্র আপনিই মৃত্যু বরণ করলেন সরযূ নদীতে। রামায়ণে রামকে নিয়ে বিস্তর চর্চা হলেও, তাঁর তিন ভাইকে নিয়ে অনুসন্ধান করতে হলে, রামায়ণের বাইরেও খুঁজতে হবে বৈকি!

লক্ষ্মণ বিবাহ করেন সীতার বোন ঊর্মিলাকে, যিনি অসাধারণ শিল্পী ছিলেন, এবং বনবাসের সময় ঊর্মিলাকে প্রাসাদে রেখেই লক্ষ্মণ বেরিয়ে পড়েন রামের সাথে। নিদ্রাদেবীর বরে লক্ষ্মণ না ঘুমিয়ে সর্বক্ষণ জেগে থাকতে পারতেন, এবং তাঁর বদলে তাঁর নিদ্রা পুরন করতেন ঊর্মিলা। এই বর লক্ষ্মণ চেয়ে নিয়েছিলেন রাম এবং সীতাকে পাহারা দেবার অভিপ্রায়ে। যুদ্ধে লক্ষ্মণ বধ করেন রাবনের দুই ছেলে, ইন্দ্রজিৎ এবং অতিকায়কে।

রাম অযোধ্যার রাজা হবার পর লক্ষ্মণ যুবরাজ হতে সম্মত হলেন না। কারণ বয়সে ভরত তাঁর জ্যেষ্ঠ। লক্ষ্মণের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে পরবর্তী জন্মে রাম কৃষ্ণ-রূপে লক্ষ্মণের অবতার বলরামের ভাই হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন। ইনফ্যাক্ট, জৈন রামায়ণ মতে লক্ষ্মণের হাতেই মৃত্যু ঘটেছিল রাবণের।

রামের পর বয়স অনুসারে আসেন ভরত। মন্থরার উপদেশে যদিও কৈকেয়ী রামের চৌদ্দ বছর বনবাস প্রার্থনা করেন, ভরত রামানুজ হিসেবে রাজ-কর্তব্য চৌদ্দ বছর পালন করার পর রাজ্য সানন্দে রামের হাতেই তুলে দেন। ভরত বিবাহ করেন জনক রাজার ভাই, কুশধ্বজের কন্যা মান্ডবীকে। দশরথের মৃত্যুর পর, ভরত রামের পরিবর্তে বনবাস স্বীকার করতে চেয়ে রামকে ফিরিয়ে আনার জন্য দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হন। সেমতাবস্থায়, রাম ভরতকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফেরত পাঠালে, ভরত রাজসিংহাসনে রামের পাদুকা দুখানি রেখে রাজ্যচালনা করতে শুরু করলেন। রামের তুলনায়, চৌদ্দ বছর পর, ভরত রামের অধিক রাষ্ট্র পরিচালনায় পারদর্শী হওয়া সত্বেও রাজ্যপাট রামের হাতে ছেড়ে তিনি যুবরাজের পদ গ্রহণ করেন।

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

রামায়ণে চার ভাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে সীমিত উল্লেখ শত্রুঘ্নের, যাঁর অপর নাম রিপুদমন। মান্ডবীর বোন শ্রুতকীর্তির সাথে বিবাহের পর তাঁদের দুই ছেলে হয়: শত্রুঘাতী এবং সুবাহু। ভরতের রাজ্যাধীনে, শত্রুঘ্ন রাজ্য পরিচালনায় ভরতকে সহায়তা করেছিলেন। তাছাড়া চার ভাইয়ের মধ্যে তিনিই একমাত্র যিনি সর্বদা প্রাসাদে থাকতেন তিন বৃদ্ধা রাজমাতার অবলম্বন স্বরূপ।

রামায়ণে শত্রুঘ্নের উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে, লবণাসুরকে বধ করা। মথুরার দৈত্যরাজ লবণাসুর শিবের বরে তাঁর ত্রিশূলের অধিকারী হয়েছিলেন। দেব-মানব-যক্ষ তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হওয়ায়, রামের সম্মতি নিয়ে শত্রুঘ্ন বিষ্ণু-অস্ত্র নিক্ষেপে বধ করেন লবণাসুরকে। বিষ্ণুর ৪১২-তম অবতার হিসেবে শত্রুঘ্নের উল্লেখ আছে।

সীতা পাতালে প্রবেশ করাতে রাম পৃথিবী ত্যাগ করে সলিল সমাধি গ্রহণ করেন এবং মহাবিষ্ণুর রূপে নিমজ্জিত হবার জন্য বিষ্ণুর শঙ্খ এবং চক্র অবতার দুই ভাইও সরযূ নদীতে প্রাণত্যাগ করেন।

কেবল এক প্রাসাদেই জন্মগ্রহণ নয়, চার ভাই জন্মে এবং মৃত্যুতেও পরস্পরের সাথে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রইলেন এবং উত্তরকাণ্ডের পর সরযূ নদীতে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে বিষ্ণুর বিভিন্ন অংশে পরিণত হলেন।

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

অগ্রপথিকের চার-আশিস

বিশিষ্ট শিক্ষক ও কবি মোঃ নিজামউদ্দিন সাহেবের অনন্ত অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে 'কলরব এডুকেশনাল অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটি' তাকে **'কলরব সাহিত্য সম্মান ২০১৯'** ও **'মরহুম মোঃ এমদাদুল্লাহ স্মৃতি স্মারক সম্মাননা'**য় সম্মানিত করেছে।

চার- এ দিল পা

মহঃ নিজামউদ্দিন

রামধনুকের চতুর্থ রঙ সবুজ, জানে তা সবে।
চারজন ছাড়া ' টোয়েনটি নাইন' কোথায় চলেছে কবে?
চার এক্কে চার, ধারাপাত কয়, চারে চারে হয় ষোল।
জীয়ন্তে নয়, জীবন অন্তে ' চতুর্দোলায়' তোল।
লুডোর ঘুঁটিতে র' বেই ' চৌকো' , নইলে হবে না খেলা।
শীতের বিকেলে চারটে বাজলে যাই যাই করে বেলা।
প্যাকেটের গায়ে চারটে মিনার, ভিতরে ' দশ মিনার' -
এ চারমিনার ফোঁকারা যোগাবে যমের লাঞ্চ- ডিনার।
চারঘাটা মোড়ে রীতিমত বসে পেল্লায় এক হাট।
বর্জ্য সরাতে চার ঝাড়ুদার নিয়মিত দেয় ঝাঁট।
পদাতিক- রথ- গজ- অশ্বই যুদ্ধের চতুরঙ্গ।
যুবা- যুবতীর চারি হাত এক- এ রচিত মধুর সঙ্গ।
চারিটি খুঁটিতে খাড়া যার ঘর সে মাঙে দুয়ারে ভিখ।
জলদমন্দ্রে এক মুহূর্তে কেঁপে ওঠে চারিদিক।
চতুর্ভুজের চার ভুজ আর আছেও চারিটি কোণ।
রাজভবনের চারধারই হলো পুরো 'সাইলেন্ট জোন'।
পুষ্করিণীর চারি পাড় জুড়ে লাগালে সুপারি চারা
সন্দেহ নেই, চার বছরেই ফলবতী হবে তারা।
যে 'হান্ চ্ ম্যানেজে', পরে চারি সায়া, অতি রোগা সেই বালা
কিভাবে মুটোবে, সুযোগের ঘরে ঝোলে যে চারিটি তালা।
কেউটে- গোখরো- বোড়া ও কালাচ- এ চারে ডরায় কে না?
সুযোগ এসেছে, চার হাত- পায়ে 'কাটমানি' লুটে নে না।
কলকেতে মেরে চার টান যেন সেজ না বন্ধু রুগী।
চাম খুলে তা'লে জরু বানাবেন চারখানা ডুগডুগি।

চারদিককার লোকেরা বুঝেই করোনার হীন ফন্দি,
হাতে নিয়ে সোপ রয়েছে এখনো চার দেওয়ালেই বন্দী।
চারি অন্ধের হস্তি দেখার গল্প হাসিরই বটে।
'শুভদৃষ্টি'তে চারি চক্ষুর মধুর মিলনই ঘটে।
চারি বেদে যিনি খুবই অভিজ্ঞ তিনিই চতুর্বেদী।
চতুষ্পদ উট 'নহরে'র কালে চেঁচায় অভ্রভেদী।
ইসলামে চার কিতাব নাজিল, চতুর্থ ফোরকান।
এই চারই নয়, আগে আরো ছিল, অনেকের অনুমান।
চার মজহাবের চার ইমামের অনুসারী ছিল কত!
আজ মৃত্তির মেহমান চারই, একে একে হয়ে গত।
ইংরেজি মাস এপ্রিল তোর চারেই গন্ডি কাটা- - -
চার থেকে তুই পাঁচে- ছয়ে যাবি, আছে সে বুকের পাটা?
চারেই থাক রে, ফি সনে যেমন থাকিস ক্যালেন্ডারে।
তোর ওই চারের লক্ষণরেখা কেউ কি মুছতে পারে?
করিস না খেদ, তোর চারে চার মিলিয়েই 'কলরব',
এক লাফে গেল তিন থেকে চারে, মানল না পরাভব।
আবার দেখিস, একুশ- এ কেমন তোকে সে পিছনে ফেলে,
দর্পিত পদে চার থেকে পাঁচে পৌঁছায় অবহেলে।
যেহেতু তোর ওই লক্ষণরেখা নেইকো সুমুখে তার,
সেহেতু ছুটবে এই 'কলরব সাহিত্য সম্ভার'।

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

শুভেচ্ছা ও উৎসাহে

AQUAA LIFE™
A - Z Water Treatment Solutions

Kitchen Life™
Chimney & Moduler Kitchen

৩০% ছাড়

৩০% ছাড়

হোল সেল। রিটেল সেল। সার্ভিসিং

9231518040 | WaTreat India
Mirhati, Amdanga, Kol-125
www.watreatindia.com
watreatindia@gmail.com

কলরব
বিশ্লেষে কলরব
গল্প
প্রবন্ধ
খবরাখবর
কবিতা
ছুবি
ক্যুইজ
সাহিত্য সম্ভার ২০২০

পাশের বাড়ি

রুকসানা খাতুন

আজকে মাগো পাশের বাড়ি
হয়নি কিছু রান্না
খেতে গিয়ে শুনতে পেলাম
তাদের করুন কান্না
সারাটা দিন না খেয়ে সব
ক্ষুধার জ্বালায় মরে
খাবার মতো এমন কিছু
নেই যে তাদের ঘরে
আমরাতো মা খেয়ে দেয়ে
বেশ তো আছি সুখে
দাওনা গো মা খাবারটা আজ
আনাহারীর মুখে।

এই পথ

তানিশা মীর

জানি না কবে শেষ হবে
সেই পথিকের পথ চলা,
সময় ছিল হাতে-
করেছিল সুযোগের অবহেলা;
করেনি সে অনুভব
বোঝেনি সে এতদিন,
বাঁধা হবে কত সব
পথ হবে সুকঠিন।
আনমনা সে পথ হারিয়ে
বারে বারে হোঁচট খেয়ে,
দিনের শেষে পথের ধারে
ব্যর্থ পথিক বসে একলা,
জানি না কবে শেষ হবে
সেই পথিকের পথ চলা।
সম্মুখে এই পথ আরো অমসৃণ
কিন্তু বিশ্বাস এই যে এই কাল নতুন দিন,
হোঁচট খাওয়া পা লাল রক্তে মাখা
কিন্তু সময়ের হিসেবে সুযোগকে হাতের মুঠোয় রাখা,
নতুন দিনের প্রথম কিরণ
পথিকের চোখে আগুন জ্বালিয়ে দিল,
চলল পথিক হাসিমুখে
এই পথই তাকে পথ দেখিয়ে দিল।
আজওসেই চলছে পথিক
ধরে এই পথের দিশা,
লক্ষ্যে সে পৌঁছাবেই
অফুরন্ত মনের আশা,
এখন তার সাথে সে নিজেই আছে
পিছনে এই পথ পরে থাকে একলা;
জানি না কবে শেষ হবে
সেই পথিকের পথ চলা।।

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

ঘুরে দাঁড়াও প্রতিবার

ডলি শবনম

নতুন চেহারায় পুরানো বন্ধু !
আজ বছর ছয়েক পর দেখলাম।
চুলগুলো ওর কোমরে নেমেছে।

ওকে দেখেই বিষম খেলাম !

কি মিষ্টি ছিল গানের গলাটা,
চোখদুটো গভীর, কালো ;
ও ছিল বেজায় মিশুকে
আর খুব ভালো।
ক্লাসের ফার্স্ট গার্ল,
সহপাঠীদের অন্তরে থাকত।
খেয়ালি বন্ধুত্বে সবাইকে মাতিয়ে রাখত।

আজ সেই ভীষন চেনা মুখটায় তাকাতেই
আমি অসাড় যেন!
নিষ্পাপ মুখটা যে অ্যাসিডে ঝলসানো!

আচ্ছা, এমন ও হয়! না ? অগোচরে
বহু নিষ্পাপ কুঁড়ি ফোঁটার আগেই ঝরে. . . .

না! থেমে থাকেনি, আজ সে ডাক্তার।
" চেষ্টায় আনে সাফল্য, ঘুরে দাঁড়াও প্রতিবার।"

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

শুভেচ্ছা ও উৎসাহে

National Youth Computer Training Academy
ন্যাশনাল ইয়ুথ কম্পিউটার ট্রেনিং অ্যাকাডেমী
NYCTA
Committed To Build Youth
An Autonomous I.T. Academy Registered Under Govt. Of West Bengal
Computer Education Under The Guidelines Of
Ministry Of Information Technology, Govt. Of India.
An ISO 9001:2015 Certified
A TRAINING DIVISION OF
EXPERTZ DIGITECH SOLUTIONS(EDS)
(WWW.SIINFOSOLUTIONS.COM)
CITA DITA CCA
DPHP IT-DIGITAL E-MINOR
E-KIDS CIPL ADVANCED EXCEL
SPOKEN ENGLISH
On-line Study Facility Available
Website: www.nycta.in
Associate Training Partner:
EXPERTZ IT ACADEMY
Learning Today.. Leading Tomorrow..
www.nycta.in
8345015195 / 8918457443
Qualified teachers
Excellent Infrastructures
Detailed Study Materials
Lower Fees Structure
কম্পিউটার শিক্ষার কোন বিকল্প নেই
WiFi
Highspeed Internet Coverage
CONTACT ADDRESS
ULUDANGA, AMDANGA

আমার জীবনে লকডাউন

চৈতালি বেরা

লকডাউন কি? শব্দটির সঙ্গে তেমন বিশেষ পরিচয় ছিল না কোনদিনই। কোয়ারেন্টিন, আইসোলেশন, সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং, লকডাউন- শব্দগুলি নিতান্তই নতুন আমার কাছে। হ্যাঁ, সত্যিই নতুন। নতুন বলেই ভেবেছিলাম যে কয়েকটা দিন যতটা সম্ভব অর্থাৎ একান্ত প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে না বেরিয়ে বাড়ির মধ্যে থাকা অর্থাৎ গৃহবন্দি।

সুদূর চীনে যখন দেখা দিয়েছিল এই মারণ ভাইরাস 'করোনা'; তখন বুঝে উঠতে পারেনি এমন দিন আমাদের দেশেও আসবে। আসবে নয়, এসে গেছে এবং কিছুটা দিন পেরিয়েও গেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় জানতে পারি, প্রথম এই ভাইরাসের কথা। সুদূর চীন থেকে শুরু করে সারাবিশ্বে তান্ডব নৃত্য চালাচ্ছে COVID-19।

যন্ত্রসভ্যতার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে প্রকৃতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলাম আমরা। যে প্রকৃতির কোলে সেই ছোট্ট থেকে আমাদের বেড়ে ওঠা সেই প্রকৃতিকেই আমরা ভুলতে বসেছিলাম।

- তবে এ কি প্রকৃতির শাস্তি?

-না, না, তা হতে পারে না ।প্রকৃতি তো আমাদের মা।

- তবে?

যখন আমাদের মনে দুষ্ট মনোভাব জন্ম নেয়, তখন তো মা-ই আমাদের কড়া হাতে শাসন করেন। তবে প্রকৃতির এই বিরূপ মনোভাবের জন্য আমরা কি কোন না কোন ভাবে দায়ী?

এই মারন ভাইরাস রুখতে যথাযথ ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে সময়ে। নির্দেশিকা মেনে চলেছে অনেকেই, কিন্তু বেপরোয়া সংখ্যাধিক্যের সংখ্যাও কম ছিলনা। যার ফল ভুগতে হয়েছে সাধারণ মানুষকে। সমাজের প্রান্তে থাকা মানুষ হারিয়েছে তার

শ্রম যার বিনিময়ে ছিল দু' বেলা, দু' মুঠো অন্ন। মানুষ হারিয়েছে তার একান্ত প্রিয়জনকে, যার ফলে সংকটে পড়েছে মানবজীবন।

সমাজের সেইসব মানুষ, দৈন্যতা যাদের নিত্যসঙ্গী দু' বেলা কঠোর খাটুনির পর যাদের পেটে জোটে ভাত তাদের উপায় কি? নিত্যদিনের আয়ে চলে যাদের সংসার - তবে তারা কি করবে? কিভাবে কাটাবে তারা এক-একটা দিন ? এই অদৃশ্য শত্রুর সাথে লড়বে কি করে? এ প্রশ্ন মনের গভীরে থেকেই যায়।

- প্রশ্ন তো ছিল, উত্তর ও ছিল কিছু। কিছু সহৃদয় ব্যক্তিবর্গ বাড়িয়েছেন তাদের সাহায্যের হাত। দেশের কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছে ব্যবস্থা। তবে এর মধ্যেও চলেছে কারচুপি! তবে তার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে কঠোরভাবে।

ইতিহাসের পাতায় মন্বন্তরের সাদা-কালো বহু ছবি আমাদের চোখে ভেসে ছিল। আর সেই ভেসে থাকা ছবিই যে আমাদের এই তারুণ্য জীবনে বাস্তব রূপ নেবে তা কল্পনাও করতে পারেনি। সেই অকল্পনীয় ঘটনাই ঘটল আমাদের চোখের সামনে COVID-19 এর প্রভাবে। এমন সময়েও মানবিকতা পৌঁছেছিল চরমে! লকডাউনের প্রেক্ষিতে কারো বাড়ি আনন্দ উপচে পড়ছে নিত্যনতুন পদের আহারের সম্ভারে; কারো বাড়ি একবেলার একমুঠো সেদ্ধ ভাত তাতে আলু জুটছে কি জুটছে না; তো কারোর নিজের প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে জলই একমাত্র সম্বল।

সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষরা পড়েছে গভীর বিষাদে। যেসব মানুষরা কাজের সন্ধানে বাইরে ছিল তারা হারিয়েছে তাদের কাজ। ঘরে ফেরার তাগিদে পথে দিয়েছে প্রাণ। কৃষক ভাইয়েরা হারিয়েছে তাদের সোনার ফসলা ক্ষেত ভর্তি কৃষিজ ফসল তার মান হারিয়েছে ক্ষেতেই। -এরই মধ্যে অসাধু ব্যক্তি গুছিয়েছে তার আখের।

মনে পড়ে নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের লেখা ' নবান্ন' নাটকের কালীধন, হারুদত্ত চরিত্রের কথা। এছাড়াও মনে পড়ে সেই সব চরিত্র (প্রধান সমাদ্দার, কুঞ্জ, রাধিকা, বিনোদিনী প্রমুখ) যারা ভাতের ফ্যানটুকু পাবার আশায় গ্রাম ছেড়ে গিয়েছিল শহরে।

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

- এমন দিন কি আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে?

- না! এমন দিন ধেয়ে আসার আগেই গড়ে তুলতে হবে আমাদের জোর প্রতিরোধ। সচেতন হতে হবে নিজেকে। সচেতন হতে হবে আমাদের এই পরিবেশ সম্পর্কে।

এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির শত শত কুফল দিক থাকলেও কিছু সুফল দিকও লক্ষ্যণীয়।

পৃথিবীর ফিরে পেয়েছে তার আপন রূপ। ধুলো-বালির আস্তরণ ঝেড়ে ফেলে প্রকৃতি হয়ে উঠেছে চিরসবুজ। প্রকৃতির মাঝে পশুপাখি তাদের প্রাণে ফিরে পেয়েছে আপন হিল্লোল। এছাড়াও জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে মানুষ চিনেছে নিজেকে, একে-অপরকে। একে-অপরের পাশে থেকে সংঘবদ্ধভাবে বাঁচবো - এটা অনুভব করতে শিখিয়েছে। হিংসা নয়, বিদ্বেষ নয় - 'সকলের তরে সকলে আমরা' এই মনোভাব নিয়েই আমাদের পথ চলতে হবে।

পৃথিবী থেকে মুছে যাবে এই দুর্দিন। সারা বিশ্বব্যাপী আশায় বুক বাঁধছে। গৃহবন্দি জীবন ত্যাগ করে প্রকৃতির মাঝে ফিরব আমরা। তবে সেই সুস্থ পৃথিবীকে ফিরে পেতে আমাদের হতে হবে দায়িত্বযোগ্য, আরও সচেতন। প্রকৃতির আঙিনায় আবার লাগবে নতুন কলতান। দিন গুনছি আমরা-

"কবে কাটবে এ অন্ধকার,
কবে হাসবে এই ধরা,
তার অপেক্ষায় দিন গুনছে-
আমাদের শিল্প - সাহিত্য ধারা।"

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

শুভেচ্ছা ও উৎসাহে

Expertz - iCafe
A Complete Cyber Solution

8345015195
8918457443

সাইবার ক্যাফে

❖ অনলাইন ফর্ম ফিলাপ ❖ অনলাইন পেমেন্ট
❖ আধার কার্ডের মাধ্যমে সমস্ত ব্যাঙ্কের লেনদেন
❖ প্যান কার্ড ❖ e - আধার কার্ড ডাউনলোড
❖ জেরক্স, কালার জেরক্স, প্রিন্ট ❖ ল্যামিনেশন
❖ আর্জেন্ট ফটো, স্কুল, কলেজের প্রজেক্ট ওয়ার্ক
❖ স্পাইরাল বাইন্ডিং ❖ D.T.P, P.P.T সহ
A to Z এডুকেশনাল সল্যুশন
ও আরো অনেক পরিষেবা

ট্রেন ও ফ্লাইটের
e- টিকিট বুকিং করা হয়

A Complete Cyber Solution by Expert Hand
S.I. Residency, উলুডাঙ্গা মোড়

কলরব
কলরবে কলমকারী
গল্প
প্রবন্ধ
খবরাখবর
কবিতা
ছবি
ক্যুইজ
সাহিত্য সম্ভার ২০২০

ভেবে দেখেছো কি ?

শেখ নিয়ামত ইসলাম

ভেবে দেখেছো কি ?
নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে শ্বাস নিই,বিনে পয়সায়
কভু তার দাম নাহি চায়।
কোন সে দাতা,ভেবে দেখেছো কি ?

ভেবে দেখেছো কি ?
দিনের ক্লান্তি দূর করে রাত্রি,ঘুমিয়ে পড়ি
মৃত্যু সম ঘুমের মাঝে প্রাণপাখি।
বাঁচিয়ে রাখে কে,ভেবে দেখেছো কি ?

ভেবে দেখেছো কি ?
ক্ষুধা পেলে অন্ন মেলে,তৃষ্ণা'তে পানি
খেত ভরা ফসল ফলনে।
কে বর্ষায় বারি,ভেবে দেখছো কি ?

ভেবে দেখেছো কি ?
শূন্যে আকাশ রয় দাঁড়িয়ে,পড়ে না ভেঙে
চন্দ্র সূর্য গ্রহ ঘুরছে আপন কক্ষে।
কার ইশারায়,ভেবে দেখেছো কি ?

ভেবে দেখেছো কি ?
বিশাল সাগর নদী নিরন্তর চলে বয়ে
অবিরাম ঝর্ণার কলকল তান।
কার গায় গান,ভেবে দেখেছো কি ?

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

ওদেরও যে খিদে পায়

সাহা শোমী

ওদেরও যে পেট আছে
ওদেরও তো খিদে পায়,
দুমুঠো শস্যের জন্য
মাটি মাখে ওরা গায়ে।
কাদা মাটি মাতৃজ্ঞানে
তিলক করেছে ওরা,
শ্রমে নত শিরে, দৈন্যতায়,
তবুও কি এই শ্রমের দাম
সত্যিই কি ওরা পায়??
ঝন ঝন করে টাকা
তোমার দুপকেটে তাই
ফেলে ছড়ে ভাত খাও,
ওদের কষ্টের দাম
ভুলে গেছো দিতে তাও।
কষ্টের বোঝাখানি
চড়িয়েছো ওদের ভালে,
তবুও দুবেলা, দুমুঠো অন্ন
নেই যে ওদের থালে।
মাটির মানুষ ওরা
প্রকৃতির সন্তান,
ওদের দীর্ঘশ্বাস লাগার আগে
মিটিয়ে দাও, বুঝিয়ে দাও
ওদের অধিকার, ওদের সম্মান।

রঙের বিন্দু

শ্রীজা দত্ত

হাজার রঙের আলো তুমি,
সবার মাঝে থাকো!
শীতের দিনে মেঘের পড়ে-
বৃষ্টি গায়ে মাখো।

ক্ষনিক রোদের ছটার মাঝে,
হাঁসতে থাকো রোজ!
শিশির ভেজা ঘাসের ওপর-
রাখো মনের খোঁজ।

জনগণের কোলাহলে,
ছড়িয়ে থাকো তুমি!
তোমায় দেখি, তোমায় খুঁজি -
তুমিই আমার দামী।

তোমার কাছে আমিই সহজ,
অন্যজনের চেয়ে!
কেমন আছো এখন তুমি-
আমায় ভুলে গিয়ে।

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

যাপন

অঙ্কিতা চক্রবর্ত্তী

সকাল ছটায় পেপারকাকু
সাতটায় সুতোয় বাঁধা প্লাস্টিকে দুধের প্যাকেট
সাড়ে সাতটায় প্যাঁক প্যাঁক আওয়াজে বেকারি
আটটায় " গাঁদা ফুলের মা--লা দশ টাকা"
তারপর ধীরে ধীরে বাড়ে ফেরিওয়ালার আনাগোনা
বিশাল এক বস্তা মুড়ি আর ভুঁড়ি নিয়ে দিব্বি হাঁটা,
তবে আমার সব থেকে প্রিয় আওয়াজ কুলফিকাকুর টিং টিং টিং টি টিং

আবার বিকেল হতে না হতেই জিভে জল
ঘটি বাজিয়ে ঠেলা ভর্তি ফুচকা
একে একে ইডলি, ধোসা আরো কত কি
সবশেষে আটটা নাগাদ ঝালমুড়ি।
মাস দুয়েক আগে এই ছিলো আমার দিনযাপন. . . .
একটার পর একটা আওয়াজের অপেক্ষায়,
বেশ কেটে যেত দিনগুলো. . . . .

হঠাৎ একদিন থেমে গেলো সব আওয়াজ ,
শুনলাম এক মহামারী এসে একটু একটু করে গ্রাস করলো দেশ থেকে
মহাদেশে, শহর থেকে শহরতলি ছাড়িয়ে প্রত্যন্ত গ্রামে. . . . .
ধনী ব্যবসায়ী থেকে বিখ্যাত ফুটবলার, আমলা থেকে মন্ত্রী, ডাক্তার কিংবা
ঠিকা শ্রমিক কেউ নাকি ছাড় পায়নি দেশ দেশান্তরে. . .

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

আমিও আজকাল কেমন আতঙ্কেই দিন কাটাই,
সকাল থেকে রাত শুধুই নিস্তব্ধতা,
দুধের প্যাকেট এলেও কোনো আওয়াজ নেই
সবাই যেন এক লহমায় চুপ করে গেছে,
মৃত্যুভয়ের আতঙ্ক গ্রাস করেছে সব আওয়াজ
কান পাতলে শোনা যেত দূর কারখানার সাইরেন
বা দূরপাল্লার ট্রেনের ঝমঝমানি, সব আজ থমকে

নাহ্, বাস, অটোর শব্দও তো কানে আসেনি বহুদিন,
সবাই যেন ঘুমিয়ে পড়েছে. . . .

আর আমি. . . আমার পরিচয়?
হ্যাঁ, আমি এক শহুরে ব্যালকনি
মার্বেলের মেঝে, স্টিলের রেলিং
দেওয়ালের আঁকিবুকি আধুনিক ডিজাইন. . .
অব্যবহৃত হয়ে পড়েছিলাম দীর্ঘদিন,
ব্যস্ততার দিনলিপিতে
ব্যালকনিতে সময় কাটানোর ফুরসৎ ছিলো কই?
তবে এখন আমার ভালোবাসার অভাব নেই
আরো সেজে উঠেছি আমি, ফুলে সবুজে
ব্যাস্ত শহরের কোয়ারেন্টাইন অবকাশ যাপনে
একমুঠো বাতাস, একটুকরো আকাশ ও দু-একটা পাখিও দেখাতে পারি,
একমাত্র আমি. . . . .
শহুরে ব্যালকনি. . . . .

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

সময়টা যে এমন

রিংকু নস্কর

দু-একজনের দিকে চোখ আটকালো, বয়সটা যে বয়ঃসন্ধি,
ভুলগুলোও যেন ঝকঝকে সঠিক, ওটা প্রমাণই হরমোনের ফন্দি ;
মনের চোরাবালিতে আজ সহস্র অনুভূতির অবাধ আনাগোনা,
কারোর সংজ্ঞায় ভালোলাগা-ভালোবাসা, কারোর কারণ অজানা।

তার মধ্যে একটাকে পটাতেই হবে, শুরু হলো অক্লান্ত প্রচেষ্টা,
জেদটা নিজের লক্ষ্যে লাগালে, হয়তো পেতো বিশ্ব সেরা নোবেলটা;
বাস্তব থাক চুলোয়, সত্য যাক হারিয়ে, ভুলটা করতে মন যে উদ্বিগ্ন,
ফেসবুকে রিলেশন স্ট্যাটাস দিতে হবে, ক্যারিয়ার হয়ে যাক ভগ্ন।

মনে ফাগুন, লক্ষ্যে ধরেছে আগুন, তবুও স্মৃতিতে থাক প্রথম বসন্ত উৎসব,
শুরু হলো ক্লাস অফ, টিউশন কামাই, সঙ্গে মিথ্যে অজুহাত আর ঢব;
পালন হলো ভালোবাসার সপ্তাহ, সরস্বতী পূজোয় দেখা শাড়ি-পাঞ্জাবীতে,
ফোন রেকর্ড, ম্যাসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট ভরে গেলো প্রতিশ্রুতিতে।

হঠাৎ একদিন রিলেশন স্ট্যাটাস গেল মুছে, টাইমলাইনএ হচ্ছে দুঃখ বিকাশ
কারণটা এমনই, ' আমি করে ফেলেছি ওর আসল রহস্য প্রকাশ;
কারোর স্টোরিতে রক্তাক্ত হাত, কারোর গলায় দড়ির ফাঁস,
কেউ পোস্ট করছে ওসব বাঁশ, সিঙ্গেল লাইফ হলো ফার্স্ট ক্লাস।

কেউ ছাড়ছে সিগারেটের ধোঁয়া, কেউ সারারাত ভেজাচ্ছে চোখের পাতা
কেউ মানে না, মা-বাবা আর নিজের সাথে করা বিশ্বাসঘাতকতা;
জীবনে যেন সবকিছু শেষ, ক্যারিয়ার নয়, এ যে সম্পর্কের ডিপ্রেশন,
আবার কেউ ঘুরে দাঁড়িয়েছে, মেরে ফেলেছে মনের সব ইমোশন।

ফিরে এসো

অনির্বাণ ঘোষ

তারপর সময় হলে একবার ফিরে এসো
ঘুরে যেও এ শহরের প্রতিটি অলিগলি,
দেখে যেও সজ্জিত আছে ফুলের বাগান
ক্লান্ত পথিক এখনো প্রহর গোণে সূর্যাস্তের অপেক্ষায়।

তোমার তো ভুলে যাওয়া কর্তব্য নয়
আবার মায়ায় জড়ানো তোমার অভিধানে নেই,
খানিকটা জটিল; খানিকটা মিশুকে
আবার ইচ্ছে হলে কিছুটা অভিমানী।
তোমাকে আমি কীভাবে ভালোবাসি বলোতো?
ঘরের ঝামেলা পাঁচকান হওয়া মোটেই ভালো নয়,
চুপি চুপি তাই তোমাকে ডাক পাঠালাম. . .
তোমাকে আমার একটু দরকার...খুব অল্প,
বাকি সময়টা তোলা থাকবে মৃত সমাজের জন্য।।

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

বেঁচে থাকো শতাব্দীর গভীরে

সাবির আহম্মেদ হালদার

আমি বারবার তোমার প্রেমের গন্ধ মেখেছি,
তোমাকে হারিয়েছি তার চেয়েও বেশি।
মনের আকাশে জমেছে অনেক মেঘ,
তোমার সাথে ভিজতে চেয়েছে সোহাগ রাতে।
আমার মনের কল্পনাতে এঁকেছি বহুবার,
তার চেয়েও বেশি মুছে ফেলেছি তোমার মুখ।
দূর বাতাসের গায়ে মিশেছিল তোমার সুখ,
চেয়েছিল আমার শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে।
হারানোর মাঝেই তুমি বেঁচে আছো আজও
প্রেমের মোহনায় নিঃশব্দে ভরাডুবিতে।
সিঁদুরের কৌটোয় রাখিনি নিষ্পাপ প্রাণ,
বেঁচে থাকো তুমি বহু শতাব্দী ধরে।।

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

সুখ

ধ্যানেশ

সাগরের বুকে আমি ভাসছি প্রত্যহ প্রতিক্ষণ,
শুনেছিলাম ওখানেই প্রোথিত আছে এক সমুদ্র সুখ।
তোমরা যা প্রত্যহ চেয়েছো আমার কাছে-
প্রত্যহ, প্রতিক্ষণ-
আমি গভীর সাগরে ডুব দিয়েছি ঐ সুখের নেশায় -
তোমরা তো শুধু তোমাদের জন্য ই সুখ চেয়েছো,
মানুষের জন্য নয়।
ওই সুখ এনে দেবো বলে সাগরে দিয়েছি ডুব,
বিশ্বাস করো,ওখানে সুখের বড়ো হাহাকার।
ওখানে ওই প্রাণগুলো তো সুখী নয়,
বাঁচার জন্য তারাও ছুটছে প্রাণপণ প্রতিক্ষণ
বিশ্বাস করো-
ওরা সুখ নয় শুধু বাঁচতে চায় ঐ জলের গভীরে।
বিশ্বাস করো, ওরা শুধু বাঁচতে ই চায়।
সব সুখ এখানেই আছে, আমাদের কাছে,
আমি তোমাদের দিয়েছি তা বরাবর,।
ওই যে পুবের রক্তিম সকাল, ওখানে অনেক সুখ...
ওইযে রাখাল বালক, মেখে আছে ধুলো,..তাতেও সুখ।
পড়ন্ত বিকেলে সূর্য ডোবার আগে
তোমার চিবুক ছুঁয়ে যে আলো- ছায়া
আমার হৃদয়ের- মধ্যে ছায়া ফেলে যারা বরাবর,
তার মধ্যে অনেক সুখ.... .
যখন বৃষ্টি ঝরে পড়ে, তোমার শরীরের উপর-
তোমার শরীর ছুঁয়ে ঝরে পড়ে জল, আমার তাতেও সুখ।
তোমার কপালের ভিজে ওঠা ঘামের বিন্দুতে সুখ।
তোমার হাতের চা' য়ে সুখ,
এ সুখ পেয়েছি শুধু আমি।
তোমরা আসলে কেউ সুখ পেতে চাও না।
তাই তো, অকারণে আমাকে বিব্রত করেছো অহ রহ
একমুঠো সুখের জন্য।
বিশ্বাস করো সব সুখ এখানেই আছে-
একটু ধৈয্য ধরে খুঁজে নাও
দেখবে তুমিও তা পেতে পারো অনায়াসে।।

নীল- নিশ্চুপ অভিমানী

অমিত্রজিৎ

শেষ রাতের চাঁদ দেখেছ?
তুমি ঠিক তেমনি;
অনেক কথা বলতে চেয়েও
তুমি ম্লান, দিশেহারা;
জানিনা কে তোমার জৌলুস
কেড়ে রেখেছে লুকিয়ে;
সমুদ্রের জলে মিশে গিয়ে
যুগ যুগ ধরে চাপা অভিমান
গভীর জলে ভাসিয়ে আসো;
আর ফিরে আসো
নীল ঠোঁটে সাদা ফেনার মতো হাসি নিয়ে।
ব্যথায় কুঁকড়ে গিয়েও সীমাহীন শক্তিতে
দুহাতে সামলাচ্ছো
নিঃস্ব সভ্যতার প্রতিকৃতি;
নীলঠোঁট দাঁতে চেপে,
মৃত্যুপুরী দুর্গ রক্ষা করবে,
তবু ফিরে তাকাবে না একবার পিছনে;
যেখানে তোমার অনন্ত আকাশ
অপেক্ষায় আছে।
তোমার ব্যথার নীল ঠোঁট
আকাশের নীলে মিশিয়ে দেখ,
কি তুমি পেতে পারো।
অন্ধকার দুর্গে, রাতের নক্ষত্রের মতো
আটকে থেকো না;
নীল আকাশ হয়ে কাছে এসো।
সূর্যাস্তে সূর্যোদয়ে বারেবারে
আমাতে এসে মেশো।।

আমার জীবনের লকডাউন

সুমন বাজ

পড়াশুনো আর খেলাধুলো' তে
চলছিল বেশ সময় ।
চীন হতে করোনা এসে পরে-
ঘর বন্দি করে আমায় ।
মন চাইছে বাইরে যেতে
মুক্ত বাতাস পেতে ।
দুশ্চিন্তা' গুলো, ঘুম কেড়েছে-
আমার গভীর রাতে ।
সিনেমা দেখা, গল্প পড়া
আর নিজের লেখা কবিতা,
এসব নিয়েই কাটছে সময়
মানছি দূরত্বের কথা' টা ।
একলা ঘরে থাকবো তবে
মরি কিংবা বাঁচি ।
আবার পৃথিবী শান্ত হবে,
সেই আশাতেই আছি ।

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

ক্লান্ত বিকেল

সুকান্ত দাস

পড়ন্ত বিকেলের শেষ রোদটুকু
ছুয়ে যায় মলিন স্পর্শে,
আড়ালে আবডালে যন্ত্রণা লুকায়
এলোমেলো স্বপ্নের বিস্তর ব্যবধানে।

নিরুদ্দেশে চিঠি লেখে প্রেমিক
কষ্টে মোড়া শব্দের হয়রান,
কিছু অবহেলা চোখেতেই বাঁচে
প্রতিশ্রুতির অপেক্ষায় ক্লান্ত বিকেল।

ভোরের আলোয় লুকানো সুখ
মুখোশে মেলায় অভিনয়ের বাহাদুরি,
শরীর জুড়ে ক্রমবর্ধমান প্রেম
গোধূলির দরজায় একাকী কাঁদে।

যাওয়ার পথে ফিরে আসে
কথা রাখা শালিকের দল,
দিগন্তে মিশে আসে ধোঁয়া
চিবুক ছোঁয় ক্লান্ত বিকেল।।

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

খিদে

মেকাইল মন্ডল

তোমার অভুক্ত রাজ্যের অধরা কিনারে
দেখো রাজা, দিব্যি আছি দেনার ভারে।
ভিনদেশে পড়ে কর্মহীন আমি
কেবল শুনি তোমার বাক্যব্যয়,
চেয়ে দেখো মোর বুভুক্ষ হাড়ি,
ফেরাওনি আজও নিজের গাঁ-য়।

লড়াই লাগাও ধর্ম ষাঁড়ে-ষাঁড়ে
প্রজা নাচাও প্রদীপ ঘন্টা হাতে,
আমার খোকা গঙ্গায় ভেসে যায়!
মোহ মায়া খিদে বিসর্জনে মাতে।

উনুনে ওড়ে শুকনো ছাইয়ের গাদা
পেট পুড়ে যায় নিরুত্তাপ ক্ষুধানলে,
পাগলা রাজার গম্ভীর হাবভাব-
নোলক নীচে কেবল শোকের শিখা জ্বলে!
খিদের পীড়ায় ঘুম ধরে না, মনে পরে খোকার কথা,
আজও রাজার পায়না ক্ষুধা, হয়না তার পেট ব্যাথা?

সমুদ্রস্নান

রথীন পার্থ মণ্ডল

একসাথে ন- মাস কাটিয়ে, তারপর আমরা বেরিয়ে গেছি যে যার মতো,
আমি কখনো আকাশ দেখেছি দুর্জয়, কখনো শহুরে ঘ্রাণে আমার দম বন্ধ হয়েছে।
পা ডুবিয়ে হেঁটে গেছি অনেকটা পথ, বৃষ্টিতে ভিজে কাদার ছিটে গায়ে মেখে
তুমি নাকি আকাশ হয়েছ! পাখিগুলো তোমার কথাই আজকাল বলে মেঘকে।

আমার ভালো লাগে, তোমার সমুদ্র - তাই আমরা বিপরীত অভিমুখে
আমার গাল ছেয়ে গেছে দাড়ি গোঁফে, ব্রণতে, তুমি চিনেমাটি চকচকে।
সস্তার হোটেল, ফুটপাতের খাবার আমি রোজ খাই, দেরি করে ঘুমাই রাতে
চাকরিটা ছেড়েছি এই কিছুদিন হলো, এখন শুধু ছবি আঁকি সমুদ্রস্নানের।

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

সতর্কবাণী

চন্দন সুরভি নন্দ

অহংকারের নড়বড়ে প্রাচীরে
ধরেছি জ্ঞানের ফিতে
সভ্যতার ভঙ্গুর ভীতে

আজও বুজতে পারিনি ---
বিপদের অদৃশ্য সাইরেন
যখন আলোর বেগে ধাবমান
গ্রাম থেকে নগরে,
হাসপাতালের করিডোর হতে
স্কুলের মুক্ত বারান্দায়
পড়ে থাকে লাশ,
পাঁচতারা কেবিনের যন্ত্রণা
বস্তির মানুষের ভীড়ে,
পাখিদের ক্রন্দন নীড়ে
সব শক্তি পরাভূত অদৃশ্য কালভৈরবে
জানিনা কেইবা ফিরবে

মিথ্যা অগ্রগামীর আঁকাবাঁকা পথে
এ কার সতর্কবাণী
আজও বুঝতে পারিনি।

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

ভাল লাগে

শেখ খায়রুজ্জামান ইসলাম

ভাল লাগে
সব ভুলে একসাথে চলতে।
ভাল লাগে
নির্ভয়ে সত্যটা বলতে।
ভাল লাগে
আগে ভাগে হতে সাবধান।
ভাল লাগে
গাইতে মিলনের গান।
ভাল লাগে
বিপদে কারও পাশে থাকতে।
ভাল লাগে
কাউকে দেওয়া কথা রাখতে।
ভাল লাগে
ভুল হলে করতে স্বীকার।
ভাল লাগে
ভাল কাজ করতে আবার।
ভাল লাগে
সোজা পথে শান্তিতে থাকতে।
ভাল লাগে
সবে মিলে একসাথে বাঁচতে।

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

স্বপ্ন

আসরফী খাতুন

চারমাস ধরে জঠরের মধ্যে
বাড়ছিল স্বপ্নটা
শরীরের অস্থি, মজ্জা, রক্ত চুষে
ধীরে ধীরে বাড়ছিল তার দেহ
দিনে দিনে অনুভব করছিলাম
একান্ত সংগোপনে তার বেড়ে ওঠা
তিল তিল করে সে যেন নিজের অস্তিত্ব জানিয়ে দিচ্ছিল
সকাল- দুপুর- সন্ধ্যা- রাত্রি- ভোর
প্রতিমুহূর্তে সে বলছিল- আমি আছি
মনের কোনে দানা বাঁধছিল আশার পাহাড়
ভালোবাসার ফল্গুধারা গোপনে বইছিল
তাকে ঘিরে পল অনুপল ভাবনারা
ডানা মেলছিল রঙিন আকাশে
ক্ষণে ক্ষণে তার উপস্থিতি বলে দিচ্ছিল
তার বেড়ে ওঠার কথা
প্রতিটি প্রহর শুধু তারই হয়ে ওঠার কথা
চারিদিকে তারই জয়গান বেজে উঠেছিল
আকাশে- বাতাসে শিউলি সুগন্ধ ছড়িয়ে
তার আগমনবার্তা শুনতে পাচ্ছিলাম
পরিবারের সবাই যখন দিন গুনছিল
ছায়াঘন সন্ধ্যাবেলায়
ফুরফুরে মলয় পবন যখন সমস্ত শরীরে
স্নিগ্ধ পরশ বুলিয়ে দিচ্ছিল
সারা দেহ- মন শীতল হাওয়ায়
উড়ে যাচ্ছিল হেমন্তের পেঁজাতুলোর মতো মখমলে
ঠিক তখুনি পেলাম তার দম বন্ধ হওয়ার খবর
সে যেন ছটফট করছে একটু অক্সিজেনের জন্য-

একফোঁটা অক্সিজেন - শুধু একফোঁটা
অক্সিজেন কেউ তাকে দিচ্ছে না
সে বাঁচার জন্য ছটফট করছে
তার ছ'মাসের জীবনীশক্তি দিয়ে সে
আপ্রাণ লড়াই করছে- বাঁচার- একটু নিঃশ্বাস নেওয়ার
সবাই তার গলা টিপে ধরেছে-
কেউ বাঁচতে দেবে না তাকে
সে বাঁচলে অন্যদের ক্ষতি
মুখোশ পরা মানুষদের খসে পড়বে
লোলুপ চেহারা, বেরিয়ে আসবে তীক্ষ্ণ নখ
লালাঝরা জিভ আর ধারালো শ্বাপদদন্ত
মাত্র কয়েকটা মিনিট - সব শেষ
আর শোনা যাচ্ছে না তার শ্বাস - প্রশ্বাসের শব্দ
সে আর খেলা করছে না -
থেমে গেছে তার হৃদস্পন্দন
তবু জঠর যেন তাকে ছেড়ে দিতে পারছে না
পারছেনা ফেলে দিতে -
কোথায় যেন একটা আশার আলো
যদি আবার সে বেঁচে ওঠে - জেগে ওঠে।
সব শেষ নিস্তব্ধ সবকিছু
অন্ধকার ঘরে পড়ে আছে শুধু
একটা মৃতপ্রায় দেহ
মন আজ আর জাগাতে পারছেনা তাকে
সবকিছু খান খান হয়ে গেছে তার
এবার তার দেহ ফালাফালা করে
জঠরের সেই স্বপ্নকে তুলে ফেলো
কোথায় গেলে তোমরা? শুনতে পাচ্ছো তোমরা?
আর দেরি কেন? দেহটাকেও শেষ করে দাও
আর বেঁচে কি লাভ?

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

আড়াল

সাহিনুর রহমান

উত্তাল সমুদ্রের সামনে তুমি কি শুধুই ঢেউয়ের শব্দ শোনো?
উত্তপ্ত মধ্য দুপুরে তুমি কি শুধুই কলকারখানা দূষন রাস্তারধুলো আর যানবাহন দেখো?
গভীর মধ্যরাতে তুমি কি শুধুই অন্ধকার খুঁজে পাও ?
তুমি কি রোদ্দুরের সঙ্গে শুধুই সূর্য কেই দেখো?
তুমি কি পূর্নিমার সাথে শুধু ই চাঁদ কেই খোঁজো?

অনেক চেনার বাইরেও অনেক ' চেনা' আছে।
অনেক সশব্দের মধ্যেও যে অনেক নিস্তব্ধতা আছে।
মধ্য রাতের অনেক নিস্তব্ধতার মধ্যেও অনেক চিৎকার আছে।

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

ক্ষমা কোরো

মহঃ আজাহারুল ইসলাম

এখন প্রাণের নীল পৃথিবীর গভীর অসুখ,
যে বাতাসে জীবন, তাতেই ছড়াচ্ছে মৃত্যুর বীজ--
দেশ দেশান্তরে আতঙ্কের কোলাহল, সংক্রমিত
ভাবনারা ছুঁয়ে দেখে না অসুস্থ পথিকের দেহ;
যা একটু সেবা চায়; অথচ বিকৃত মানবতা
পরিক্রমণে বজায় রেখেছে ঘৃণ্য স্বার্থপরতা,
মুখোশী দূরত্ব -- কেমন বদলেগেছে ধীরে ধীরে
এ পৃথিবী, যেমন কার্বন তার বহুরূপতায়।
একটা সবুজ জীবন ক্রমশ লাশ হয়ে যায়--
সাক্ষী থাকে বহুতল অট্টালিকা, ঝুলবারান্দায়
ঝুলে থাকা বনসাই, ল্যাম্পপোস্টে বসা কাক আর
এই মৌন বিবেকহীন শহুরে আকাশ। অদ্ভুত!
ক্রুসেড, অনেক রক্তাক্ত যুদ্ধের পর বাকি ছিল
শুধু মানবতা, তাও বিভাজিত এ মহামারীতে ।
কলেরা, প্লেগের প্রাদুর্ভাব চোখে দেখেনি কিছুই,
শুনেছি সঘন করুন কাহিনী; তবুও সেবার
প্রসারিত হাত ছিল মৃত্যু পথযাত্রীর শিয়রে;
মুখে ছিল মিষ্টি হাসি; চোখে স্নেহ, অপার আশ্বাস।
মাদার টেরেজা, তোমার সেবার ধর্মে নিজেদের
যে দীক্ষিত করতে পারেনি, ক্ষমা কোরো, ক্ষমা কোরো. . .

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

লিমেরিক

হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট

সুমাল্য মৈত্র

যে রাস্তা জুড়ে শুধু
তোমার কথাই ভেবে যাই
মাঝখানে দুটো বছর
কি নিদারুন শূন্যতা
সেই হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
আমাকে দিয়ে দিলো কথা।

ছলা- কলা

স্বপন রায়

থাকে জলে কস্মিনকালে ভেজেনা তার কিছু
সর্ব হাটের একই কলা, কেউ ছুটে তার পিছু।
ছলা- কলা বেশ তো জানে
বিষ ঢেলে দেয় কানে কানে
যে যাই বলুক নিন্দুকেরা হবে না সে নিচু।

বলির পাঁঠা

স্বপন রায়

বলির পাঁঠা ফুলের সাজে, জীবন নেওয়ার মন্ত্র
পাঁঠা কেবল ব্যা ব্যা করে বোঝেনা ষড়যন্ত্র।
পাঁঠা ভাবে ধন্য হলাম
এতদিনে কদর পেলাম
পাঠা মরে যুগে যুগে বোঝেনা রাজতন্ত্র।

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

একমুঠো চকলেট

পল্লবী সেনগুপ্ত

হুহু করে ছুটছে গাড়িটা আর প্রতি মুহূর্তেই শ্রুতির বুকের মধ্যে পাক খেয়ে উঠছে এক অদ্ভুত দলা পাকান কষ্ট। দেখতে দেখতে এক বছর হয়ে গেল হিরণের না থাকার। ঠিক এক বছর আগে হিরণ শেষ হয়ে গেছিলো ঠিক এরকমই একটা সময়ে যখন আকাশে বাতাসে ম ম করছে ভালোবাসার গন্ধ। গতবছরের সেই বীভৎস রক্তাক্ত ১৪ই ফেব্রুয়ারি। সকলের কাছে সেই দিনটা হয়তো ছিল ভালোবাসার দিন কিন্তু শ্রুতির মতো কিছু মেয়ের কাছে সেটা ছিল ভালোবাসা হারানোর দিন। পুলওয়ামার সেই নারকীয় স্মৃতি, তরতাজা রক্তের ধারা হয়তো আজ দেশের বেশিরভাগ মানুষের মনেই ফিকে স্মৃতি কিন্তু শ্রুতির কাছে এই গোটা এক বছরের প্রতিটা দিন যে ছিল স্মৃতির চোরকাঁটায় সাজান শরশয্যা। হিরণের সাথে সম্পর্কটা যে খুব বেশিদিনের ছিল এমন কিন্তু নয়। হয়তো বড়জোর চোদ্দ পনেরো মাস হবে। কিন্তু তার মধ্যেই কিভাবে যেন সম্পর্কটার গভীরতা মনের অন্তস্থল কে স্পর্শ করেছিল নিবিড়ভাবে। হিরণ যেন ছিল শ্রুতির মনের আয়নার মতো। শ্রুতি মুখ ফুটে কিছু বলার আগেই সব কিভাবে যেন বুঝে যেত মানুষটা। ওর মন ভাল থাকা, খারাপ থাকা সব কিছু কি অদ্ভুত অবলীলায় যেন পড়ে ফেলতো হিরণ। আস্তে আস্তে শ্রুতির প্রতিটা নিঃশ্বাস, প্রশ্বাস আর ভাবনায় মিশে গেছিল ছেলেটা। প্রচন্ড নির্ভরশীল হয়ে পড়ছিলো শ্রুতি ওর ওপর। সেইজন্যই আরও বেশি ভয় হতো শ্রুতির। ওকে হারিয়ে ফেলার ভয়। ওকে ছাড়া নিজের জীবন ভাবতেই পারতো না শ্রুতি, কিন্তু ওকে হারানোর ভয় যে প্রতি পদক্ষেপে। ওর কাজটাই যে এমন। ' হিরণ তুমি এই চাকরি প্লিজ ছেড়ে দাও। আমার যে বড্ড ভয় হয়। তুমি যা হোক অন্য কিছু করবে' । কতবার এই কথাটা হিরণ কে বলেছে শ্রুতি। আর প্রতিবারই ছেলেটা ওর মুখে ওর প্রিয় ডার্ক চকোলেট মুখে ঠুসে দিয়ে বলেছে হাসতে হাসতে ' সবাই এমন স্বার্থপর হলে গোটা দেশটাই যে শত্রুপক্ষের দখলে চলে যাবে। কে বাঁচাবে সব কিছু' । ' কিন্তু তুমিই কেন ' ? ' কারণ আমি দেশকে ভালোবাসি। আমি চাই শেষ নিঃশ্বাস অবধি দেশ রক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকতে। আর শুধু তাই নয়, আমি চাই আমার এই আদর্শ আগামী প্রজন্মের মধ্যেও প্রোথিত করতে' । চোখ দুটো জলে ভরে উঠলো শ্রুতির। কি বোকা ছিল ছেলেটা! আজকের এই যুগে কি সত্যি এই ভাবে কেউ ভাবে? সবাই তো নিজের সুবিধার কথা ভাবে। আর সেখানে হিরণ ভাবতো দেশ বাঁচানোর কথা। আসলে বাপ মা মরা ছেলেটার কাছে নিজের দেশ, শ্রুতি, আর আরোহন এ ছাড়া যে নিজের বলতে আর কিছুই ছিল না। ঘ্যাচম্যাচ করে ব্রেক কষলো ভাড়ার ক্যাবটা। গন্তব্য এসে গেছে শ্রুতির। ধীর পায়ে নামলো শ্রুতি। সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ছোট একটা একতলা বাড়ি, তার বাইরে জীর্ণ সাইনবোর্ডে বড় বড় করে লেখা আরোহন।

আরোহন এর কথা বহুবার হিরণের কাছে শুনেছে শ্রুতি। কিন্তু আগে আসা হয়নি এখনো। আরোহন একটা ছোট অনাথ আশ্রম, প্রচারের আলো থেকে অনেক দূরে থাকা এক সংস্থা। এখানেই নিয়মিত যাতায়াত করতো হিরণ । এখানকার দিদিমনির, ছেলে মেয়েরা নাকি ভারী ভালোবাসতো ওকে। নিজের সাধ্যমত সাহায্য করতো হিরণ আরোহন কে। আরোহনের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই সামনে এসে হাসিমুখে দাঁড়ালেন এখানকার বিনতা দি । বিনতা দি-ই এখানকার সর্বেসর্বা। এনার অনুরোধেই আজ শ্রুতি এসেছে এখানে। ' তোমার কথা হিরুর কাছে অনেক শুনেছি। কিন্তু হিরুকে ছাড়া তুমি এভাবে এখানে আসবে ভাবিনি কোনোদিন' । আচমকা আবার চোখ দুটো জলে ভরে উঠলো শ্রুতির। ' এস আমার সাথে শ্রুতি' । ওর হাত ধরে বিনতা দি ওকে নিয়ে গেলেন ভিতরে। এক ঝাঁক হাসি মুখ যেন অপেক্ষা করছিলো ভিতরে ওরই জন্য । বারো তেরো বছরের এক দল তরতাজা মুখ । এদেরকেই বড্ড ভালোবাসতো হিরণ । বারবার বলতো ওদের কথা ।' এই হচ্ছে শ্রুতি দিদি । তোমাদের প্রিয় হিরণ দাদার বেস্ট ফ্রেন্ড ইনি। ইনিও এবার থেকে মাঝে মাঝে আসবেন তোমাদের কাছে'। বিনতা দি বললেন হেসে হেসে। সকলে এগিয়ে এল শ্রুতির দিকে ।' স্বাগতম দিদি' . . বলেই ওরা ছোট ছোট চকোলেট তুলে দিল শ্রুতির হাতে অপার ভালোবাসায়। সকলে প্রণাম করছে একে একে । ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে গেছে শ্রুতি আচমকা । একদল অচেনা অনুভূতি ছেয়ে যাচ্ছে বুকের ভিতর। ' খুব ভাল থেকো তোমরা' । বললো ও শুকনো গলায়।' আমাদের আশীর্বাদ কর দিদি যেন আমরাও হিরণ দাদার মতো হতে পারি। আমারাও যেন হিরণ দাদার শেখানো আদর্শে চলে দেশের জন্য কিছু করতে পারি' । অনেকগুলো তাজা স্বর বলে উঠলো একযোগে। বুকের মধ্যে কুলকুল করে যেন ঝর্ণা বইছে শ্রুতির। এই স্বার্থপর, লোভী পৃথিবীর মাঝে তাহলে ওর হিরণ সত্যিই পেরেছে কয়েকটা হলেও পবিত্র ফুল ফোটাতে, যারা নিজের স্বার্থের বাইরে গিয়েও দেশের কথা ভাবতে জানে। দু' চোখে জল টলটল করছে শ্রুতির, ওর সামনে উদ্ভাসিত আগামী প্রজন্মের তরতাজা কিছু মুখ যাদের বুকে বেঁচে রয়েছে ওর ভালোবাসার মানুষের শেখান আদর্শ। ওর হাতের মুঠো ভর্তি চকোলেটের দিকে এবার চোখ পড়লো শ্রুতির। ওই এক গুচ্ছ চকোলেটেই যেন একটু একটু করে জেগে উঠছে ওর হিরণের মুখ, যে মিটিমিটি হেসে বলছে ' আছি, আমি তোমার সাথেই আছি শ্রুতি। একদম তোমার পাশেই আছি সব সময়' ।

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

জলরং

অনন্যা দেবরায়

আজ অফিস থেকে বেশ তাড়াতাড়িই বের হয়েছিল দীপ্ত। একে বিদেশ বিভূঁই জায়গা তার উপরে এখানে ওরা যাকে বলে একেবারেই আনকোরা নতুন। মাত্র দিন দশ হলো ওরা এসেছে এই ট্যাংগা ভ্যালিতে। এমনিতেই এইসব পাহাড়ি জায়গায় বিকেলের পরেই সন্ধ্যা নামে ঝপ করে। গোধূলি বা কনে দেখা আলো এইসবের সাথে এখানের মানুষজনের মনে হয় না তেমন কোনো পরিচয় আছে। কিন্তু বিধি বাম। অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বের হলে কি হবে, রাস্তায় দেখা হয়ে যায় এ. সি. এফ স্যারের সাথে। উনিও বাঙালি মানুষ, এমনিতেই মিশুকে, দীপ্তি দেখেই হৈ হৈ করে উঠলেন। জবরদস্তি দীপ্তকে তুলে নিয়ে যান নিজের বাংলোয়। ব্যাস. . ! ! ! সেখানের চা সহযোগে আড্ডা শেষ হতে হতে এই অরুণাচলে প্রায় মাঝরাত নেমে আসে।

স্যারের গাড়ি যখন দীপ্তকে ওর বাংলোর সামনে নামিয়ে দিয়ে যায় তখন ঘড়িতে প্রায় আটটা। দীপ্তর বাংলোটা সেই ব্রিটিশ আমলের। বারান্দায় লম্বা থাম, ঘরের সিলিং প্রায় দোতলা সমান উঁচু আর প্রতিটি ঘরে একটা করে ফায়ার প্লেস। দীপ্তর অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর এই স্থাপত্যটিকে মন্দ লাগেনি। বেশ একটা ঝিমধরা সেকেলে ব্যাপার। কয়েক ধাপ চওড়া সিঁড়ির উপরে একটা থাম ওয়ালা বারান্দা পেরিয়ে সুপ্রশস্থ হল ঘরে ঢোকে দীপ্ত। ঘরের আসবাবপত্র অবশ্য বাড়িটার মতো এতো বয়স্ক না। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে সেগুলো যে সময়ে সময়ে বদলে গেছে, সেটা একদিক থেকে ভালোই। না হলে হলঘরের দেওয়ালে এল. ই. ডি টি. ভি টার বদলে যদি এক বেঢপ রেডিও বসানো থাকতো তবে বেশ অসুবিধাই হতো। হলঘরে পা দিতেই মিতুকে চোখে পড়ে দীপ্তর। কার্পেটের উপরে বসে একমনে খেলছে মেয়েটা। হলুদ আর সবুজ মেশানো ফ্রকে মনে হচ্ছে একরাশ সরষে ফুল ফুটে আছে ঘরের ভিতর। দীপ্তর সাড়া পেয়েই মুখে হাসি ফোটে মিতুর। ছুটে এসে দীপ্তর কোলে উঠে পরে। মনটা এক গভীর প্রশান্তিতে ভরে ওঠে দীপ্তর। এই মেয়েটাই যে এখন তার একমাত্র অবলম্বন।

মিতুকে আদর করতে গিয়ে ওর নাকে, গালে, কপালে রঙের হালকা ছোপ লক্ষ্য করে দীপ্ত। নিজের হাত দিয়ে সেসব পরিষ্কার করতে গিয়ে অবাক হয় অল্প। যে সে রং নয়, মিতুর মুখে লেগে আছে জলরঙ। কিন্তু এইবাড়িতে ও জলরঙ পেলো কোথায়? . . মনে একটা খটকা লাগলেও তখনকার মতো বিষয়টা মুলতবি রেখে মিতুকে কোল থেকে নামিয়ে ফ্রেস হতে বাথরুমের দিকে এগোয় দীপ্ত।

ব্যপারটা হয়তো ভুলেই যেতো, যদি না ডিনার টেবিলে মা একটা অদ্ভুত কথা তুলতো. . রাত দশটা নাগাদ ডিনারে বসে দীপ্ত, মিতু ততক্ষণে ঘুমে কাদা। দীপ্তর প্লেটে রুটি সাজিয়ে দিতে দিতে মা বলেন,

-"মিতু আজকাল একা একা কথা বলে. . "

রুটিতে ঘুগনিতে মাখিয়ে সেটা মুখে ভরে অল্প হাসে দীপ্ত, তারপর বলে

-"বাচ্ছারাতো নিজের মনে কথা বলেই খেলে, এতে আশ্চর্য হবার কি আছে?". . .

-"তাই বলে সারাক্ষণ কথা বলে যাবে?". .

মায়ের চিন্তা কমছে না দেখে একটু বিরক্তই হয় দীপ্ত।

-"ঠিক আছে, কাল আমি মিতুকে জিজ্ঞেস করবো, এখন তুমি খাও. ."অল্প গলা তুলে বলে দীপ্ত। দীপ্তর ধমকানোতে বিষয়টা তখনকার মতো ধামাচাপা পড়ে যায়।

★★★★★★★

খাওয়া শেষ করে শোবার ঘরে ঢোকে দীপ্ত। একগুচ্ছ ফুলের মতো বিছানায় বিছিয়ে আছে মিতু, ঘুমে অচৈতন্য। মিতু আজ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাসছে, যদিও ঘুমের মধ্যে হাসার বয়স এখন আর মিতুর নেই, মিতু এখন চার বছরের। তবুও ঘুমন্ত মিতুর হাসি মুখটা খুব মায়াবী দেখাচ্ছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে স্বপ্ন দেখছে মিতু। কোনো সুখ স্বপ্ন।

মেয়ের মাথায় আলতো করে হাত বুলিয়ে একটা ম্যাগাজিনে চোখ ডোবায় দীপ্ত। কিন্তু মন বসে না। সুখ স্বপ্নতো সেও একসময় দেখতো, জেগে অথবা ঘুমিয়ে সব সময়েই সুখের রেশে মিশে থাকতো। অথচ তার স্বপ্ন দুচোখের পাতা থেকে বাস্তবের মাটিতে আর নামলো না।

তন্দ্রার সাথে সমন্ধ করেই বিয়েটা হয়েছিল দীপ্তর। তখনও সে এই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের চাকরিটা পায় নি। সাধারণ বেসরকারি চাকরি করতো। তবুও বেশ খুশি মনেই দীপ্তকে বিয়ে করেছিলো তন্দ্রা। জঙ্গল দীপ্তকে বরাবরই টানে, সেই টান থেকেই জঙ্গলের চাকরিটা পাবার পর কোলকাতা ছাড়তে এক মিনিটও ভাবেনি দীপ্ত। কিন্তু কোলকাতা ছাড়ার কথায় প্রচন্ড ভাবে বেঁকে বসেছিল তন্দ্রা। ততদিনে ওদের কোল আলো করে মিতু এসে গেছে।

কোনো ভাবেই তন্দ্রাকে রাজি করাতে পারেনি দীপ্ত। তন্দ্রার শর্ত ছিলো ভীষণ স্পষ্ট, হয় চাকরি ছাড়তে হবে নয় তন্দ্রাকে। অবশ্য তন্দ্রার কোলকাতা প্রীতির কারণটা বেশ তাড়াতাড়িই নগ্ন ভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল দীপ্তর চোখে। সুকমল. . . তন্দ্রার পুরনো প্রেম কবে যে দীপ্তর অগোচরে তন্দ্রার স্বপনের, মননের অধীশ্বর হয়ে উঠেছিল তা টেরই পায়নি দীপ্ত। টের যখন পেলো ততক্ষণে ঘর ভেঙ্গে গেছে দীপ্তর। শেষ পর্যন্ত আর কোনো অজুহাত ছাড়াই সুকমলের সাথে ঘর ছেড়েছিল তন্দ্রা। মিতু তখন বছর দুয়েকের। নাহ, মিতুকে সাথে নিয়ে যায় নি তন্দ্রা। পিছুটান হীন নতুন সংসারের টানে এগিয়ে চলে গেছিলো সে।

এরপর নতুন চাকরিতে জয়েন করা নিয়ে কোনো দ্বিধাই আর অবশিষ্ট ছিলো না দীপ্তর , বরং কোলকাতা থেকে পালাই পালাই ভাবটাই শেষের দিকে বেশি তাগাদা দিতো। অরুণাচলে পোস্টিং পেয়েছিল দীপ্ত, প্রথম দুবছর এসিট্যান্ট রেঞ্জার হিসাবে পোস্টিং ছিলো অরুণাচলের তেজুতে। আপাতত দীপ্তর পরিবার বলতে তো মা আর ওই এক রত্তি মেয়ে। তেজুর কোয়ার্টারটা তেমন একটা বড়ো ছিলো না, তবুও দীপ্তদের তিনটে প্রানীর তেমন কোনো অসুবিধা হয়নি সেখানে। অবশ্য চিরটাকাল উত্তর কোলকাতায় থেকে আসা মা' য়ের এই নতুন দেশে অসুবিধা হয়তো হতো, কিন্তু কোনো অভিযোগ করে ছেলেকে কখনো বিব্রত করেনি। আপাতত দীপ্তর চিন্তা মেয়েকে নিয়ে। বড় হচ্ছে মিতু, ওর স্কুলিং শুরু হলে তো ওকে হোস্টেলেই দিতে হবে। এই জঙ্গলে আর যাই হোক, লেখাপড়াটা অন্তত হয় না। কিন্তু মিতুকে ছেড়ে থাকবে কী ভাবে দীপ্ত???. .

ম্যাগাজিনটা রেখে আর একবার ঘুমন্ত মেয়ের দিকে তাকায় সে। এখনো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাসছে মেয়েটা। কী এতো সুখ স্বপ্ন দেখছে মিতু??

★★★★★★★

পরদিন অফিস যাবার আগে ব্রেকফাস্ট টেবিলে গিয়ে দীপ্ত দেখে মা মিতুকে ব্রেকফাস্ট খাওয়াচ্ছে। খেতে মেয়েটা বড়াবড়ই বেশ ভোগায়, তবে দীপ্ত দেখে, আজ বেশ শান্ত ভাবেই খেয়ে নিচ্ছে মিতু, মুখে একটা স্নিগ্ধ হাসি। চোখ দুটো আনমনা। কিন্তু মায়ের মুখ এখনো বেশ ভার। দীপ্তকে দেখেই বলে -"ঘুম থেকে উঠেই আবার নিজের মনে বকবক শুরু করেছে মেয়েটা, আমার কিন্তু ভালো লাগছে না. ."

উফফ এতো মহা সমস্যা শুরু হলো মা' কে নিয়ে। বাচ্ছা নিজের মনে কথা বলে খেলবে, এটা নিয়ে মা এতো ব্যতিব্যস্ত হচ্ছে কেন? বিরক্ত মুখে টোস্টে কামড় দেয় দীপ্ত।মিতু একই ভাবে হাসি হাসি মুখে খেয়ে চলেছে, ওর দৃষ্টি ডাইনিং টেবিলের পাশের দেওয়ালে, নাহ ঠিক দেওয়ালে নয়, দেওয়ালে টাঙানো একটা ছবির উপর। মিতুর মুখ দেখে মনে হচ্ছে ও যেন কারো সাথে ইশারায় কথা বলছে।. .ব্যপারটায় এইবার দীপ্তরও একটু খটকা লাগে, তবে তখন অফিসের তাড়া থাকায় মিতুর সাথে আর কথা বলা হয়ে ওঠে না।

★★★★★★★★

অরুণাচলের পাহাড়ি খাঁজে এক সুন্দর জনপদ হলো এই ট্যাংগা ভ্যালি। চারপাশে বিছিয়ে আছে সারবদ্ধ পাহাড়, ঝিরঝির করে বয়ে চলেছে ট্যাংগা ভ্যালি রিভার আর আর এই সব কিছুকে ঘিরে রেখেছে ঘন সবুজ অরণ্য। এক গম্ভীর নিস্তব্ধতা এখানে বিরাজ করে সবসময়। যেন নদীর অবিরাম ঝিরঝির আর পাখিদের কলতান ছাড়া কোনো অযাচিত শব্দর অনুপ্রবেশ এখানে নিষিদ্ধ। তবে অরুণাচলের বিরামহীন বর্ষাটাকে এখনো আপনকরে নিতে পারেনি দীপ্ত। টানা এক দেড় মাসের বৃষ্টিতে এখনো বিরক্ত লাগে ওর।

আজ অবশ্য বৃষ্টি নেই, বেশ পরিষ্কার ঝলমলে দিন। অফিসে আজ গোটা দিন কেটেছে ব্যস্ততার মধ্যে। ফরেস্ট রেঞ্জার হয়ে এখানে পোস্টিং হবার পর আজ প্রথম জঙ্গলে সার্ভে করতে গেছিলো দীপ্ত। সাথে আবার আজ এসিস্ট্যান্ট কনজারভেটার অফ ফরেস্ট বা এ. সি. এফ স্যারও ছিলেন, অগত্যা আজ ফাঁকি মারার তেমন কোনো সুযোগ সুবিধা ছিলো না দীপ্তর কাছে। সারাটা দিন জঙ্গলে ঘুরে নিজের বাংলো ফিরতে ফিরতে আজও সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছিলো দীপ্তর।

হলঘরে পা দিতেই মিতুকে চোখে পড়ে, সেই একই ভাবে কার্পেটে বসে খেলছে। কথা বলছে নিজের মনে। মিতুকে দেখেই সকালের কথাটা মনে পড়ে যায় দীপ্তর। দীপ্ত খেয়াল করে দেখে, মিতু দেওয়ালে টাঙানো ছবিটার ঠিক নীচে বসে খেলছে, ছবিটার দিকে তাকিয়ে মুখ তুলে তাকিয়ে কথা বলছে, যেন ছবিটার সাথেই কথা বলছে ও।

আজ প্রথম ছবিটাকে ভালো করে খেয়াল করে দীপ্ত। সাধারণ একটা পেন্টিং। একটা খোলা মাঠের কোণায় একটা ধূসর রঙের বাড়ি, বাড়িটা থেকে একটু দূরে একটা নেড়া গাছ তার ডালপালা ছড়িয়ে কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে, আর গাছের নীচে একটা বাচ্ছা ছেলে বসে আছে, কিন্তু পিছন ফিরে। ছবিতে তার মাথার চুল আর পিঠ ছাড়া কিছু দেখা যাচ্ছে না। গোলাপি রঙের গেঞ্জি পরে আছে ছেলেটা। একেবারেই মামুলি একটা পেন্টিং। রঙের কাজও নিম্ন মানের। দেখলেই মনে হয় যেন ছবির রং এখনো ঠিক ভাবে শুকায় নি।

মিতু এখনো একই ভাবে ছবির দিকে তাকিয়ে কথা বলে যাচ্ছে। কান কোরে শোনে দীপ্ত। মিতু ঠিক নর্মাল ভাবে কথা বলছে না, ও গল্প করছে। কিছু বলছে, তারপর চুপ করে কিছু শুনছে, তারপর তার জবাবে হয় হাসছে না হয় আবার ওর কচি গলায় উত্তর দিচ্ছে। আর এইসবে সে এতোটাই মত্ত যে ঘরের ভিতর বাবার উপস্থিতি টেরই পায় নি এখনো। নিজের একরত্তি মেয়েটাকে আচমকা কেমন যেন অচেনা লাগছে দীপ্তর। ভয় পেয়ে সে মিতুর নাম ধরে ডাকে একবার। এতোক্ষণে বাবাকে খেয়াল করে মিতু, ছোট ছোট দাঁত বের করে উজ্জ্বল হাসে সে, তারপর রিবনে বাঁধা পশম পশম ঝুঁটি দুলিয়ে দৌড়ে এসে বাবার কোলের ভিতর বসে।

দুহাতে মেয়েকে নিজের বুকের ভিতর মিশিয়ে নেয় দীপ্ত। এই তো.. এই তো তার সেই পুঁচকে মেয়েটা। মুখ ভার করেই সন্ধ্যার চা দীপ্তকে দিয়ে যায় মা। গজগজ করে বলে -"তেজুতে যখন ছিলাম, মেয়ে আমাদের একদম ঠিক ছিলো, এখানে এসেই যতো বিপত্তি। এত্তো বড় বাড়ি.. এই বাড়িটাই সব অশান্তির মূল।"...

বাড়িটা যে বেশ বড়ো সেটা অবশ্য ঠিকই। নিঝুম হয়ে থাকে সবসময়। তিনটে মানুষের কথা বার্তা এই বাড়িটার বিশাল বিশাল দেওয়ালের আড়ালে চাপা পড়ে যায়। এক বুকচাপা নির্জনতা গুমরে থাকে এই বাড়ির আনাচে কানাচে। তবে ফরেস্ট রেঞ্জার হিসাবে এতো বড়ো বাংলো অবশ্য কপাল জোরেই পেয়েছে দীপ্ত। না হলে মামুলি কোয়ার্টারই বরাদ্দ হয় সাধারণত। দীপ্ত ভেবেছিল এতো বড়ো বাড়ি পেয়ে মা হয়তো খুশিই থাকবে। অথচ এখন দেখছে মা বাড়িটার উপরেই বিরক্ত। প্রসঙ্গ বদলাতে মিতুর সাথে কথা শুরু করে দীপ্ত...

-"মাম্মাম..এই বাড়িটা তোমার ভালো লাগে?"

একপাশে অনেকটা ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানায় মিতু।

-"কিন্তু এখানে যে তোমার কোনো বন্ধু নেই মাম্মা। তোমাকে একা একা খেলতে হয়। ভালো লাগে তোমার?"...

-"আমি তো বিট্টুর সাথে খেলি.. "হেসে বলে মিতু।

-" বিট্টু কে..?"..মিতুর কথায় বেশ অবাক হয় দীপ্ত।

-"ওই তো বিট্টু"..নিজের পুঁচকে আঙুল তুলে ছবিটার দিকে ইশারা করে মিতু।

পলকেই মায়ের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়, স্তম্ভিত হয়ে যায় দীপ্তও। এইদিকে মিতু ততক্ষণে কাকে যেন হাত নেড়ে ইশারা করছে। ঠিক যেন অপেক্ষা করতে বলছে কারোকে। মিনিট খানেক এমন করার পর, আবার বাবার কোল থেকে নেমে ছবির সামনে কার্পেটে গিয়ে বসে মিতু।

-"বললাম না তোকে..বাড়িটা ভালো না... "..ফিসফিস করে ওঠে মা।

দীপ্ত অবশ্য সেই সব কিছু ভাবছে না, তার মাথার তখন অন্য চিন্তা। এতোটুকু মেয়ের কি পার্সোনালিটি স্পিলিট করে..? তার জন্য কি মিতুর একাকীত্ব দায়ী?

★★★★★★★

পরদিন সকালে সোজা এ. সি. এফ স্যারের অফিসে গিয়ে হাজির হয় দীপ্ত। উনি এই অঞ্চলে বহুদিন আছেন। ওনার কাছে যদি ভালো মনোরোগ বিশেষজ্ঞর খোঁজ পাওয়া যায়, সেই আশাতেই আসা দীপ্তর। কিন্তু কপাল খারাপ। স্যার আজ সকালে জরুরি কাজে বোমডিলা গেছেন। ফিরতে রাত হবে।

বিফল মনোরথে নিজের অফিসে ফেরে দীপ্ত। দুপুরে লাঞ্চের পর টুকটাক কাজে মোটামুটি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, তখনই মায়ের ফোনটা আসে। মিতুকে নাকি বাড়িতে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি ফেরে দীপ্ত। কিন্তু হলঘরে ঢুকেই দেখে সোফার কোণায় গুটিসুটি মেরে বসে আছে মিতু। মেয়েকে দেখে ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ে দীপ্তর। কিন্তু মা ততক্ষণে হাউমাউ জুড়ে দিয়েছে। মা' য়ের বক্তব্য অনুযায়ী দুপুরে বেশ খানিকক্ষণ মিতু বাড়ি ছিলো না। মা নাকি তন্ন তন্ন করে সারা বাড়ি খুঁজে মিতুকে না পেয়ে বাধ্য হয়ে ফোন করেছিল দীপ্তকে। কিন্তু ফোন সেরে আবার হলঘরে এসে দেখে মিতু কার্পেটের উপরে বসে আছে। দীপ্ত আড়চোখে তাকায় মিতুর দিকে। ঠাম্মার চেঁচামেচিতে বেশ ঘাবড়ে গেছে বেচারি। সোফার কোণায় বসে জুলুজুলু চোখে একবার ঠাম্মাকে আর একবার বাবাকে দেখছে। মা' কে আশ্বস্ত করে ঘরে পাঠিয়ে মেয়েকে কোলে তুলে নেয় দীপ্ত, আদর করে মাথায় হাত বুলিয়ে বলে...

-"তুমি কেন দুষ্টুমি করে লুকিয়ে ছিলে? দেখো তো, ঠাম্মি কতো ভয় পেয়ে গেছে। "...

-" লুকায় নি তো। আমি তো বিট্টুদের বাড়ি গেছিলাম।"..

মেয়ের কথায় আজ প্রথমবার ভয় পেলো দীপ্ত। মিতুর সমস্যাটা যে দিনকে দিন বেড়েই চলেছে!! ওতো ইমাজিনেশন আর হ্যালুসিনেশন গুলিয়ে ফেলতে শুরু করেছে এইবার। অজানা ভয়ে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে নেয় দীপ্ত। মিতু তখন আবারও হাত তুলে আদেখা কারো উদ্দেশ্যে ইশারা করছে। আজও ওর মুখে রঙের হালকা ছোপ লক্ষ্য করে দীপ্ত।

★★★★★★★

সারাটা রাত ঘুম হয় না দীপ্তর। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মিতুকে ডাক্তার দেখাতেই হবে। অথচ আজ অফিস না গেলেই নয়। আজ জঙ্গলে প্ল্যান্টেশনের প্রোগ্রাম। চারা গাছ এসে গেছে, কুলি-মজুর সব প্রস্তুত। আজ অফিস না গেলে স্যারকে অনেক জবাবদিহি করতে হবে। মা' কে বারবার বাড়ির দরজা বন্ধ রাখবার নির্দেশ দিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় দীপ্ত।

সারাটা দিন জঙ্গলেই কেটে যায় তার। বিকালে বাড়ির পথ ধরবার পর পকেটের ফোনটা নাগাড়ে ভাইব্রেট করতে শুরু করে। গোটা দিন ফোনে নেটওয়ার্ক ছিলো না, এখন নেটওয়ার্ক পাবার পর নোটিফিকেশনের বন্যা বইছে। বিরক্ত হয়ে পকেট থেকে ফোনটা বের করতেই ভুরু জড়ো হয় দীপ্তর। বাড়ি থেকে সাতষট্টিটা মিশড কল...!!!

★★★★★★★

হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি পৌঁছতেই চোখে পড়ে মাকে। কেমন অসহায়ের মতো বারান্দাতে বসে আছে। বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে দীপ্তর। ওকে দেখেই ফুঁপিয়ে ওঠে মা...

-"দুপুরের পর থেকে মেয়েটাকে কোথাও পাচ্ছি না দীপ্ত।.. "

তন্নতন্ন করে খুঁজেও আজ আর কোথাও পাওয়া গেলো না মিতুকে। হলঘরের কার্পেটের উপরটা আজ বেবাক খালি। বিছিয়ে থাকা একরাশ ফুলের মতো আজ আর সেখানে বসে নেই মিতু। গেলো কোথায় মেয়েটা?? অবসন্ন দেহে সোফার উপর

বসে পড়ে দীপ্ত। বুকের ভিতটা মুচড়ে উঠছে অব্যক্ত যন্ত্রণায়। হঠাৎই দেওয়ালে টাঙানো ছবিটার দিকে চোখ যেতেই হাত - পা অবশ হয়ে আসে ওর। শিরা-উপশিরায় বয়ে চলা রক্ত যেন নিমেষেই জমাট বেঁধে গেছে। আজ ছবিতে ওই নেড়া গাছের তলায় বসে থাকা গোলাপি জামা পরা ছেলেটা আর একা নেই। ওর পাশে হলুদ সবুজ মেশানো ফ্রক পরা একটা বাচ্ছা মেয়েও বসে আছে, যার মাথার পশম পশম চুলে রিবন দিয়ে বাঁধা দুটো ঝুঁটি. . ! ! ! ওটা তো মিতু. . ! ! কিন্তু ও ছবির ভিতর গেলো কি ভাবে. . ? আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে দীপ্ত।

★★★★★★★

দিন দশেক হলো এই টেংগা ভ্যালিতে এসেছে অহনা। ওর স্বামী রঞ্জন এখানের নতুন ফরেস্ট রেঞ্জার। আগের রেঞ্জারের বাচ্ছা মেয়েটা হঠাৎ করেই হারিয়ে যাওয়ায় ভদ্রলোক চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কোলকাতা ফিরে গেছে। তার বদলে এসেছে অহনারা। এই বাংলোটা খুব সুন্দর। এটাকে মনের মতো করে সাজাবে অহনা। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে তুতুলকে নিয়ে। এখানে আসার পার থেকেই একা একা বড্ড বেশি কথা বলে ছেলেটা। অহনা জিজ্ঞেস করলেই হলঘরের দেওয়ালে টাঙানো একটা ছবি দেখায়। বলে ছবির ভিতরের বাচ্ছা দুটোর নাম না কি বিট্টু আর মিতু। ওরা নাকি খেলতে আসে তুতুলের সাথে।

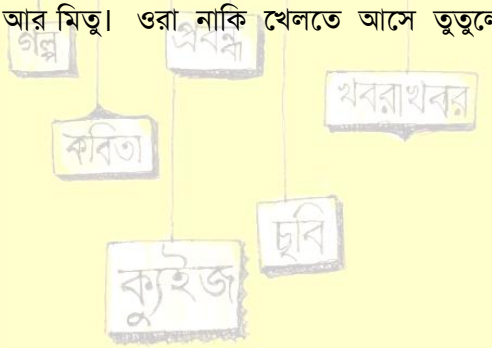

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

একটি নদীর জন্ম

আহমেদ সাকির

এক

অর্কদীপ ইচ্ছে করেই নৈশার ফোনটা রিসিভ করল না। অন্য সময় হলে খুশিই হত, কিন্তু ইদানীং এড়িয়ে যেতে পারলেই যেন বাঁচে। চোখেমুখে একরাশ বিরক্তির ডালপালা ছড়িয়ে নিজের মনে মনেই বলল, ' আবার কা ফ্যাকড়া বাঁধালেই কে জানে ?'

এই নিয়ে গত একমাসে বেশ কয়েকবার ফোন এসেছে নৈশার কাছ থেকে। মাঝে একদিন তো ফোন করে কেঁদেই ফেলেছিল, যেবার রৌরিক টানা এক সপ্তাহ ওর সঙ্গে কথা বলেনি। ওর মনে হয়েছিল সমস্ত জগৎ যেন শূন্য -- নদী, সাগর, আকাশ, বাতাস, সব যেন বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন। কোথাও কিচ্ছুটি নেই। ওর পায়ের তলার মাটি যেন আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে।

কাঁদতে কাঁদতেই সেবার বলেছিল, ' হামার সাঙেই কা' লে বারবার এসান হয়েলা রে অর্ক ?'

অর্কদীপ হকচকিয়ে গেছিল। ভেবেই পাচ্ছিল না কী বলবে তাকে। তবু তো কিছু একটা বলতেই হয়। অসময়ের বান্ধবী ব' লে কথা! সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, ' সময়ের হাতেই ছাড় দেলি। দেখবে একদিন সব ঠিক হয় যাতেই।'

-- কবে সেদিন আওই অর্ক ?

-- ধৈর্য ধারিন। জানিল লাতো, ধৈর্যের শিকড়টা খুবই তিতা। কিন্তুক ফলটা ? সে তো খুবই মিষ্টি!

-- ঘূর্ণিঝড়ে হামার সাধেক নৌকা যে ক্রমশ তলায় গেলা!

-- ওই ঝড়টাকেই গতি হিসাবে ব্যবহার কারিন না নৈশা। দেখবে নৌকা তরতর কারকে আগুয়া যাতে।

এইজন্যই তো অর্কদীপ নৈশার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। ওর কথায় যেন ম্যাজিক আছে। এবং সত্যিই ম্যাজিকের মতোই কাজ হয়। অর্কদীপই সেবার মধ্যস্থতা করে তাদের

মধ্যেকার মনোমালিন্য দূর করে। তাদের আকাশে ফের চাঁদ উঠেছিল, নীল জ্যোৎস্নায় ভিজেছিল ওরা।

নৈশার কথা বলার ধরনটা তার জীবনের মতোই। স্থান বিশেষে পাল্টে নেওয়া। স্কুলপাশ মেয়ে তো, জানে কোথায় কী বলতে হয়। অর্কদীপও ওর সঙ্গে কথা বলার সময় ওদের গ্রাম্য ভাষাতেই কথা বলে।

নৈশার ফোন বেজেই চলেছে। শেষমেষ বিরক্তিটাকে পাঁচশো হাত দূরে ঠেলে দিয়ে ফোনটা রিসিভই করে ফেলল অর্ক।

ওপাশের গলাটাকে বেশ উৎকণ্ঠিতই শোনাল, ' ব্যস্ত হান ?'

অর্কর আইডিয়া তাহলে ভুল হয়নি, নিশ্চয় আবার কোনো ফ্যাকড়া বাঁধিয়েছে। শান্ত স্বরেই বলল, ' না।'

-- কা কেরাথিন ?

-- ওসনে হাই। ভূমিকা শেষ। এবার আসল কাথাটা কে ?

নৈশার কুশলবার্তা -জ্ঞাপনের কৌশলকে অর্কদীপ গায়ে মাখতে চায় না। সে জানে নৈশা হয় গিফট কেনার জন্য কোনো শপিং মলে যেতে বলবে, আর তা নাহলে টাকা ধার চাইবে।

অর্কদীপের কাছ থেকে ওরকম প্রশ্ন শুনে নৈশা একটু হাসল। বললে, ' কিছু টাকা লাগি। ধার দেবে ?'

-- কেতেই ?

-- সাড়ে তিন হাজার।

নৈশার এই আদিখ্যেতা অর্কদীপের একদম ভালো লাগে না। এ যেন হাঁড়িতে নেই ভাত, অথচ আত্মীয়কে জোর করে থাকতে বলা। কিন্তু মুখের ওপর কিছু বলতে পারল না। নৈশা তাকে এক সপ্তাহ সময় দিয়েছে। এর মধ্যে যে-করেই হোক, টাকাটা তার চাই-ই।

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

অর্ক আর নৈশার একই গ্রামে বাস, দুটো পাড়া শুধু আলাদা। ওরা দু' জনেই কলেজে পড়ে। সেইসূত্রেই মাঝেমধ্যে নৈশা ওর কাছ থেকে টাকা-পয়সা ধার নেয়, আবার সুযোগ মতো ফেরতও দেয়।

নৈশার প্রতিজ্ঞা ছিল কোনোমতেই সে ওসব প্রেম-ট্রেমের ধার মাড়াবে না। এতদিন মাড়ায়ও নি। কিন্তু কীভাবে যে কী হয়ে গেল, নতুন গাছে হঠাৎই যেন কুঁড়ি ধরল, মিষ্টি গন্ধে চারপাশটা ভরে গেল, আর মৌমাছিও আসল গুনগুন করে। সেই গুঞ্জনে ও নিজেই চমকে গেল।

এই চমকের আরও বাকি ছিল। সে শুনেছিল তার দূর সম্পর্কের এক দিদি, যে বিয়ের পর কলকাতায় থাকে, তার মস্ত বাড়ি, মস্ত মস্ত গাড়ি। স্বামী চাকরি করে ব্যাংকে। সেই দিদি ছেলে-বশ করায় পটু, যারে বলে এক্কেবারে সিদ্ধহস্ত। তার মরদ মদ গিলে রাতে খাটের তলায় শোয়, আর মাগির বুকের ওপর নাচে এক তাগড়াই মিনসে। মিনসেটা নাকি তার ছেলেমেয়েকে পড়ায়। শুধু টাকা নয়, প্রচুর গিফটও নাকি দেয় তাকে। পাঁচকানে এসেছিল কথাটা নৈশার কাছে।

তো সেই লাঙশোয়ারি দিদির ফর্মুলায় রৌরিককে বাঁধতে চাইছে নৈশা। সেইজন্যই তো অর্কদীপের কাছে টাকা চাওয়া।

নৈশার বাড়ির তিনটে গ্রামের পরে রৌরিকের গ্রাম। রৌরিক পড়াশোনার জন্য কলকাতায় থাকে। উচ্চ মাধ্যমিক দেবার পর কলকাতায় পড়ে আছে। জয়েন্ট দিচ্ছে, পাশ করতে পারছে না। বড়ো হয়ে ডাক্তার হবার শখ তার।

সেই রৌরিক অনেকদিন বাদে গ্রামে ফিরেছে। চোখে রোদ-চশমা, কানে তার গোঁজা, গান শুনতে শুনতে যাচ্ছে। পায়ে কিটো, পরনে গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট। ঘাড়ের ডানদিকে উল্কি করানো, একটা সাপ লকলকে জিভ বের করে ফণা উঁচিয়ে কাকে যেন খুঁজছে। শহরের হাওয়ায় সে এখন রীতিমতো কলকাতাবাবু।

নৈশাকে দেখে নিজের ফোন নাম্বার বাতাসে উড়িয়ে দিল সে। নৈশা কিছু বলেনি, শুধু পাশ ফিরে আড়চোখে দেখেছিল একবার। ছেলেটা তো বেশ হ্যান্ডসাম, দেখতে বেশ সুন্দর। ছেলেটার পারফিউমের গন্ধ নৈশার বুকের ভেতর অকালবৈশাখীর ঝড় তুলল।

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

বাড়ি ফিরে নৈশা সারারাত ভেবেছে। তার বুকের ভেতর সাঁতরে চলেছে কোনো এক সোনার তরি, জ্যোৎস্নার আলোয় অপরূপ লাগছে সেই নৌকাকে, সেখানে গোলাপ হাতে হাঁটু মুড়ে এক স্বর্গীয় পুরুষ তাকে ডাকছে। সেই ডাকে নৈশা সাড়া না দিয়ে পারেনি।

বৃষ্টি নেমেছে প্রচণ্ড। মাঠ ভিজছে, কাটা ধান ভিজছে, ঘরের ফুটো থেকে জল পড়ছে, ছোটো ছেলেটা ভিজছে, হাঁসের পিলে ভিজছে, ওরা দুটোও ভিজছে। এখন মাঝেমধ্যেই ওরা বৃষ্টি ডেকে আনে, বৃষ্টিতে ভিজতে থাকে।

তবে শুধু তো আর বৃষ্টি আসে না, সেই সাথে আসে বজ্রপাত। প্রেমসায়রে নৌকা-বিহারের সময় হঠাৎই তেড়ে এল বিজলি রেখা। সারদা কাণ্ড। রৌরিক এজেন্ট ছিল, ওর মাথায় যেন গোটা আকাশটাই ভেঙে পড়ল, নৌকা টলমল।

কান্নায় প্রায় ভেঙে পড়ে রৌরিক, ' কী হবে এখন ? পরিস্থিতি যেদিকে গড়াচ্ছে টাকা ফেরত না দিলে কী হবে ভেবে দেখেছ ?'

ভাবেনি আবার নৈশা ? এই কদিন ধরে তার চোখে কোনো ঘুম নেই, ছোপ ছোপ কালি জমেছে চোখের নীচে। দিনরাত্রি চাপা টেনশন। কীভাবে এই চোরা শীতল অক্টোপাস থেকে বেরিয়ে আসবে তার হদিশ খুঁজছে নিরন্তর। কিন্তু নাঃ! খোঁজাই শুধু সার। বিশেষ কিছু পজিটিভ দিক সে খুঁজে পাচ্ছে না। ম্লান হতাশকণ্ঠেই বলল, ' রুকু, বেয়াড়া পার্টিগুলোকে না হয় কিছু কিছু দাও।'

রৌরিকের নামটা কেমন যেন খটমট, উচ্চারণ করতেই দাঁতে জিভ জড়িয়ে যায়। নৈশা ওকে আদর করে ' রুকু' বলে ডাকে।

-- আর বাকিগুলোকে ? তারা শুনলে তো ছিঁড়েকুড়ে খাবে!

-- আত্মীয়-স্বজনকে বুজিয়ে-সুঝিয়ে কিছুটা ম্যানেজ করো। আরে বাবা, আগে নিঃশ্বাসটা তো নাও, পরে আলো মাটি খুঁজো।

কমিশন থেকে পাওয়া মোটা টাকায় বাইকটা শেষপর্যন্ত রৌরিক বিক্রি করে দিয়েছিল। বাকিটা ব্যবস্থা করেছিল নৈশা। সে অর্কদীপের কাছ থেকে কিছু ধার করেছিল আর নিজের হার বন্ধক রেখে পেয়েছিল কিছুটা। বাড়িতে বলেছিল হারটা চুরি গেছে।

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

দুই

মাঝখানে চাঁদের গায়ে মেঘ ছুঁয়ে থাকার মতো অনেকটা দিন কেটে গেছে। নৈশা ফোন করে না, হারের ব্যথাটা এখনও দগদগে। রৌরিকও ফোন করে না। কলকাতায় ফিরে গেছে, কোন্ এক দিদির বাড়ি নাকি। সেখানে থেকে পড়াশোনা করছে। অনেক উঁচুতে উঠতে চায় না, অনেক বড়ো হবে।

হোক, খুব বড়ো হোক ওর রুকু। ও তো তাই-ই চায়। রাগে অভিমানে নৈশা প্রায় কেঁদেই ফেলে, তাই বলে মানুষ এতেই অকৃতজ্ঞ হবে! একটা খোঁজও নেই লেলাই!

রাত দশটা বাজে বোধ হয়। বাইরেটা গুমোট অন্ধকার। নৈশা আর থাকতে পারল না। আরও অন্ধকার চায়, তাপ চায়। রৌরিককে ফোনে পেল তিনবারের মাথায়। টুকিটাকি বেদনা-সমবেদনার পালা চুকানোর পর রৌরিক বলল, ' এখন তো যেতে পারবই না। হাতে একটু কাজ আছে যে।'

-- জানি তো, তুমি এখন খুব ব্যস্ত। তা সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজটা কী, সেটা কি বলা যাবে ?

-- দিদির ছেলেমেয়েকে পড়াতে হচ্ছে। সামনে আমার পরীক্ষা, পড়ার চাপ আছে। তাছাড়া --

বলতে গিয়েও পুরোটা বলতে পারে না সে, আঠালো থুতুর মতো আটকে যায় জিভের আগায়।

নৈশার আর তর সায়ছিল না। তার কৌতূহলের পারদ বাড়তে থাকে চড়চড় করে।

-- তাছাড়া কী ?

-- গেলেই তো শুধু তাগাদা দেবে। দেখলে কি আর রক্ষে আছে ? শকুনের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে টাকার জন্যে।

-- ও, তাই!

রাগে ফোন কেটে দিয়েছিল নৈশা। রৌরিকের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করেনি আর। তার বুকের ভেতরটা মুহূর্তেই যেন খাক হয়ে গেল।

দুদিন পর নৈশা আবার ফোন করল। একটু ভয় ভয়ও লাগছিল, কী জানি রুকু ফোন ধরবে তো ? হয়তো ধরেই ওকে যাচ্ছেতাই ব' লে দিল, ওর যে খুব খারাপ লাগবে। তখন যে আরও বেশি কষ্ট হবে। কিন্তু নিজেকে সে সামলাতে পারল না। কীভাবে সামলাবে? ছায়ার বিরুদ্ধে কতক্ষণ যুদ্ধ চলে ? চলে না।

ফলে নৈশাও লজ্জার মাথা খেয়ে শেষমেষ ফোনটা করেই ফেলল। কিছুক্ষণ রিং হওয়ার পর ও-প্রান্তের গলা শোনা গেল, ' হ্যালো। হ্যাঁ, কে বলছেন আপনি ?'

চমকে ওঠে নৈশা। হঠাৎ অপরিচিত কণ্ঠস্বরে ভয়ও পেয়ে যায়। রং নাম্বার না তো? অবশ্য ও-প্রান্তের নামটা শোনার পর বুঝল, না, ঠিকই লেগেছে তাহলে। রুকুর দিদিভাই।

দু' জনেই সেদিন ভুলভাল নাম-ঠিকানা বলেছিল। এসব বেরিয়েছিল রৌরিকের মাথা থেকে। সেইজন্য রৌরিক নৈশার নামটা পর্যন্ত সেভ করে রাখেনি ওর ফোনে।

দিদিভাই তো বেশ সরল মনের। কী সুন্দর কথা বলে। ধীরে ধীরে, গুছিয়ে গুছিয়ে। নিজের কথা, বাচ্চাদের কথা, স্বামীর কথা, রৌরিকের কথা। আরও কত রাজ্যের কথা। কলকাতার মেয়ে তো, সব জানে। কী আপডেটেড! দেশবিদেশের সব খবর রাখে ও। গাছের পাতায় রোদের মতো দিদিও যেন নৈশার সমস্ত আবেশে উত্তেজনায় অনুভবে লেগে থাকে, আস্তে আস্তে মিশে যায়।

-- কী করছেন দিদিভাই ?

-- এই বসে আছি।

-- বসে ?

-- হ্যাঁ। বসে বসে খেলছি।

-- কী খেলছেন এই রাতদুপুরে ?

-- কত কী! আপাতত কাটাকুটি। অঙ্কের কাটাকুটি।

-- তাই ?

-- হ্যাঁ। এতে দারুণ মজা! দারুণ সুখ!

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

-- কী করতে হয় এতে ?

-- একদিন আসিস, তখন দেখিয়ে দেব। তারপর চুটিয়ে খেলব দু' জনে মিলে।

আসল খবরটাই তো নেওয়া হল না, ওর রুকু কী করছে। একটু আগে ফোন করেছিল, কল নট রিচেবল বলল। একমাত্র দিদির কাছ থেকেই জানা যেতে পারে ওর খোঁজখবর। তবু এত রাতে রৌরিকের কথা জিগেস করতে ও ইতস্তত বোধ করল। তাই ও-রাস্তায় গেল না, ঘুরপথে বললে, ' দিদিভাই, জামাইবাবু কী করছেন ?'

-- কী আর করবে! খেয়ে-দেয়ে নাক ডাকাচ্ছে।

-- আর গিনি-মান্তুরা ?

-- রৌরিকের কাছে পড়ছে।

নৈশা আর কথা বাড়ায় না। বড্ড বেশি কৌতূহল দেখালে দিদিভাই কী মনে করবে কে জানে। থাক না, আগে দিদিভাইকে ভালো করে পটিয়ে নিই। তারপর না হয় দিদির বাড়ি যাওয়া যাবে মাঝেমধ্যে। তার শরীর কেঁপে ওঠে উত্তেজনায়। হঠাৎ পরিবেশটা গরম হয়ে ওঠে। বুকে পারদ ওঠে চড়চড়িয়ে।

দিদি আর নৈশা এখন স্বপ্নের জগতে ঘোরাফেরা করে প্রায়ই। দিদি নৈশাকে ফোন করে, তো নৈশাও দিদিকে, চ্যাটিংয়েও আসে মাঝেমধ্যেই। শুধু আপশোশ দিদিকে একবারও চোখের দেখা দেখতে পেল না। কী করে দেখবে ? দিদির যে ভিডিও কলে কথা বলতে ভালো লাগে না, ছবি পাঠাতেও অ্যালার্জি।

-- চাঁদের গায়ে এবড়োখেবড়ো জিনিসগুলো কী জানতে পারলে তখন আর চাঁদের প্রতি এত আকর্ষণ থাকত ? কিছু জিনিস না-হয় এভাবেই রহস্যে থাক না! একদিন দেখা তো হবেই।

দেখা হচ্ছে না তো কী হয়েছে, কথা তো আর থেমে নেই। এখন ডুমুর পাতার নীচে টুনটুনি লেজ নাড়লে কিংবা আমগাছের ডালে দোয়েল পাখি শিস দিলে মনে হয় দিদিভাই কথা বলছে, মিটিমিটি হাসছে। শুধু রাতে নয়, এখন দুপুরেও নৈশা ফোন করে দিদিকে।

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

-- কী করছেন ?

-- স্নানে যাব। যা গরম পড়েছে!

-- হ্যাঁ, বড্ড গরম! শরীরে কীসের জন্যে যেন হাসফাঁস।

-- শরীর ঠান্ডা করতে হবে।

-- কীভাবে ?

-- বড়ো পুকুরে স্নান করো। ঠান্ডা হও।

-- পাব কোথায় ?

-- খুঁজে নাও।

-- আপনি পেয়েছেন ?

-- করে নিতে হয়েছে।

-- কীভাবে দিদি ? -- নৈশার শরীরে যেন জোয়ার ওঠে। দ্রুত লয়ে নিঃশ্বাস পড়তে থাকে তার।

-- ঘরে পুকুর কেটেছি।

-- ঘরে ? -- ঘোর লেগে যায় নৈশার।

-- হ্যাঁ।

-- মানে ঘরের ভেতরেই ?

-- হ্যাঁ রে বাবা! বড়ো বাথটব কিনে রেখেছি। ইচ্ছেমতো ডুবলেই শরীর ঠান্ডা, এক্কেবারে ঝক্কাস!

-- সত্যি ?

-- তা নয়তো কী!

-- জামাইবাবু তখন কী করেন ?

-- ও তো কোলাব্যাং। ঠান্ডা শরীর। বাথটবের খুব ভয় পায়। আমি যখন গা ডুবিয়ে রাখি, ও তখন খাটের তলায় গিয়ে লুকিয়ে থাকে। নাক ডাকায়।

নৈশা আকাশে উড়ছিল, একেবারে সোজা স্বর্গে। পুলকে আনন্দে শিহরণে তার শরীরে যেন মাদকতা সৃষ্টি হল। শরীর কেঁপে উঠল থেকে থেকে। শরীরে ভূমিকম্প হল ব' লে। আচ্ছা, দিদিভাইকের গতর কেসান হায় ? চামড়া কি হামার নিয়ার মুদে রঙের ?

না, না, তা কেন ? কলকাতার মেয়ে, কত ক্রিম, ফেস-পাউডার, লোশন মাখে। বিউটি পার্লারে যায়েলা, স্পা কারায়লা। আঁইখে আইলাইনার লাগায়লা, মাস্কারা লাগায়লা। আচ্ছা, গা-টা কি হামার নিয়ার টাইট-মার্কা, না নরম-সরম ? দিদিভাইকের গতরে কি ঢেউ আয়েলা, আছড়ে পড়ে হামার নিয়ার ?

নৈশা এক স্বপ্নের জগতে পা ফেলে। আকাশে ওড়ে, উড়তেই থাকে।

তিন

স্বাধীনতা দিবসের আর তিনদিন বাকি। রৌরিক ফোন করেছিল, স্বাধীনতার দিন নৈশাকে নিয়ে কলকাতায় সিনেমা দেখবে -- 'চেন্নাই এক্সপ্রেস'। সেখানেই নৈশা তাকে গিফটটা দিতে চায়। অর্কদীপকে সেজন্যই ফোন করে টাকাটা চেয়েছিল।

নৈশার ফোনটা বেজে উঠল। দৌড়ে গেল, রুকু ছাড়া আবার কে ? বেশ কদিন ধরে ওদের মধ্যেকার শীতল বরফ অনেকটাই গলে গেছে। এবার এক্সপ্রেসের মতোই ছুটবে ওরা। শরীরের তাপ বার করবে, ভিজে নেয়ে একাকার হবে।

নামটা না দেখেই ফোন রিসিভ করেই বুঝল, না তো অন্য কেউ। স্তিমিত আবেগকে সামলে নিয়ে বললে, 'হ্যাঁ দিদিভাই, বলো কী বলছ ?'

হঠাৎই সবকিছু কেমন তালগোল পাকিয়ে যায়। সে দিদিকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করে ফেলে।

দিদির গলাটা বেশ জড়ানো, কিছুটা কম্পিত মনে হল তার। এতদিন তো এরকম মনে হয়নি। তাহলে আজ কী হল ? নৈশা কিছু বলতে যাবে, এমন সময় উল্টোদিক থেকে ভেসে এল -- 'কাল কি ফাঁকা আছ ?'

-- কেন দিদিভাই ? -- ঘোরের মধ্যে অভিনিবিষ্ট হয় নৈশা।

-- একবার দত্তপুকুরে আসতে পারবে ?

-- কাল একটু যে কেনাকাটা করব ভাবছিলুম।

-- ওটা না হয় একদিন পরেই কিনো। স্বাধীনতার তো এখনও তিনদিন বাকি।

নৈশা চমক খায়, ঘোরগ্রস্ততা কেটে যায়। স্বাধীনতার ব্যাপারটা তাহলে দিদি জানেলা ? জানুক গে, রুকু হয়তো দিদিকে কেহেই। এর আগের গিফটগুলো তো দিদিকে দেখালেই। এবার তাই হয়তো আগাম ভাব লেহেই।

উত্তেজনায় সারা রাত্রিটা দীর্ঘ বিলম্বিত মনে হল। মৈত্রেয়ীকে অনেক কষ্টে ম্যানেজ করা গেছে, সমস্ত হ্যাপা সে-ই সামলে নেবে। ঘরে-বাইরে যেভাবে শ্লীলতাহানি-ধর্ষণের বহর বাড়ছে, তাতে করে একা বাইরে বেরোনোটাই ঝুঁকি। পরিচিতরাই সুযোগের ফায়দা নিচ্ছে। নৈশার ক্ষেত্রে যদি এমনটা হয়, সকলে মিলে মৈত্রেয়ীকে কাটাছেঁড়া করবে। মৈত্রেয়ী এক পা এগোয়, তো দু পা পিছিয়ে আসে। নৈশার ভেতরে তখন অচিন পাখি ডাকছে, মৈত্রেয়ীর কানে আসে সেই কূজনটা, সব বোঝে, বুঝে রাজি হয় শেষমেষ।

খোলাপোতা থেকে বাস ধরে সোজা দত্তপুকুরে পৌঁছায় নৈশা। তারপর ফোন করে দিদিকে ডেকে নেয়। দিদিভাই আসছে, ভারী উত্তেজনা হয় তার ভেতরে। দিদিভাই দেখতে এসানেই, আঁইখ টানাটানা, আইলাইনার-মাস্কারার রহস্যময়তা, নাক টিকালো, ঠোঁট তরঙ্গায়িত, দিদিভাইকের হাতে পদ্মের লাবণ্য, চুলে সাগরের ঢেউ। উফঃ! কেসান সুন্দর! কলকাতার মেয়ে তো, সুন্দরী হবেই।

দিদি কাছে আসে। বলে, 'নৈশা, তুমি এখানে ? একা কী করছ ?'

নৈশা যেন চমক খায়। অনভিপ্রেতের মতো চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না সে। আরে ই তো সেই দূর সম্পর্কের দিদিটা! ই আবার কেখান আলায় ?

নৈশার বুক ধড়ফড় করে ওঠে। মনে হল পায়ের নীচে চোরাবালি, সে যেন কোথায় তলিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ খুব ভয় পেল ও। শঙ্কিত বিমর্ষ মুখে বললে, 'আমার এক দিদির আসার কথা ছিল।'

-- এখনও আসেনি বুঝি ?

-- না। এই আসল ব'লে।

দেরি হচ্ছে দেখে ইতিউতি তাকায় নৈশা। দিদিভাইকে ফোন করে। সুইচ অফ। দু'বার। তিনবার। প্রত্যেকবারই সুইচ অফ। ধাঁধা লেগে যায় নৈশার চোখে, অমাবস্যার নিশার অন্ধকারের মতো।

নিজেকে নিয়ে চিন্তার সাগরে ডুবে যাওয়ার জন্য দিদির দিকে তাকানোর ফুরসত পায়নি এতক্ষণ। দিদিকে দেখে চমকে উঠল, পোশাক ভিজে -- 'গায়ে এত রক্ত কীসের ?'

দিদি তেমনি নির্লিপ্তভাবেই বললে, 'যুদ্ধের রক্ত।'

-- যুদ্ধ!

-- হ্যাঁ।

-- কার সাথে ?

-- কাল রাত্তিরে বাথটবে কিছুতেই ঠান্ডা হচ্ছিলাম না। সজোরে দিয়েছি এক লাথি। বাথটবটা ভেঙে গেছে।

-- তারপর ?

-- তার কিছু কণা এসে আমাকে এলোপাতাড়ি আঘাত করল।

নৈশা সেদিন দিদিভাইকে দেখতে পায়নি, দিদিভাই আসেনি। দিদিভাই আসেনি, দিদিভাইয়ের ছায়া এসেছিল। দত্তপুকুর গেল, ফোনে কথা হল। দিদিভাই আসছে, মনে খুশবই উড়ছে। দিদিভাই এল না। সুইচ অফ, বাথটব, শরীর গরম, শরীর ঠান্ডা, রক্তে কাপড় ভিজে।

নৈশার স্নায়ু-কোশে রক্তসঞ্চালন প্রবাহ তড়িৎগতি।

তার বাপ-মা এ বিয়ে মেনে নেবে না। সে স্বাধীন নয়, তাকে ঘর ছাড়তে হবে চুরি করে, হয়তো চিরজনমের মতো। স্বাধীনতার দিনে সত্যিকারের স্বাধীন হবে, রুকুর হাত ধরে পালাবে।

নৈশা পালাবে, এক্সপ্রেসের মতো ছুটবে, ভিজবে ঘোর বর্ষায়। আর তার আগে সুইচ অফ, বাথটব, শরীর গরম, শরীর ঠান্ডা, রক্তে কাপড় ভিজে! নৈশার বুঝতে বাকি থাকে না তার সাধের এক্সপ্রেস মুখ থুবড়ে পড়েছে। অসহ্য তাপে তার শরীর পুড়ে যায়, শুকিয়ে যায়। বজ্রপাতের দহনে ঝলসে যায় তার হৃৎপিণ্ডটা। মরদ ভেড়ো, মাগ লাঙশোয়ারী। সুইচ অফ, বাথটব, শরীর গরম, শরীর ঠান্ডা, রক্তে কাপড় ভিজে, খাটের নীচে ভেড়ো, ভেড়ো নাক ডাকায়।

নৈশা অর্কদীপকে ফোন করে -- 'অর্ক, টাকা নেই লাগি। উকের সে হামে বড়ো গিফট পাইহী।'

-- কাকের গিফট ?

-- স্বাধীনতার। আঁখ খইলে!

বাস থেকে নেমেই নৈশা দ্রুত হাঁটা দেয়। অন্ধকার নেমে আসছে। বাড়ি ফিরতে হবে। শেষ বিকেলের আলোর নিশানা ধরে জোরে জোরে পা চালায় সে।

আত্মহত্যার আগে

মৌমিতা ঘোষ

'এই, সুশান্তের খবর টা দেখলি? কি কাওয়ার্ড রে! এইভাবে কেউ স্যুইসাইড করে বল তো! আমি জাস্ট মেনে নিতে পারছি না' – ওপারে ফোনটা ধরে 'হ্যালো' বলার সঙ্গে সঙ্গে এপার থেকে তড়বড়িয়ে বলে ওঠে ঊর্বী।

'কি হয়েছে তোর? কি বকছিস এসব?' – নির্লিপ্ত গলায় বলে অপালা।

'সুশান্ত সিং রাজপুত আত্মহত্যা করেছে। দেখিসনি খবরটা?' – আবার উত্তেজিত গলায় বলে ঊর্বী।

'দেখেছি। কিন্তু তাতে তোর এরকম পাগলামি করার কারণ বুঝলাম না!'

'তুই কি রে! অত সুন্দর একটা ছেলে আত্মহত্যা করল, এরকম অসময়ে চলে গেল, তোর খারাপ লাগছে না?'

'আচ্ছা ঊর্বী, সুশান্তকে যদি দেখতে খারাপ হত, তাহলেও কি তোর এতটাই কষ্ট হত?'

'এ আবার কি প্রশ্ন অপালা? হঠাত এমন জিজ্ঞেস করলি কেন?' – একটু থমকে গিয়ে পালটা প্রশ্ন করে ঊর্বী।

'জানিনা কেন বললাম, হঠাত মনে হল। আসলে কি বলতো, সুশান্তের মত অনেকেই তো রোজ মরে যাচ্ছে, কারোর কারোর দেহটায় প্রাণ থাকছে, কিন্তু আত্মাটা কবে মরে গেছে। তাই মনে হচ্ছিল, আত্মার মৃত্যু কি আত্মহত্যা নয়?'

'কি হয়েছে তোর অপালা? আবার ঝগড়া হয়েছে সুমিতের সাথে?' – একটু চিন্তিত গলায় বলে ঊর্বী।

'না রে, নতুন করে আর কি হবে! আমাদের ওসব নিত্য অশান্তি, লেগেই আছে। আসলে সুশান্তের মৃত্যুটা একটা বড় ধাক্কা দিয়ে গেল রে। বাদ দে, তোর খবর বল, কি চলছে?' – অপালার কথার আড়ালে চাপা দীর্ঘশ্বাস শুনতে পায় ঊর্বী।

অপালা আর ঊর্বী সেই ছোটবেলা থেকে একে অপরের সাথে রয়েছে। সবাই ওদের বলত কুম্ভমেলায় হারিয়ে যাওয়া বোন। স্কুল, কোচিং, পড়াশুনোর দিনগুলো থেকে শুরু করে অপালার বিয়ের আগেরদিন পর্যন্ত ওদের কেউ খুব একটা আলাদা করতে পারেনি। বিয়ের পর অপালা যখন চলে যাচ্ছিল, ওদের দু'জনের কান্না দেখে ওখানে উপস্থিত খুব কম মানুষই নিজেদের চোখের জল ধরে রাখতে পেরেছিল। শুধু অপালার সদ্য বিবাহিত স্বামী সুমিত একবার চাপা গলায় বলে উঠেছিল, 'যত্ত ঢং!' কেউ শুনতে পায়নি, শুধু ঊর্বী শুনেছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে ওঁর চোখ পড়ে গেছিল সুমিতের দিকে, তাই ঠোঁটের ভাষা পড়তে খুব একটা অসুবিধে হয়নি ওর। আর সেই মুহূর্তেই বুকের ভেতরটা কেমন যেন ধ্বক করে উঠেছিল ওর প্রিয় বন্ধুর জন্যে! এই ছেলেটার সাথে ওর বন্ধুটা ভাল থাকবে তো? অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠেছিল ঊর্বীর বুকের ভেতরটা!

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

অপালা ছোট থেকেই খুব চাপা। ওর কাছে অনেকে নিজেদের কষ্টের কথা বলে হালকা হত, কিন্তু অপালাকে কেউ কোনোদিন নিজের সমস্যা নিয়ে কারোর সাথে কথা বলতে দেখেনি। শুধু ঊর্বীর কেন কে জানে, ছোট থেকেই মনে হত অপালা ওঁর বাড়িতে একটু যেন অবহেলিত। ঊর্বীর বন্ধুটাকে সুন্দরী বলা যায় না কোনোভাবেই। অপালার গায়ের রঙ বেশ চাপা, চেহারার গড়নও বেশ গোলগাল। যখন ওরা একসঙ্গে স্কুল যেত, তখন 'মোষ' থেকে শুরু করে 'মা কালী' অবধি অনেক টিটকিরিই ধেয়ে এসেছে ওর প্রতি, কিন্তু অপালার কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি সেই নিয়ে। এমনকি ঊর্বী যদি কখনো নিজে থেকে কিছু বলতে যেত, 'ধুস, ওসবে আমার কিছু আসে যায় না' – বলে ওকে থামিয়ে দিত অপালা। ঊর্বী বিশ্বাস করত মেয়েটা অন্য ধাতুতে গড়া, ঠিক আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মত নয়। আর তখন থেকেই সমবয়সী অপালার প্রতি একটা শ্রদ্ধার জায়গা তৈরী হয়ে গেছিল ওর মনে।

বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে অপালা। বাবা- মায়ের একমাত্র সন্তান। কিন্তু ঊর্বী যখনই ওদের বাড়িতে গেছে, কেমন যেন অবহেলিত মনে হয়েছে অপালাকে। মনে হয়েছে ও বা ওদের অন্যান্য বন্ধুরা বাবা- মায়ের কাছে যে ভালবাসাটা পায়, অপালা সেইটা পায়না। কেমন যেন দুঃখিনী রাজকুমারীর মত মুখ বুজে নিজের কাজটুকু করে চলেছে মেয়েটা। অনেকবার জিজ্ঞেস করার কথা ভেবেও জিজ্ঞেস করতে পারেনি ঊর্বী। আর এই করতে করতেই ওরা কখন যেন স্কুল- কলেজের গন্ডী পেইয়ে বড় হয়ে গেছে। অপালা পড়াশুনোয় বরাবরই ভাল। নিজের চেষ্টায় কলেজ পাশ করেই বেশ ভাল একটা চাকরি পেয়েছিল ও। একটা নামী ব্র্যান্ডের পোশাকের কোম্পানীতে ইস্টের মার্কেটিং সামলাতে জয়েন করল ও, আর তারপরেই হঠাত করে ওর বাবা- মায়ের মধ্যে ভীষণ ব্যস্ততা দেখা দিল ওর বিয়ে দেওয়া নিয়ে। ওরা তখন সবে তেইশ পেরিয়ে চব্বিশ, ঊর্বী বা ওর অন্যান্য বন্ধুদের বাড়িতে বিয়ে- টিয়ে নিয়ে তেমন কথাই ওঠে না, সেইসময়েই অপালার মা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ওর পাত্র দেখতে। কালো মেয়েকে তাড়াতাড়ি পাত্রস্থ করার চেষ্টা না করলে নাকি পরে অপালার আর বিয়েই হবে না, এমনটাই বলেছিলেন ওর মা।

'কাকিমা, একবার তো অপালাকে জিজ্ঞেস করতে পারতে ও এখন বিয়ের জন্যে তৈরী কিনা!' – একদিন থাকতে না পেরেই বলে ফেলেছিল ঊর্বী।

'তৈরী না হওয়ার কি আছে ঊর্বী? বয়সটা তো কম হল না! ওর বয়সে আমার বাচ্চা হয়ে গেছিল। আর তাছাড়া ওর মতামত শুনে বসে থাকলেও তো চলবে না আমাদের, তাই না? ওর বর পাওয়া তো আর অত সোজা নয়!'

খুব খারাপ লেগেছিল ঊর্বীর ওনার কথাটা শোনার পর। মা যদি মেয়ের সম্পর্কে এমন কথা বলেন, তাহলে সে মেয়ে আর কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? পাত্র পেতে বিশেষ দেরি হয়নি মেয়েটার, আর আশ্চর্যের ব্যাপার হল, রেজিস্ট্রির আগে কোনোদিন ওর সাথে পাত্রের মুখোমুখি দেখাও হয়নি।

'অপালা, তুই চাস তো রে বিয়ে করতে?' – ওর বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ার পর একদিন জিজ্ঞেস করেছিল ঊর্বী।

'ও মা, চাইব না কেন? বিয়ে করতে তো সবাই চায় রে!' – হেসে বলেছিল অপালা।

ঊর্বী স্পষ্ট বুঝতে পারছিল যে মেয়েটা কিছু লুকোচ্ছে। তাই মরিয়া হয়ে আবার বলেছিল,
'এই বিয়েটা তো আর পাঁচটা বিয়ের মত হচ্ছে না। তুই তো ছেলেটার সাথে আগে একটু কথা বলতে পারতিস!'
'কি হত কথা বলে? এই ছেলেটা তো তাও আমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে, এর আগে পনেরোজন রিজেক্ট করেছে। কালো মেয়েদের বিয়ে হওয়া কি অত সহজ রে ঊর্বী?'- একটা শিক্ষিত, অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন মেয়ের গলায় সেদিন অদ্ভুত এক অসহায়তার সুর টের পেয়েছিল ঊর্বী। ও আর কিছু বলেনি। রেজিস্ট্রির ঠিক তিন মাসের মাথায় বিয়ে হয়ে গেছিল অপালার।
বিয়ের পরে যোগাযোগটা অনেকখানি কমে গেলেও ফোনে কথাবার্তা প্রায়ই চলত ওদের। বিয়ের ঠিক এক বছরের মাথায় মেয়ে হল ওর। ওর মেয়েকে দেখতে কয়েকজন বন্ধু মিলে ওরা গেছিল অপালার শ্বশুরবাড়ি, আর সেখানে গিয়ে হঠাত ভীষণ অপ্রস্তুতে পড়ে যায় ওরা। ওদের সামনেই অপালার শ্বাশুড়ি বলতে শুরু করেন, 'প্রথম বাচ্চাটাই মেয়ে হল, কি জ্বালা বলো দেখি! অবশ্য এ মেয়ে বিয়ে হয়ে আসার পরেই আমি বুঝেছি এমন কিছুই হবে। এখন আরেকটা বাচ্চা নিতে গেলে যদি আবার মেয়ে হয়! তখন তো আরেক বিপদ! মেয়ে তো পরের ঘরের জিনিস, সেই খাইয়ে পরিয়ে পরকে দিয়ে দাও। তারওপর এ মেয়েকে দেখে তো মনে হচ্ছে তোমাদের বন্ধুর মতই হবে গায়ের রঙ। কে বিয়ে করবে বলো তো অত কালো মেয়েকে!'
'কাকিমা এসব আপনি কি বলছেন?' – আর থাকতে না পেরে ফুঁসে উঠেছিল ঊর্বী।
'কেন ভুল কি বলছি?' – প্রত্যুত্তর করেছিলেন ভদ্রমহিলা।
অনেক কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি। পিছন থেকে অপালা ইশারা করেছিল ওকে চুপ করে যেতে। বন্ধুর মুখ চেয়ে সেদিন থেমে যেতে হয়েছিল ওকে। কিন্তু অপালার জন্যে চিন্তাটা অনেকখানি বেড়ে গেছিল ওর। অপালা যদিও তারপরেও মুখ খোলেনি। বারবার ওকে জিজ্ঞেস করলেও একটাই উত্তর পেয়েছে সবাই, 'ভাল আছি'।
কিন্তু এই করোনার সময় লকডাউন হওয়ার পর পরিস্থিতিটা যেন একটু বদলে গেল, টের পাচ্ছে ঊর্বী। ও অপালার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখে। অপালা ফোন না করলেও ও করে। ওর খালি মনে হয় যদি মেয়েটার খারাপ কিছু হয়ে যায়! অপালার মেয়ের পাঁচ বছর বয়স হল, স্কুলে পড়ছে। বন্ধুর মুখের ঊর্বী শুনেছিল যে সুমিত নাকি মেয়ের দিকে সেভাবে ফিরেও দেখে না। অপালা নিজেই একজন দিদিকে রেখেছে মেয়েকে দেখার জন্য। সে সারাদিন থাকে, সন্ধেবেলা অপালা ফিরলে সে বাড়ি যায়। ওর মেয়েটাও খুব লক্ষ্মী হয়েছে। মায়ের কষ্টটা বোধহয় অনুভব করতে পেরেছে আগে থেকে। লকডাউনের ক'দিন আগেই বোনের বাড়ি গিয়ে আটকে পড়েছেন অপালার শাশুড়ি। ওর শ্বশুর মারা গেছেন বছর দুয়েক আগে। বাড়িতে এখন সুমিত আর অপালা একা। ঊর্বী ভেবেছিল এই সময়ে হয়ত ওদের সম্পর্কের একটু উন্নতি হবে। অপালা যদিও কখনো ওদের সম্পর্ক নিয়ে সেভাবে কিছু বলেনি, কিন্তু ওদের মধ্যে যে খুব একটা ভাল সম্পর্ক নেই, সেটা বুঝতে পারে ঊর্বী। আজ এত বছর পর, এই তিরিশ বছর বয়সে এসে সেদিন হঠাত মুখ খুলেছিল অপালা।

'আমি আর পারছি না রে উর্বী, বিশ্বাস কর, ভীষন ক্লান্ত আমি। প্রতি মুহূর্তে মরে যেতে চাইছি, কিন্তু পারছি না।' চমকে উঠেছিল উর্বী বন্ধুর কথা শুনে। এতবছর ধরে ওর মনের মধ্যে যে দুশ্চিন্তাটা ছিল, সেটাকে সত্যি করেই অপালা সেদিন বলেছিল ওর দুঃখের গল্প। এত বছর ধরে ওর কাছের মানুষগুলোর ওকে আঘাত দেওয়ার কথা। ছোট থেকে অপালা সত্যিই কোনোদিন ওর বাবা- মায়ের কাছে সেই ভালবাসাটা পায়নি যেটা অন্য ছেলেমেয়েরা পায়। ওর গায়ের রঙের কারণে সবসময় বাবা- মায়ের মধ্যে একটা চাপা দুশ্চিন্তা টের পেয়েছে ও। একটু বড় হওয়ার সাথে সাথে মা ওকে দুধ- হলুদ- মুলতানি মাটি থেকে শুরু করে নানারকম ফেসপ্যাক লাগিয়ে দিতেন মুখে, ফর্সা হওয়ার জন্য। কিন্তু কিছুতেই যখন কোনো কাজ হত না, মায়ের রাগ আরও বেড়ে যেত। ওর পড়াশুনোয় ভাল হওয়া বা চাকরি পাওয়া বাবা- মাকে তেমনভাবে খুশি করতে পারেনি, যতটা সুমিতের সম্বন্ধটা আসার পর হয়েছিল। বাবা- মা যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছিলেন! অন্তত কেউ তো রাজী হয়েছে তাঁদের কালো মেয়েকে বিয়ে করার জন্য! অপালাও দ্বিরুক্তি করেনি, ছোট্ট থেকে ও যে মানিয়ে নিতে শিখে গেছিল! কিন্তু বিয়ের পর ও টের পায় সুমিতের সাথে ওর বিস্তর মানসিক ফারাক। শুধু তাই নয়, অপালার কাছে এটাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে সুমিত ওকে বিয়ে করেছে শুধুমাত্র ওর বাবার পয়সা বা সম্পত্তি দেখে। অপালা ওর বাবা- মায়ের একমাত্র মেয়ে, সব সম্পত্তি ও- ই পাবে। এটাই ছিল সুমিতের মূল লক্ষ্য। অপালার সাথে প্রথম থেকেই কারণে- অকারণে ঝগড়া হয় ওর, আর ইদানীং সেটা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। লকডাউনে সারাক্ষন একসঙ্গে থাকতে থাকতে অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়েছে যে সুমিত প্রায়ই গায়ে হাত তুলছে অপালার। অপালা প্রথম প্রথম চুপচাপ থাকার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তারপর পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে ও- ও প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। মেয়েটা খুব ভয় পেয়ে যাচ্ছে এসব দেখে।

'আমার প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে আমি আত্মহত্যা করি, বিশ্বাস কর! শুধু মেয়েটার মুখ চেয়ে পারছি না' – সেদিন উর্বীকে বলেছিল অপালা।

আর তারপর থেকে উর্বী আরও সতর্ক হয়েছিল বন্ধুর ব্যাপারে। ওর কাছে যেতে না পারলেও সবসময় ফোন করে খবর নিত। উর্বীর পরামর্শেই অপালা ইদানীং রাজি হয়েছিল সুমিতকে ডিভোর্স দিতে। মেয়েকে নিয়ে একটা আলাদা ফ্ল্যাটে উঠে আসবে ঠিক করেছিল ও। লকডাউনটা উঠলেই যাতে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করে নিতে পারে, সেজন্যে সব গোছাচ্ছিল ও। কিন্তু হঠাত সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুটা কেমন যেন সব বদলে দিল। এতদিন একটু একটু করে যে হাসি ফিরে এসেছিল অপালার মুখে, সব আজ কেমন যেন হতাশায় বদলে গেছে, ফোনের এপার থেকেও টের পেল উর্বী।

অপালাকে বারবার জিজ্ঞেস করতে ও একটাই কথা বলছে, সুশান্ত সিং রাজপুতের মত অত সুন্দর দেখতে একটা ছেলে যদি আত্মহত্যা করে, তাহলে অপালার মত কুৎসিত যারা, তারা কি নিয়ে বাঁচবে? তাদের তো এই রূপের জন্যেই ছোট হতে হচ্ছে চিরকাল অন্যের কাছে, অপমানিত হতে হচ্ছে!

'জানিস, সুমিত আমাকে বলে যে ও বিয়ে না করলে আমাকে নাকি গলায় দড়ি দিতে হত। আমাকে যা বলছে, আমি মেনে নিচ্ছি ঊর্বী, এখন ওরা আমার মেয়েকে নিয়ে পড়েছে জানিস! সুমিত আর ওর মা সারাক্ষন আমার মেয়ের গায়ের রঙ নিয়ে বলে যায়। তুই আমাকে একটা কথা বল, আমি না হয় কালো, সুমিতও তো ফর্সা নয়! আমাদের মেয়ে তাহলে ফর্সা হবে কি করে!' – ঊর্বীকে ফোনে কথাগুলো বলতে বলতে গলা কেঁপে উঠেছিল অপালার।

'তুই এসব জবাবদিহি কার কাছে করছিস অপালা? আমি শুনতে চেয়েছি?'

'না রে সেটা নয়, আসলে কি বল তো, আমার মেয়েটা সারাক্ষন এইসব শুনছে। ওর তো কচি মন, ওর মনে এগুলো কেমন প্রভাব ফেলছে বল তো? খুব চিন্তা হচ্ছে রে আমার!'

'অপালা, তোর সাথে তো কথা হল যে লকডাউনটা উঠে গেলেই মেয়েকে নিয়ে আলাদা ফ্ল্যাটে শিফট হয়ে যাবি তুই। এখন যদি থাকতে খুব অসুবিধে হয় তুই আমাকে বল, আমি গাড়ি করে গিয়ে তোকে নিয়ে আসছি আমার কাছে'।

'না রে, ধুস। তোর কাছে গিয়ে ক'দিন থাকব?'

'তোর যতদিন ইচ্ছে। আমার কাছে তোর অসুবিধে কিসের রে?'

'তুই আমাকে ভালবাসিস বলে বলছিস' – হেসেছিল অপালা, 'আমার সাথে আমার মেয়ে আছে রে। এখন কি আমরা আর সেই ছোট? আর তাছাড়া অন্য কোথাও গিয়েই বা কি লাভ? সুমিত আমায় ডিভোর্স দেবে না এত সহজে। আমার বাবার সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যাবে যে তাহলে! আমি যে চুলোতেই যাই, ঠিক হাতেপায়ে ধরে নিয়ে আসবে, আর তারপরেই আবার নিজের রূপ দেখাবে। মরা ছাড়া আমার আর গতি নেই রে!' –হতাশ লাগছিল ওর গলাটা।

সেদিন তারপরেও অনেক বুঝিয়েছিল ঊর্বী, কিন্তু অপালার কানে কোনো কথা ঢুকছে বলে মনে হয়নি ওর। একসময় 'সুমিত ডাকছে, রাখছি এখন' বলে ফোনটা কেটে দিয়েছিল ও। চুপ করে বসেছিল ঊর্বী। ও কি করবে, বুঝতে পারছিল না ঠিক। অপালাকে বাঁচাতে গেলে ওকে এক্ষুনি ওই বাড়ি থেকে সরাতে হবে। সেদিন রাতে কিছুতেই ঘুম আসছিল না ওর। ঠিক করে নিয়েছিল পরের দিন সকালেই একটা গাড়ি নিয়ে যাবে অপালার শ্বশুরবাড়ি, বন্ধুটা যদি কিছু উল্টোপাল্টা করে ফেলে! সেই রিস্ক নিতে পারবে না ঊর্বী।

ভোরের দিকে একটু চোখটা লেগে গেছিল ওর, হঠাত মোবাইলের শব্দে ঘুম ভাঙ্গে। অপালা! ঘড়িতে সময় বলছে চারটে দশ।

'কি রে, কি হয়েছে?' – ঊর্বী হঠাত বুঝতে পারল ওর গলাটা শুকিয়ে গেছে।

'আমি সুমিতকে মেরে ফেলেছি ঊর্বী!'

'কি? কি বলছিস তুই?' – চেঁচিয়ে ওঠে ঊর্বী।

'আমি সুমিতকে মেরে ফেলেছি, তুই ঠিকই শুনছিস। আজ মেয়েটাকে খুব মারল ও, তারপর আর মাথার ঠিক রাখতে পারিনি। রান্নাঘর থেকে হামানদিস্তের বাটিটা এনে ছুঁড়ে মেরেছি। তখনই পড়ে

গেল। খুব রক্ত বেরোচ্ছে। মনে হচ্ছে আর নিঃশ্বাস পড়ছে না। আমার জেল হলে মেয়েটাকে কে দেখবে রে ঊর্বী?

****

' জানিস তো, যা হয়, বোধহয় ভালর জন্যেই হয়। সেদিন যদি সুমিতের সাথে আমার ওই ঝামেলাটা না হত, তাহলে হয়ত সেদিন রাতে আমি নিজেকে শেষ করে দিতাম' – সোফায় গাঁ এলিয়ে বলে অপালা।

'মানে? এসব কি বলছিস কি তুই?' – উত্তেজনায় উঠে বসে পড়ে ঊর্বী।

'আরে দাঁড়া না, অত উত্তেজিত হচ্ছিস কেন? মরিনি তো আমি। বললাম মরার প্ল্যান করেছিলাম। তোর কাছে আমি আর কি লুকোবো ঊর্বী, তুই তো সবই জানিস। ছোট থেকে এই গায়ের রঙের জন্যে নিজের বাবা- মায়ের কাছেও কত ছোট কথা শুনেছি। তখনও অনেকবার ভেবেছি আত্মহত্যার কথা, কিন্তু পারিনি। তারপর বিয়ের পর সুমিতের সাথে যখন থাকতে শুরু করলাম, বুঝতে পারলাম নরক কাকে বলে। একটা মানুষ যে কোন লেভেলের নীচু মানসিকতার কতে পারে, সুমিতকে না দেখলে বিশ্বাস করবি না। বিয়ের পর পরি প্রেগন্যান্ট হয়ে গেলাম, আর তারপর মেয়েটার মুখ চেয়ে মরতে পারিনি। ভাবতাম আমার কিছু হলে ওকে কে দেখবে? ও- ও যে আমার মত রঙ পেয়েছে। আমি ছাড়া আর কেউ যে নেই ওকে আগলে রাখার। আমি মরে গেলে মেয়েটা অনাথ হয়ে যাবে। এইভাবে কাটিয়ে দিলাম অনেকগুলো বছর, কিন্তু শেষের দিকে আর পারছিলাম না। বেশ কিছুদিন ধরে শান্তভাবে ভেবেচিন্তে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আর মেয়েটাকে সেদিন ওই প্ল্যান করেই বাবা- মায়ের কাছে রেখে এসেছিলাম। যতই হোক নাতনী তো, একটু মায়াদয়া থাকবে। আমি দু'পাতা ঘুমরে ওষুধ কিনে এনেছিলাম শাশুড়ির প্রেসক্রিপশন দেখিয়ে। জানিস আমি যাই করতাম, সমস্ত কথা সুমিত ফোন করে বলত আমার শাশুড়িকে, সে বাড়িতে না থাকলে। সেদিন মেয়েকে বাপের বাড়ি রেখে এলাম, সেই নিয়ে তুমুল অশান্তি। এমনিতে মেয়েকে ছুঁয়েও দেখেনা, সেদিন একদম দরদ উথলে উঠল। আর তারপর যথারীতি কিছুক্ষনের মধ্যেই খুলে গেল ওর মুখের নর্দমা। মেয়েটাকে নিয়ে যেই শুরু করল না রে, আমি আর সহ্য করতে পারিনি। ওই ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ডে রক্ত উঠে গেছিল আমার মাথায়। হামানদিস্তেটা নিয়ে এসে ছুঁড়ে মারি। সুমিত বোধহয় এক্সপেক্ট করেনি এমন কিছু হতে পারে, অবাক হয়ে গেছিল খুব, আর তারপর মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। এমন রক্ত বেরোচ্ছিল, আমি ভাবলাম মরেই গেল। তাই একটু নার্ভাস হয়েই ফোন করেছিলাম তোকে। এখন ভাবছি যা হয় ভালোর জন্যেই হয়।

ওইদিন আঘাতটা না পেলে সুমিত এত সহজে আমায় ডিভোর্স দিতে রাজিই হত না। এখন ভাবছে আমার বাবার সম্পত্তির থেকে নিজের প্রাণের মায়া তো বেশি। ওর মা বলেছে ওনার ছেলে একটা খুনী মেয়ে নিয়ে ঘর করতে পারবে না' – হাসছে অপালা।

অনেকদিন পর ওকে এভাবে প্রাণখুলে হাসতে দেখছে ঊর্বী।

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

'আত্মরক্ষার তাগিদে আঘাত' – এই মর্মে পুলিশের ঝামেলা থেকে মুক্তি পেয়েছে অপালা। মেয়েকে নিয়ে এখন একটা আলাদা ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকে। কিছুদিনের মধ্যে একটা ফ্ল্যাট কিনবে ও। অপালা এখন আবার আগের মত হাসছে, আনন্দ করছে। ওকে এর আগে এত খুশি কখনো দেখেনি ঊর্বী। ভাগ্যিস সেদিন ওরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল, তাই তো অপালার জীবনের মোড়টা এভাবে ঘুরে গেল। সেদিন যদি ওরকম কিছু না হত, তাহলে তো অপালা এতদিনে...

না না না, আর এসব ভাববে না ঊর্বী। এবার থেকে শুধু ভাল কথা চিন্তা করবে। যারা আত্মহত্যা করার মনস্থির করে, তাদের সবার জীবনে যদি অপালার মত এমন কোনো ঘটনা ঘটে, তাহলে কতগুলো প্রাণ বেঁচে যায়! জীবনটাকে যে আরেকবার নতুন করে শুরু করা যায়, আত্মহত্যার আগে এই উপলব্ধিটা আসা বড্ড দরকার!

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

কনকাঞ্জলি

ঈপ্সিতা মিত্র

ত্রিয়াসা রোজের মতন আজও বেশ সকাল সকাল উঠে চা এর জল বসিয়েছিল রান্নাঘরে । কাজের মাসি আজ আসবে না ! ভোরবেলা ছেলেকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে । তাই চা এর জল ফুটতে ফুটতে সিঙ্ক এ রাখা বাসনগুলো মেজে নিচ্ছিল এক এক করে । এর মধ্যেই শাশুড়ি মা এসে বললো, " আজ একটু এঁচর রেধো তো বৌমা দুপুরের জন্য । তোমার শ্বশুর মশাই খাবে বলেছেন।" কথাটায় ত্রিয়াসা এক সেকেন্ড চুপ করে বাসন মাজতে মাজতেই বললো, " মা আপনি কালকে বললে আমি রাতে ছাড়িয়ে রাখতাম এঁচর । কিন্তু এখন কি করে হবে বলুন ! আমার তো অফিস আছে । আজ আবার ধর্মঘট । কিছুটা আগে বেরোতে হবে । বাস ট্রেন এর কি অবস্থা কে জানে ! আমি বরং রাতে এসে এঁচরটা করে দেব । এখন পনির আর ডিমের ঝোল করে দিই ?" কথাটায় মালতিদেবি বেশ চিড়বিড় করে উঠে বললেন, "সব যখন ঠিক ই করে রেখেছ নিজে তাহলে আর আমায় জিজ্ঞেস করছ কেন ! একটু এঁচর রান্না করতে বলেছি না যেন পাথর ভাঙতে বলেছি হাতুড়ি দিয়ে । অজুহাতের শেষ নেই ! আর সারাক্ষণ চাকরি চাকরি কি দেখাও আমাদের ? তাও যদি বুঝতাম একটা টাকাও সেই চাকরির এই সংসারে দিতে ! সব তো হাত খুলে দিয়ে আসো বাপের বাড়িতে । আর মা বাবাও সেরম ! বিয়ে হয়ে যাওয়া মেয়ের কাছ থেকে হাত পেতে নিতে লজ্জা লাগে না ! যতসব ।" কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলার মাঝেই এবার থামতে হলো ওনাকে , কারণ ত্রিয়াসা শেষ কথাগুলো শুনে আর চুপ করে থাকতে না পেরে বলে উঠলো , " মা প্লিজ ! আমার মা বাবা কে নিয়ে কিছু বলবেন না। আপনারা এঁচর খাবেন তো ! বেশ । তাই রান্না করে দিচ্ছি আমি।" এর উত্তরে মালতিদেবি মুখ বেঁকিয়ে বললো, " উফ , এমনভাবে বলছে যেন উদ্ধার করে দেবে আমাকে একটু রান্না করে । হাত পা শক্ত থাকলে আমিই করে নিতাম । তোমাকে বলতাম না !" কথাটা বলেই উনি আর দাঁড়ালেন না রান্নাঘরে । যেভাবে শান্ত সকালকে অশান্ত করতে এসেছিলেন , সেভাবেই বেরিয়ে গেলেন রাগে গজগজ করতে করতে । তবে ত্রিয়াসার চোখে এই মুহূর্তে আলতো জল এসে ভিড় করেছে । সকালবেলা এইভাবে কথা শুনতে কষ্ট হয় খুব । আর বাবা মার নামে কিছু বললে তো আরো কাঁচটা বিঁধে যায় মনে । বাবার কারখানা বন্ধ হয়েছে দু বছর হয়ে গেল ! ত্রিয়াসা ছাড়া কে আছে ওদের! এই যেমন সৌমেন আছে , নিজের মা বাবার জন্য । শুধু ছেলেদের ক্ষেত্রে নিয়মটা যেন একটু অন্য । ছেলে নিজের ; আর মেয়ে পর । কন্যাদান এর পর এই অদ্ভুত থিয়রি টা নিয়েই সমাজ চলে আজও! যেখানে মেয়েটাকে সব নিয়ম আচার অনুষ্ঠান

দিয়ে বুঝিয়ে দেয়া হয় , আজ থেকে বাপের বাড়ির পাঠ চুকলো তোমার । ভাবলেও হাসি পায় ত্রিয়াসা ! সত্যি কি এত সহজ পাঠ চুকিয়ে ফেলা ! যে ঘর , যে উঠোন থেকে ছাদে ছোটবেলা থেকে মেয়েবেলা অব্দি বেড়ে ওঠা ! যাদের ঘিরে এতগুলো বছর বেঁচে থাকা ! তাদের ভুলে নতুন কোন জীবন হয় না কি ! শুধু গোত্র বদলে গেলেই মন বদলে যায় একজনের ! ত্রিয়াসা এটা বোঝে না কিছুতেই । ছেলে মেয়ে দুজনের একসঙ্গে বিয়ে হলে শুধু মেয়েটার ছেড়ে যাওয়ার নিয়ম কেন ! ছেলের সম্প্রদান নেই কেন ! বিবাহিত ছেলে যদি মা বাবাকে দেখে, তাহলে সেটা কর্তব্য করা হয় ! আর বিবাহিত মেয়ে মা বাবাকে দেখলে, সেটা দান করা হয় কি করে ! প্রশ্নগুলো কিরকম আজও মনের মধ্যে পাক খেতে থাকলো যেন ওর । আর উত্তরহীন হয়েই ত্রিয়াসা রান্না বসালো গ্যাসে । হ্যাঁ, ওদের কাজের মাসি আছে যে বাসন ধোয় । কিন্তু রান্নার মাসি কেউ ইচ্ছে করেই রাখেনি । ত্রিয়াসা চাকরি করে তো কি হয়েছে ! বাড়ির বউ হয়ে বাড়ির কোন কাজ করবে না এটা হয় না কি ! রান্না টুকুও যদি লোক এনে রাঁধাতে হয়, তাহলে এত খরচ করে ছেলের বিয়ে দেয়া কেন ! আর শ্বশুর শাশুড়ির এই টুকু আবদার তো বৌমা রাখতেই পারে । দু চারটে পদ রান্না করে খাওয়াবে একটু । বয়স্ক মানুষ ওরা ! বৌমা কে বলবে না তো কাকে বলবে ! --- ঠিক এই কথাগুলোই বলেছিল মালতিদেবি আর রঞ্জনবাবু , যখন সৌমেন বিয়ের পর দিল্লীতে চাকরি জয়েন করতে যাওয়ার আগে রান্নার মাসি রাখার কথা তুলেছিল বাড়িতে । তবে ত্রিয়াসা আর কথাটাকে বাড়তে দেয়নি সেদিন। বউ হিসেবে কিছু এক্সপেক্টেশন থাকতেই পারে মানুষগুলোর ওকে ঘিরে । আর একটু রান্নাই তো । সে তো বাবার বাড়িতেও থাকার সময় করতো কত ! তবে সেই রান্না ছিল সখের। আর এই রান্না হচ্ছে নিয়মের । শরীর চলুক আর না-ই চলুক , অফিস থেকে ফিরে , আর অফিসে যাওয়ার আগে , কড়াই চাপিয়ে খাবার সংস্থান করতেই হবে ওকে। এই কাজের ছুটি নেই । এটুকুই যা পার্থক্য । সেদিন এসব এলোমেলো ভাবনার ভিড়েই রান্না শেষ করে রেডি হয়ে বেরোতে যাচ্ছিল ত্রিয়াসা । আজ আর খেয়ে বেরোনোর সময় নেই । এঁচোর ছাড়াতে এমনিই এত দেরি হয়ে গেছে ! তার ওপর ধর্মঘট ! আজ না একটা লেট পরে যায় ওর ! কথাটা চিন্তা করতে করতেই টিফিন কৌটোটা ব্যাগে ভরে ও বলে উঠলো, " মা , আজ আসতে একটু দেরি হবে । আসলে বাবাকে নিয়ে একটু ডাক্তার দেখাতে যাওয়া আছে । তাই ওবাড়ি হয়েই ফিরব ।"

কথাটা শুনে মালতিদেবির ভ্রু টা কুঁচকে গেল হঠাৎ ! একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেই উনি বললেন, " আজ আবার যাবে বাপের বাড়ি ! মানে সত্যি বৌমা ! তোমার মতন মেয়ের বিয়ে করাটাই ঠিক হয়নি । থাকতে সারা জীবন ওই মা বাবাকে নিয়ে । শুধু শুধু

টাইম পাসের জন্য তো শ্বশুরবাড়ি আসার কোন দরকার ছিল না!" কথাটায় ত্রিয়াসা এবার কিছুটা যেন ক্লান্ত হয়েই বলে উঠলো, "মা, বাবার প্রেশারটা খুব বেড়েছে। তাই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবো । আমার মা তো অত কথা বলতে পারবে না ডাক্তারের সঙ্গে! তাই আমাকে যেতে হবে ।" এই উত্তরে ত্রিয়াসার শ্বশুর মশাই এবার বেশ অসন্তুষ্ট হয়েই বললো ওকে , " কিছু মনে কোরো না তুমি ! এবার একটু বাপের বাড়ি বাপের বাড়ি করাটা বন্ধ করো পারলে। নিজের মা বাবার জন্য তো আমার ছেলেটার কাছেও গেলে না তুমি দিল্লীতে ! না কারণ কি ! চাকরি ছাড়তে হবে । নইলে সেন্ট্রাল এ তো আছে আমার সৌমেন । তার বউ কে আবার চাকরি করতে লাগে ! আসল কারণ তো হলো চাকরি ছাড়লে তোমার মা বাবাকে হাত খুলে দিতে পারবে না টাকা পয়সা, তাই । আর ওদিকে আমার ছেলেটা বউ থাকা সত্বেও হাত পুড়িয়ে খাক , এতে কোন মাথা ব্যাথা নেই তোমার ।" কথাগুলো বেশ ঝাঁঝালো গলায় বলে গেলেন রঞ্জনবাবু । তবে ত্রিয়াসার বুকের ভেতর এই সময় দম চাপা কষ্ট হলেও কিছু বললো না আর ও । শুধু ' আসছি ' বলে বেড়িয়ে এলো বাড়িটা থেকে সেই মুহূর্তে । আসলে বয়োস্ক মানুষ হাজার হলেও! ও যদি মুখ ঘুরিয়ে কিছু বলে , তাহলে সারাদিন টুকু বাজে কাটবে হয়ত ওদের ! যে বয়সে ছোট একজন মুখে মুখে উত্তর করলো ! তারপর এমনিই দুজনে হাই প্রেশারের রুগি। যদি কিছু হয়ে যায় বেশি উত্তেজিত হয়ে ওর কারণে ! তাই রোজের মতন আজও মুখটা বন্ধ করে একটা বুক চাপা কষ্ট নিয়ে বেরিয়ে এলো বড় রাস্তায় । অটো ধরার জন্য। আসলে ত্রিয়াসা এটাও জানে যে ওর সৌমেন এর সঙ্গে দিল্লি না যাওয়াটাই ওর শ্বশুর শাশুড়ির রাগের মূল কারণ । আর স্বাভাবিক , আমাদের সমাজ , চারিপাশ তো যুগ যুগ ধরে এটাই শিখিয়েছে সবাইকে , মেয়েটা চাকরি ছাড়বে । তারপর বর যেখানে , সেখানেই সেও যাবে , সঙ্গ দিতে । মেয়েদের আবার দরকার , অদরকার , এম্বিশন , এসব কিছু হয় না কি ! মেয়ে নিজের মা বাবার সংসার টানার জন্য বিয়ের পর ও আলাদা থেকে চাকরি করবে ! এটা কটা বাড়ি মেনেছে ! আর কটা বাড়ি মানতে পারে । বিয়ের পর তো মেয়েরা পর। তাই মা বাবাও পর । কথাগুলো ভাবতে ভাবতে একটা কষ্টের হাসি মুখে নিয়ে ত্রিয়াসা অফিস পৌঁছেছিল সেদিন । তারপর হারিয়ে গেছিল নিজের কাজে ।তারপর সেদিন পাঁচটার মধ্যে অফিসের কাজ মিটিয়ে ত্রিয়াসা এসে হাজির হয়েছিল বাপের বাড়ি । বাবাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে বলে । তবে সেদিন একটা ঘটনা ঘটেছিল । আসলে বাড়ি এসে দেখেছিল মা একটা শাড়ি আর একটা জামা প্যান্টের পিস কিনেছে পুজোতে ওর শ্বশুর শাশুড়িকে দেবে বলে । আর বাবা ঠিক করেছে আজ ডাক্তার দেখিয়ে ত্রিয়াসাকে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে দেবে , আর এই জামা কাপড় গুলো দিয়ে আসবে ওদের। ত্রিয়াসা কথাটা শুনে প্রথমে যদিও বলেছিল যে ওর বাবার যাওয়ার দরকার নেই। ত্রিয়াসা নিজে পুজোর এই জামা কাপড় দিয়ে দেবে শ্বশুর শাশুড়িকে। কিন্তু ওর বাবা

কিছুতেই কোন কথা শোনেনি । বরং হাসি মুখে হাজির হয়েছিল ত্রিয়াসাদের বাড়ি । যদিও ত্রিয়াসার মনে একটা ভয় কাজ করছিল প্রথম থেকে ! ওর শ্বশুর শাশুড়ি ওর সঙ্গে যেই ব্যবহারটা করে, সেটা না বাবাকেও ফিরিয়ে দেয় ! তাহলে বাবা সেটা সহ্য করতে পারবে না । শেষ হয়ে যাবে ভেতরে ভেতরে । কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই বসার ঘরে ঢুকেছিল বাবাকে নিয়ে ; কিন্তু শ্বশুর শাশুড়ির মুখটা দেখেই ওর বুকের কাছটা খালি হয়ে গেছিল হঠাৎ । ওরা সেই মুহূর্তে ভীষণ যেন বিরক্ত হয়ে ছিল ত্রিয়াসার বাবাকে দেখে । মালতিদেবি তো ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞাসাই করে উঠেছিল," কি ব্যাপার ! আপনি এখানে ?" কথাটায় ত্রিয়াসার বাবা একটু যেন ইতঃস্তত হয়ে পড়েছিল হঠাৎ । তারপর অল্প হাসার চেষ্টা করে বলেছিল, "না , আসলে সামনে তো পুজো ! তাই ওই সামান্য কিছু জামা কাপড় এনেছিলাম আপনাদের জন্য ।" কথাটায় মালতিদেবি বেশ গম্ভীর হয়েই উত্তর দিয়েছিলো , " দরকার নেই এইসবের | ফেরত নিয়ে যান |" এই কঠিন উত্তরে ত্রিয়াসার বাবার মুখটা কিরকম যেন ম্লান হয়ে এসেছিলো | ত্রিয়াসা খেয়াল করেছিল ওর বাবা কিরকম প্যাকেটগুলো নিয়ে অসহায়ের মতন দাঁড়িয়ে আছে ! কেউ একবার বসার কথাও বলছে না ওনাকে | তবে এর মধ্যেই ওর বাবা একটু থমকে থাকা গলায়ই বলেছিলো , " এভাবে কেন বলছেন ? আপনাদের নামে কেনা ! ফেরত নিয়ে যাবো কেন ?" এই প্রশ্নের উত্তরে এবার ত্রিয়াসার শ্বশুর রঞ্জনবাবু গলা ঝাঁকিয়ে বললেন, " দেখুন , এইভাবে গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো করার তো কোনো প্রয়োজন নেই ! বিয়ে হয়ে যাওয়ার মেয়ের কাছ থেকে দিনের পর দিন টাকা নিয়ে যান ! আর সেই টাকা দিয়েই আবার আমাদের জন্য জামা কাপড় কিনে এনেছেন ! আমি অনেক ধরণের বাবা দেখেছি| কিন্তু কিছু মনে করবেন না , আপনার মতন স্বার্থপর বাবা আমি দুটো দেখিনি | আপনার মেয়ে তো চাকরিটা ছেড়ে দিল্লী গেলো না আপনাদের জন্য ! আপনাদের সংসার টানতে হবে বলে সে নিজের সংসার গিয়ে গোছালো না | আপনি তো বাবা হয়ে ওকে বোঝাতে পারতেন ! তা না আপনিও মাসের পর মাস ধরে সেই টাকায় সংসার চালান ! আর এতই যখন মেয়েকে নিজের কাছে রাখা প্রয়োজন , তাহলে বিয়ে দিয়েছিলেন কেন ? শুধু শুধু আমার ছেলের জীবনটা নষ্ট হলো !" এই কথাটায় এবার মালতিদেবিও সুর করে বললো, "কি ন্যাকামো সত্যি ! আমাদের বাড়ির বৌ এর টাকা দিয়ে আমাদেরই জামা কাপড় কিনে দিচ্ছে ! এখানে আসতে লজ্জা হলো না ! যদি মুরোদ না থাকে, তাহলে লোকদেখানো কাজ করার দরকার কি !"

কথাগুলো শুনে ত্রিয়াসা খেয়াল করলো ওর বাবা যেন কিরকম টলছে ! অপমানে লজ্জায় ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না যেন | মুখটা কিরকম লাল হয়ে এসেছে এখন | চোখগুলো জলে টলটল করছে | অনেক কষ্টে যেন নিজের জলটাকে আটকে রেখেছে ! জীবনে প্রথম নিজের বাবাকে এইভাবে জড়োসড়ো হয়ে থাকতে দেখলো ও ! যেন অনেক

বড়ো অন্যায় করে ফেলেছে এই জিনিসগুলো কিনে ! কথাটা ভেবেই ত্রিয়াসা আর চুপ থাকলো না | অনেক হয়েছে | অনেকদিন ধরে অনেক কথা সহ্য করেছে | বয়স্ক, খারাপ লাগবে বলে সব সময় নির্বাক থেকেছে ! কিন্তু আর না | যদি ওরা ত্রিয়াসার বয়স্ক বাবার কথা, তার মনের কথা একবারের জন্যও না ভাবতে পারে, তাহলে ত্রিয়াসাও আর ভাববে না এদের জন্য | কথাটা মনে হতেই ও বেশ দৃঢ় গলায় মাথা উঁচু করে বললো ," অনেক হয়েছে | অনেক বলেছেন আপনারা | এবার আমার কথাটা শুনুন | লজ্জা আমার বাবার না, আপনাদের হওয়া উচিত ! এই যুগে দাঁড়িয়েও এইসব কথাবার্তা ভাবার জন্য ! আপনার কি মনে হয় , আপনাদের ছেলেই একমাত্র সন্তান ! আমি কারোর সন্তান হতে পারি না ; কারণ আমি মেয়ে তাই ! আপনারা হাত পেতে সংসার চালানোর জন্য আপনাদের ছেলের কাছ থেকে টাকা নিতে পারেন ! সেই টাকায় লোকলৌকিকতা, নিজেদের ট্রিটমেন্ট, এমন কি ডাল ভাতের খরচটুকুও তুলতে পারেন, তাতে অপরাধ হয় না ! আর আমার বাবা নিজের মেয়ের কাছ থেকে সংসার চালানোর টাকা নিচ্ছে বলে সে ছোট হয়ে গেলো ! কেন ? তার কি অপরাধ ? সে কন্যাসন্তানের বাবা বলে তার কোনো অধিকার থাকতে নেই ? গোত্র চেঞ্জ হয়ে গেছে বলে , সারনেম চেঞ্জ হয়ে গেছে বলে , দু মুঠো চাল ফেলে কনকাঞ্জলি হয়ে গেছে বলে সত্যি আমাদের সম্পর্কটাও দূরের হয়ে গেছে ! এতো সস্তা মনে হয় মা বাবার সঙ্গে তার সন্তানের সম্পর্কটাকে আপনাদের ! না কি আমি মেয়ে বলে নিয়মগুলো আলাদা ! আর যদি নিয়ম আলাদাই হয় , তাহলে আমি সেই নিয়ম মানি না | আমি আমার মা বাবাকে দেখবো | একবার না , হাজার বার দেখবো | তাদের হাত খুলে টাকা দেব | নিজের রোজগারের টাকা | কারণ আমি মনে করি সেই টাকা অর্জন করার জন্য যেই চাকরিটা আমি পেয়েছি, সেটাও আমার মা বাবার জন্যই | আপনারা যেমন আপনাদের ছেলেকে লিখিয়ে পড়িয়ে শিক্ষিত করে মানুষ করেছেন , সেরকম আমার বাবা মাও একই কাজ করেছে | আর আপনাদের যদি নিজের ছেলের কাছ থেকে টাকা নেয়ার পরও সম্মান থাকে , তাহলে আমার বাবারও সম্মান আছে | আর ওই যে বললেন না , আপনাদের বাড়ির বৌ এর কাছ থেকে টাকা নিয়ে জিনিস কিনে এনে দিচ্ছে ! একটু ভুল বললেন কথাটা | আগে আমি আমার বাবার মেয়ে , তারপর আপনাদের বাড়ির বৌ | এই পরিচয়ে যদি এ বাড়িতে রাখতে অসুবিধা হয় আমাকে , তাহলে বার করে দিতে পারেন | প্রব্লেম নেই | আর আমিও এরকম ছোট মানসিকতার লোকেদের সঙ্গে থাকতে চাই না ! ওহ , আরেকটা কথাও বলি , যেটা দু বছর ধরে শুনিয়ে যাচ্ছেন ! আমি কেন আপনার ছেলের সঙ্গে দিল্লী যাইনি ! এই কথাটা আমাদের দুজনের মধ্যে কিন্তু বিয়ের আগেই হয়ে গিয়েছিলো | আমি বলেছিলাম , আমি কোনোদিন আমার চাকরি ছেড়ে যাবো না কোথাও| আর সেই শর্তেই রাজি হয়ে আপনাদের ছেলে আমাকে বিয়ে করেছে | আর আমি যদি এবার বলি

দায়টা কি শুধু আমার ? আপনার ছেলেও তো নিজের চাকরি ছেড়ে দিল্লী থেকে কলকাতা আসেনি , আমার সঙ্গে সংসার করবে বলে | তাহলে কি বলবেন আপনারা ? কারণ তার কিছু দ্বায় দায়িত্ব আছে, তাই তো ! এই যেমন নিজের মা বাবাকে দেখার দায়িত্ব | টাকা রোজগার করার দায়িত্ব ! আর সে ছেলে বলে তার চাকরি করতে , নিজের কর্তব্য করতে কোনো বাঁধা নেই ! আর আমি মেয়ে বলেই আমি খারাপ | নিজের চাকরি না ছেড়ে , নিজের মা বাবার দায়িত্ব নিয়ে আমি অপরাধ করছি ?" কথাগুলো কিরকম এক নিঃশ্বাসে বলে গেলো ত্রিয়াসা | আসলে এতদিনের জমে থাকা রাগ যন্ত্রণাগুলো যেন আজ এই মুহূর্তে একসঙ্গে বেরিয়ে এসেছে ওর | নিজের ভেতরে সহ্যের বাঁধটা ভেঙে গেছে আজ| তবে এই সময়ে ওর শ্বশুর শাশুড়িকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই ত্রিয়াসা আবার বললো একটু কঠিন গলায় , " আপনারা এতদিন আমাকে যা বলেছেন আমি মেনে নিয়েছি | কিন্তু আজ এই বাড়িতে দাঁড়িয়ে আমার বাবাকে যেই অপমানটা করেছেন , সেটা আমি কোনোদিন মানবো না | আর এরপর আমার এই বাড়িতে থাকা চলে না | আপনাদের মেন্টালিটি যদি চেঞ্জ হয় কখনো , তাহলেই আমি ফিরবো | নইলে না |" কথাটা বলেই ত্রিয়াসা নিজের বাবার হাতটা শক্ত করে ধরে বেরিয়ে এলো বাড়িটা থেকে সেই মুহূর্তে , বেশ জোরে পা চালিয়ে | ওর বাবার চোখ দিয়ে তখন কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে এসেছে গালে | চোখগুলোও ভীষণ অসহায় লাগছে | ত্রিয়াসা বুঝেছে এই অপমানটার জন্য হয়তো তৈরী ছিল না মানুষটা ! তবে ত্রিয়াসা নিজের হাতে আলতো করে চোখের জলটা মুছিয়ে দিয়েছিলো সেইদিন ওনার | বাড়ি ফেরার রাস্তাটায় ও নিজের বাবাকে আঁকড়ে ছিল সারাক্ষণ ! শুধু এটা বোঝানোর জন্য যে ' কন্যাসন্তানের বাবা হয়ে তুমি কোনো অন্যায় করোনি | কোনো দোষ নেই তোমার |' তবে সেদিনের সাত দিন বাদে সৌমেন ফিরেছিল দিল্লী থেকে সব শুনে | আজ ও একটা ডিসিশনে আসতে চায়| তাই ফিরে মা বাবাকে নিজের সামনে বসিয়েই বলেছিলো আস্তে গলায় , " আমি জানি তোমাদের ত্রিয়াসার জন্য একটা রাগ আছে ! ও চাকরি ছাড়েনি বলে | কিন্তু এই কথাটা ওর সঙ্গে আমার প্রথমেই হয়ে গিয়েছিলো | আর আমার মনে হয় আমার চাকরিটা যেমন আমার কাছে ইম্পর্ট্যান্ট , সেরকম ত্রিয়াসার চাকরিটাও ইম্পর্ট্যান্ট | এতো পড়াশোনা করে ও কদিন টাইমপাস করার জন্য চাকরিতে জয়েন করেনি | আর আমি যেমন আমার মা বাবাকে দেখবো , মা বাবার জন্য ভাববো , সেরকম ত্রিয়াসাও ওর ওর মা বাবাকে দেখবে | ওর যেভাবে মনে হয় , ও সেই ভাবে নিজের মা বাবার পাশে দাঁড়াবে | তাতে কেউ কিছু বলতে পারে না ! দু মুঠো চাল ফেলে দিলেই মা বাবার ঋণ শোধ হয় না | কনকাঞ্জলি একটা লোক দেখানো নিয়ম মাত্র| সেটাকে বাস্তব ভাবার কোনো কারণ নেই | তোমরা এটা মানতে পারলে ভালো |

আর না মানতে পারলে ত্রিয়াসা নিজের মতন নিজের বাড়িতে থাকবে | আমি তোমাদের জন্য রাত দিনের কাজের লোক রেখে দেব | তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না| "কথাটায় মালতিদেবি আকাশ থেকে পড়ার মতন মুখ করে বলেছিলো , "তুই শেষে ওই মেয়েটার সাথ দিলি ! আর ও যদি আলাদা থাকে তুই দিল্লী থেকে ছুটিতে কলকাতায় আসলে কোথায় থাকবি ?" কথাটায় সৌমেন নির্বিকার মুখেই উত্তর দিয়েছিলো," ওকে যদি তোমরা সহ্যই করতে না পারো , তাহলে ছুটিতে এসে জোর করে তো আমি ত্রিয়াসাকে এখানে এনে রাখতে পারবো না নিজের কাছে ! তাহলে আমাকে ওর বাড়িতে গিয়েই থাকতে হবে | কিছু করার নেই |"এতে রঞ্জনবাবু উত্তেজিত হয়ে বলেছিলো , " তুই ওই মেয়ের জন্য ঘর জামাই হয়ে থাকবি ছুটিতে এলে ? তোর বলতে লজ্জা করলো না !" এই কথার উত্তরে সৌমেন দৃঢ় গলায়ই বলেছিলো, " না , লজ্জা করলো না | একটা মেয়ে যদি দিনের পর দিন নিজের বাবার বাড়ি ছেড়ে শশুরবাড়িতে এসে থাকতে পারে , আর সেটা যদি অসম্মানের না হয়, তাহলে একটা ছেলেও প্রয়োজনে মেয়েটার বাড়ি গিয়ে থাকতে পারে | আর আমার সম্মান এতো ঠুনকো না যে কথায় কথায় সেটা নষ্ট হবে ! যাইহোক , তোমাদের শুধু আর একটা কথাই বলতে চাই ; ত্রিয়াসাকে খারাপ স্বার্থপর বলার আগে শুধু একটা জিনিস ভেবো দেখো কখনো , যদি কোনো মেয়ে দু দিনের চেনা ছেলের জন্য নিজের মা বাবা কে ভুলে যেতে পারে ! তাদের থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিতে পারে ; সে মেয়ের কিন্তু তোমার ছেলেকে ছেড়ে দিতেও বেশিদিন লাগবে না! আর ত্রিয়াসা এরকম না বলেই ও কিন্তু আমাদের ভালো খারাপ সব সময়ই আমাদের সঙ্গে থাকবে, আজ যে রকম নিজের মা বাবার সঙ্গে আছে | আর এটুকু মানুষ চেনার ক্ষমতা আমি রাখি |" কথাটা শেষ করে সেদিন সৌমেন নিজের ঘরে চলে এসেছিলো | আর কোনো প্রশ্ন উত্তরের মধ্যে জড়ায়নি নিজেকে ও | তবে এই প্রথম মালতিদেবি আর রঞ্জনবাবু কিরকম নির্বাক হয়ে গিয়েছিলো ছেলের সামনে | হঠাৎ মনে হয়েছিল ছেলে কি খুব দূরে সরে যাচ্ছে ওদের থেকে ! আর সেই দূরত্বের কারণ কি ওরা নিজেরাই তৈরী করেছে ছেলের কাছে ! কিছু কি ভুল হচ্ছে ওদের ! কিছু পুরোনো সংস্কারের কি বদলের সময় এসেছে এবার ! কিছু নিয়ম কি বদলানো উচিত সমাজে ! প্রশ্নগুলো হঠাৎ এসে উঁকি দিয়েছিল মনে এই প্রথম | আর নিঃস্তব্ধ দেয়ালের আড়ালে কিছু বস্তাপচা চিন্তাধারা আবদ্ধ হয়ে ছিল, উত্তরহীন হয়ে |

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

ব্যাধি

স্বাতী মুখার্জী

ভালো খাবার খেতে আর ইচ্ছে করে না। সেদিন টিভিতে দেখলো ছোট্ট বাচ্চাকে হসপিটালে ভর্তি করতে পারছে না এক মা। পারবে কি করে? কতো ডাক্তার নার্স সব কোয়ারেন্টাইনে! কত সিরিয়াস পেসেন্ট। কত লোক বাড়ির বাইরে ভিন রাজ্যে আটকে আছে!

শান্তিবালার মনে আর শান্তি নেই। পৃথিবীর কেন এমন হলো, কোথায় যাচ্ছি আমরা কে জানে! শান্তিবালার নামটা একটু পুরোনো। কিন্তু শান্তিবালার বয়স চল্লিশ। ওর ছেলের ক্লাস সিক্স। সেদিন শান্তিবালার বর অজয় বলল, "তুমি আর টিভির সামনে বসো না। খবর শুনে শুনে কেমন একটা হয়ে যাচ্ছো। অত চিন্তা করো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। প্লেগ , কলেরা কত মহামারীই তো প্রত্যক্ষ করেছে বিশ্ব। সেসব কি আর আছে এখন? নেই। ঠিক সেইভাবেই করোনা মুক্ত হবে একদিন বিশ্ব। একটু ধৈর্য্য ধরো।"

চুপ করে শোনে শান্তিবালা। কিন্তু মুখে হাসি নেই। উপকরণ থাকলেও ভালো কিছু রান্না করতে ইচ্ছে করে না। একটু সেদ্ধ ভাত ডাল আর একটু ভাজা করে চুপ করে বসে থাকে। লক ডাউন বাড়তে থাকে। আর কমতে থাকে শান্তিবালার হাসি।

পাপাই এসে এসে আশার খবর শোনায়। "জানো মা! যারা করোনা থেকে রিকভার করেছে তাদের শরীরের প্লাজমা আক্রান্তদের শরীরে দিলে তারা দ্রুত সুস্থ হয়ে যাচ্ছে। কি ভালো ব্যাপার না?" শূন্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে শান্তিবালা বলেন। "তাই? বেশ ভালো।" কিন্তু চোখ থেকে বেদনার ছায়া যায় না। যত দিন যাচ্ছে ততই শান্তিবালা গুম মেরে যাচ্ছে। অজয় খবর চালানো বন্ধ করে দিয়েছে। গভীর রাতে লুকিয়ে লুকিয়ে কটা হেড লাইন শুনে নেয়। তবু শান্তিবালার মানসিক অবস্থার উন্নতি নেই। আসলে ছাদ থেকে ছাদে যে কথাবার্তা হয় সব খবরই সেখান থেকে পায়। বাড়ির টিভি বন্ধ রাখলেই কি হলো নাকি! খবর বাতাসে ভাসে।

এরমধ্যে অজয় একদিন ওর ডাক্তার বন্ধু পল্লবকে ফোন করল। পল্লব বলল,"কিছু করার নেই। যা বোঝা যাচ্ছে, ওর মনটা অনুভূতি প্রবণ এবং দূর্বল। তুই এক কাজ কর ভালো ভালো গল্প পড়ে শোনা। আর সবসময় কানের কাছে বলতে থাক সব ঠিক হয়ে যাবে। এই লড়াই শেষে মানুষ নতুন শক্তি নিয়ে নতুন ভাবে দিনযাপন করবে কিছু মাস পর থেকে। তখন আর তেমন বিভ্রাট হবে না।" বলা হলো সব। কিন্তু কিছু যেন মন লাগিয়ে শোনেই না। আপন মনে কি সব ভেবে যায়।

"এই নাও এককেজি চাল আর ডাল। ভালো করে খিচুড়ি রাঁধো তো! দুধের দোকানের পাশের ভ্যান স্ট্যান্ডের একটা ভ্যান ওয়ালা বলছিলো ওদের পাশাপাশি দুটো ঘরের লোক দুদিন ধরে তেমন কিছু খেতে পাচ্ছে না। রেশনের চালে ওদের সবার পেট ভরছে না। খোরাকি একটু বেশিই লাগে তো! খেটে

খাওয়া মানুষ! এদিকে রোজগার তেমন নেই। সপ্তাহে দুদিন করে তুমি ওদের জন্যে ভরপেট খিচুড়ি রেঁধে দাও ভালো করে।" একদিন অজয় এসে শান্তিবালার হাতে চাল ডাল ধরিয়ে দিয়ে বলল।

আশ্চর্য ব্যাপার। দুদিন নিজের হাতে রেঁধে খাইয়ে শান্তিবালার মনের ব্যাধি অনেকটাই সেরে এল। শান্তিবালা রেঁধে রাখে। কৃতজ্ঞ চিত্তে সেই ভ্যান ওয়ালা এসে নিয়ে যায়।

আজকাল আর উদাস হয়ে বসে থাকে না শান্তিবালা। মন দিয়ে ঘরের সব কাজ করে। হাসে। কথা বলে। খাটনি একটু বেড়েছে। কারণ দুই দিনটা তিন দিন হয়েছে। আর খবর এসেছে ওরা নাকি খেয়ে আছে। ভালো আছে।

অজয়ের যে খরচটা হচ্ছে সেটা অ্যাফোর্ড করার ক্ষমতা অজয়ের আছে। অদ্ভূত একটা শান্তি আসছে মনে। ব্যাধি আর তার প্রকোপ নিয়ে চিন্তা আর করে না অজয়। রান্না করে অভুক্তকে খাইয়ে বাঁচতে সাহায্য করছে শান্তিবালা। এতেই শান্তিবালা ভালো আছে। অজয় তাতেই খুশি।

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

রাত জাগা ভোরে

প্রতীতি চৌধুরী

ট্রেনের সিঙ্গেল সিটে বসেছিল বিতান। মোবাইলে সেভ করে রাখা স্ক্রিনশটটা আরো একবার দেখলো। শিরোনামে লেখা আছে, "বর্ষীয়ান অভিনেতা পুলক ভাদুড়ীর সাথে মন্দারমনির সমুদ্র সৈকতে অন্তরঙ্গ অবস্থায় পাওয়া গেল বাঙালি অভিনেত্রী রঞ্জনা বাসুকে।" ঠিক যেমন চমকপ্রদ খবরের হেডলাইনটা হয় আরকি! পরেই রয়েছে বিস্তারিত খবর। 'মনমোহনা' টেলিফিল্মের শ্যুটিং-এ মান্দারমনিতে এসেছেন অভিনেতা পুলক ভাদুড়ী ও অভিনেত্রী রঞ্জনাবাসু। অন-স্ক্রিনগল্পটা শেয়ার করলেও অফস্ক্রিন কেমেস্ট্রি নিয়ে মুখ খুলতে দুজনেই নারাজ। প্রসঙ্গত মিষ্টার ভাদুড়ী ও রঞ্জনা বাসুকে কয়েকদিন আগেই একসাথে মালেশিয়া থেকে ছুটি কাটিয়ে ফিরে আসতে দেখা গেছিল কলকাতা বিমানবন্দরে। নয়নতারা ট্রেনের অন্য পাশের সিট থেকে ডাকলো,

-"এদিকে আসবে? খালি হচ্ছে. ."

মেজাজটা খিঁচিয়ে ছিল বিতানের। বিরক্ত হয়েই উত্তর দিল,

-"না, আমি ঠিক আছি. ."

নয়নতারা সরে গেল ট্রেনের অন্যদিকের জানালায়।

এক মাস হলো বিতানের সাথে বিয়ে হয়েছে নয়নতারার। কিখাবে, কখন ফিরবে ছাড়া আর কোনো কথা ওদের এই সংক্ষিপ্ত দাম্পত্যে হয়নি বললেই চলে। বাড়ি ফিরলে ও স্টাডিরুমেই বিতানের বেশিরভাগ রাত্রি কাটে। নয়নতারা বেশি কিছু জিজ্ঞাসা করলে বিরক্ত হয়। মাঝেমাঝে নয়নতারার মনেহয় ওকে যদি ভালোই না লাগে তবে বিয়ে করলো কেন! ছোটোথেকে মা নেই বলে মণিমা হয়তো নয়নতারাকে একটু বেশিই ভালোবাসতো। তা বলে নিজের ছেলের সাথে বিয়ে দিতে হবে এমন দিব্যি তো কেউ দেয়নি! বিয়ের আগে বিতান ওকে একবারও দেখতে আসেনি। নয়নতারার বাবা বলেছিলেন, আজকের যুগে মায়ের কথাতে মত দেওয়ার মতো ছেলে লাখে একটা হয়। সাতজন্মের সৌভাগ্য বলেও বিতানের সাথে গাঁটছড়া বাঁধছে। বিয়ের কয়েকদিন পরেই অবশ্য নয়নতারার ভুল ভাঙ্গে। বুঝতে পারে একটা খাপছাড়া সম্পর্কে ও পা রেখেছে। ওর সবকিছুই বিতানের ভীষণ অপছন্দের! এই ট্রিপটাতেও তো মণিমা ওকে জোর করে বিতানের সাথে পাঠিয়েছে। তাইতো মনে হচ্ছে ট্রেনের লাগেজের সাথে ও নিজেও বিতানের জীবনে একটা বাড়তি বোঝা! দূরের আকাশে ছোটা সাদা মেঘের টুকরো গুলোর দিকে তাকিয়ে রইলো নয়নতারা। বিতানের ভাবনারা তখন কয়েকবছর আগের এক পরিচয়ে মগ্ন।

বিতান সরকার 'স্ট্রিটস্টার' ম্যাগাজিনের সিনিয়ার জার্নালিষ্ট। রঞ্জনার সাথে ওর আলাপ হয়েছিল একটা ইন্টারভিউ সেশনে। মিস রঞ্জনা তখন উঠতি মডেল। কালার কাম মেক-আপ প্রোডাক্টসের নতুন মুখ।

রঞ্জনাকে প্রথম দেখেই বিতান হাঁ হয়ে গেছল। সিলভার কালারের টি-লেন্থ গাউন পরে রঞ্জনা এসে বসেছিল ওর সামনে। ওর বাদামি চোখের তারা, জোড়া ভ্রুর দিকে বিতান মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাকিয়েছিল।

বুদ্ধিমতী রঞ্জনা বুঝতে পেরেছিল বিতানের দুর্বলতা! 'স্ট্রিটস্টারে'র জার্নালিষ্ট হওয়ার সূত্রে বিতানের তখন অনেক যোগাযোগ। নামি কসমেটিক্স কোম্পানি, গারমেন্টস এজেন্সি, ফিল্ম ইন্ডাষ্ট্রির অনেকেই ছিল ওর বিশেষ পরিচিত। রঞ্জনা বুঝতে পেরেছিল বিতানের দুর্বলতাটা কাজে লাগাতে পারলে ওর উপরে ওঠার সিঁড়ি একদম পরিষ্কার। ইন্টারভিউ সেশনের শেষে বিতানের ফোননম্বরটা রঞ্জনাই সবার অলক্ষ্যে চেয়ে নিয়েছিল। রঞ্জনার রূপের আগুনে বিতান তখন বেঘোরে। প্রায়ই ওরা কাজের ফাঁকে সময় বের করে চলে যেত সমুদ্রে। ভিড় আর ব্যস্ততার শহর ছেড়ে হারিয়ে যেত অনেক দূরে। হয়তো রঞ্জনার ও টান তৈরি হয়েছিল। পুরোটাই পরিকল্পনা হলে কি রঞ্জনা ও এতো কাছাকাছি আসতে পারতো! নিজের সবটা ওকে উজাড় করে দিতে পারতো! এই মান্দার মনির সমুদ্র সৈকতেই তো কতো শীতের রাত্রে ওরা মিশে গেছে একে অপরের উষ্ণতায়! রঞ্জনা ওর জীবন সংগ্রামের গল্প শুনিয়েছিল। কিভাবে উত্তরবঙ্গের একটা ছোট্ট গ্রাম থেকে ও কলকাতায় পড়তে আসে! রাজেনের সাথে পরিচয় হয়। আর রাজেন এখন ওর বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে ব্ল্যাকমেল করছে। ও রাজেনের কাছ থেকে মুক্তি চায়। কিন্তু রাজেন ওকে কিছুতেই ছাড়ছেনা।

রাজেন ছিল রঞ্জনারই বন্ধু। একসময় ওকে সাহায্য করেছিল মডেলিং কোর্সে ভর্তি হতে। কিন্তু তার বিনিময়ে ওকে নিজের করে পেতে চেয়েছিল। মানসম্মানের পরোয়া না করেই রাজেনের সমস্যাটা সমাধান করতে অগ্রণী হয়েছিল বিতান। তখন যে বিতানও রঞ্জনাকে পেতে মরিয়া ছিল। ওর মধ্যে ঠিক ভুলের হুঁশই হারিয়ে গেছল। রঞ্জনা ওর কাঁধে মাথা রেখে কষ্টটা ভাগ করে নিতে চাইলে বিতানের মনে হতো রঞ্জনার কাছে ও পৃথিবীর সব সুখ এনে দেবে। তখন কি আর ভেবেছিল ওই কখনো রঞ্জনার জীবনে দ্বিতীয় রাজেন হয়ে যাবে! স্ট্রিটস্টারের কভার পেজ শ্যুটের সময় একান্তে কাটানো ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত, রঞ্জনার চেরি কালারড ঠোঁটে প্রথম চুমু, নিভৃত মুহূর্তে ওর ঠোঁটের উপরে ঘেমে ওঠা তিলটা, ক্লান্ত বাদামি চোখজোড়া এখনো যে মনে ভাসে। স্মৃতিরোমন্থনের মাঝেই বিতানের চোখ চলে গেল নয়নতারার দিকে। সবুজ শাড়িতে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে মেয়েটা। ততক্ষণে ট্রেন আরো কয়েকটা স্টপেজ পেরিয়েছে। নয়নতারাকে এক পাশে ঠেলে কয়েকজন লোকও এসে

বসেছে। নয়নতারা নিজেকে যতটা সম্ভব ট্রেনের জানালার সাথে সেঁটে চুপ করে বসে আছে।

বিয়ের পর থেকে নয়নতারার প্রতি কোনো আকর্ষণ অনুভবই করেনি বিতান। তার যথেষ্ট কারণও ছিল। রঞ্জনার বিশ্বাসঘাতকতার পরে ও মেয়েদের আর বিশ্বাস করতে পারতো না। তাছাড়া একদিকে অতিসাধারণ গ্রামের মেয়ে নয়নতারা আর অন্যদিকে রূপোলী পর্দার নায়িকা রঞ্জনা, পার্থক্যটা বড়ো বেশি কটাক্ষ করতো বিতানকে! রঞ্জনার শরীর শৈলি যেখানে ওকে মোহিত করে রাখতো, সেখানে নয়ন তারাকে কাপড়ের পুঁটলির বেশি ও মনে করতে পারেনি।

তবুও আজ নয়ন তারার পাশের লোকগুলোর বিশ্রী হাসি, নোংরা অঙ্গভঙ্গীতে বেশ অস্বস্তি লাগলো বিতানের। একবার ভাবলো নয়নতারার মতো একটা কাপড়ের পুঁটলিকে নিয়ে এতো নিরাপত্তা হীনতা অনুভব করার কি প্রয়োজন! কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো নয়নতারা ওর স্ত্রী। ওকে নিয়ে ট্রিপে বেরিয়েছে। দায়িত্ব তো একটা আছেই। স্থির হয়ে বসে থাকতে না পেরে ওদের কাছে উঠে এসে বিতান বলল,

-"এক্সকিউজমি.. আপনি ওই সিঙ্গেল সিটটাতে গিয়ে বসবেন?"

নয়নতারার গা ঘেঁষে বসে থাকা লোকটা বিশ্রী ভাবে হেসে বলল,

-"কেন রে! এই সিটটা কি তোর বাপের!"

নয়নতারা পিটপিট করে বিতানের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করলো কেসটা কি হলো! একটু আগে যখন ফাঁকা ছিল তখনতো বিতানই ওকে গ্রাহ্য করেনি।

-"ওনার অসুবিধা হচ্ছে... আপনি চেপে বসে আছেন.." নয়নতারাকে দেখিয়ে বিতান বলল।

সামনের লোক দুটো হোহো করে হেসে বলল,

-"কেন! তোর মা হয় না বোন!"

বিতান নয়নতারাকে উদ্দেশ্য করে বলল,

-"এই, তুমি সিঙ্গেলে গিয়ে বসো তো..."

নয়নতারা দ্বিরুক্তি না করে চুপচাপ উঠে গেল। বিতান জানালার পাশে বসতেই লোকগুলো সরে বসলো। পরের স্টপেজে লোকগুলো নেমে যেতেই নয়নতারা বিতানের পাশে এসে বসলো। বিতান ওকে আড়চোখে দেখেও আগের মতোই চুপ করে রইলো।

-"তুমি ওদের বললেনা কেন আমি তোমার কে?" নয়নতারা গাল ফুলিয়ে বলল।

-"মানে?"

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

-"ওরা যে জানতে চাইছিল আমি তোমার মা না বোন, তো তুমি কেন বললে না আমি তোমার. . . . ."
নয়নতারা থেমে যেতেই বিতান গম্ভীর স্বরে বলল,
-"যেটা বোঝোনা, সেটা নিয়ে কথা বলোনা।"
-"তুমি তো খুব বোঝো. . . আমি সব জানি. . ."
-"কি জানো?"
-"এই যে আমাকে ওরা ডিসটার্ব করছিল বলে তোমার রাগ হচ্ছিল। আমি তোমার বৌ কিনা! তাই তুমি জেলাস ফিল করছিলে।" গড়গড় করে বলে গেল নয়নতারা।
বিতানের হাসি পেয়ে গেল। বুঝতে পারলো নয়নকে বলেও কিছু লাভ নেই, ও বুঝবেনা।
উত্তর না পেয়ে নয়নতারা আবার বলল, -"আমি জানি তুমি কেন গোমড়া হয়ে থাকো! যাতে তোমাকে সবাই ভয় করে। এখন তোমার হাসি পাচ্ছে বলেই কথা বলা বন্ধ করে দিলে, তাইনা!" খিলখিলিয়ে হেসে নয়নতারা বলল।
এবার হালকা বকুনি দিল বিতান,
-"আহ ! এতো কথা ভালোলাগে না। আমি কিন্তু সিঙ্গেলে চলে যাবো, তখন কেউ ডিসটার্ব করলে বুঝবে।"
নয়নতারা বাচ্চামেয়ের মতো ওর ঠোঁট দুটো বেঁকিয়ে বিতানকে ভেংচি কাটলো।

****

গেষ্টহাউজে এসে বিতান 'স্ট্রিটস্টার' -এর নেক্সট প্রজেক্টটা ল্যাপটপে খুললো। এবারের থিম কনট্রাস্টেড ইন্ডিয়া। বিপরীত ধর্মী ছবি নিয়ে আসতে হবে ম্যাগাজিন কভারে। সেইমতোই আর্টিকেল রেডি করেছে বিতান। একদিকে অভাব, অন্যদিকে বিলাসিতা। দুই ছবির মাঝে চিরন্তনসত্য প্রতিফলিত হবে। তবে দুই মেরুর কনসেপ্টটা একই ফ্রেমেনিয়ে আসানিয়ে ও বেশ চিন্তিত। শুধু তো কাজ নয়, রঞ্জনার সাথে অন্তিম বার দেখা করতেই ও মান্দারমনিতে ছুটে এসেছে। নয়তো স্ট্রিটস্টারের চিফ এডিটর মিষ্টার দেশ পান্ডেতো বলেছিলেন লোকালয় থেকে দূরবর্তী কোনো একটা জায়গা বেছে নিতে। সুন্দরবন বাতার লাগোয়া অঞ্চল। মানুষের দারিদ্রের ছবিটা ওখানে আরো বেশি স্পষ্ট হতে পারতো!
কিন্তু এতোদিন পরে রঞ্জনার ফোন আসাতে ওর মাথায় কিযে চেপে বসেছিল! বিতান তো কম চেষ্টা করেনি ওকে ধরার! ইচ্ছে ছিল একবার অন্তত সামনাসামনি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করবে কেন! কেন ওকে এই ভাবে ব্যবহার করলো! রঞ্জনার নতুন ফ্ল্যাটেও ও দুবার দেখা করতে গিয়েছিল। সংবাদমাধ্যমের লোক বলে ঢুকতে দেয়নি। বছর কয়েক আগে রঞ্জনা যখন মুম্বাইয়ে ছিল তখন ও অনেক চেষ্টা করে বিতান ওর কাছে পৌঁছতে পারেনি। বিতানের

আজও মনে হয় রঞ্জনাতো ওর সাথে কমিটেড ছিল! তবে কেন মুম্বাইয়ে কাজ পাওয়ার পরেই ওকে এড়িয়ে যেতে শুরু করে! পাঁচবছর আগে ' আপ সে পেহেলে' মেগাসিরিয়ালে চান্স পাওয়ার পরেই রঞ্জনা কেমন বদলে যায়। অদ্ভুতভাবে একটা সাইড রোল থেকে সিরিয়ালের একদম লিডরোলে উঠে আসে রঞ্জনার নাম। শোনা যায় সিরিয়ালের প্রযোজক ভাস্কর কপূরের সাথে অভিনেত্রী মিস বাসুর গোপন সম্পর্কের কথা।

অবশ্য বিতান এই নিয়ে প্রশ্ন করাতে রঞ্জনা হাসতে হাসতে বলেছিল, "তোমরা জার্নালিষ্টরা শুধু প্রশ্নই করতে পারো! কখনো আমাদের লাইফে থেকে দেখো। রিউমার্স আর এ পার্ট অফ লাইফ। এতো ভাবার কি আছে!" বিতান বুঝতে পেরেছিল রঞ্জনা ওকে নীচু করতে চাইছে। ওর যোগ্যতা টা আঙুল তুলে দেখাচ্ছে। তবুও অপমান গায়ে মাখেনি। ওযে তখন রাজেনের মতোই পাগল। ওদের এতো দিনের মেলামেশা, ঘনিষ্ঠতা কিছুই ভুলতে পারছিলনা। মিষ্টার কপূরের পার্টিতে রঞ্জনাতো বিতানকে শুনিয়েই বলেছিল, "জার্নালিষ্টদের কাজই কুকুরের মতো গন্ধ শুঁকে চলে আসা।" রঞ্জনা তখন যে কোনো মূল্যে বিতানের থেকে পিছু ছাড়াতে চেয়েছিল। রঞ্জনার সব সোশ্যাল একাউন্টে যখন বিতান রাতারাতি ব্লক হয়ে গেল তখনই বুঝতে পারলো ওদের সম্পর্কটা শেষ হয়ে গেছে। রঞ্জনাকে আর কোনো দিনই বিতান পাবেনা।

এদিকে মণিমালা দেবী ছেলের বিয়ের জন্যে চাপ দিচ্ছিলেন। অবশেষে বিতান ওর মায়ের খুশির জন্যেই বলেছিল তোমাদের পছন্দে বিয়ে করবো। মণিমালা দেবীও ওনার এক মাত্র ছেলের সাথে নয়নতারার বিয়ে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন।

-"এই আমরা সিবিচে কখন ঘুরতে যাবো!" নয়নতারা জানালা দিয়ে নীলসমুদ্রের ঢেউ দেখতে দেখতে জিজ্ঞাসা করলো।

ল্যাপটপের স্ক্রিনে চোখ রেখেই বিতান বলল,

-"আমরা হানিমুনে আসিনি নয়ন...মা বলেছিল তাই তোমাকে নিয়ে এসেছি। কাজ আছে। ছেলে মানুষী করলে হবেনা।"

বিড়বিড় করে নয়নতারা বলল, "কতো যেন বুড়ো হয়ে গেছে!"

বিতান দেখলো ওর কথা শুনে নয়নতারার ঠোঁটজোড়া বাচ্চাদের মতো ফুলে গেল।

মাঝে মাঝে বিতানের খারাপও লাগে। নয়নতারা তো কোনো অন্যায় করেনি। তবুও কিছুতেই ওকে আপন করতে পারছেনা। নয়নতারার কাছাকাছি গেলে ওরঞ্জনার বাদামি চোখ দুটো মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে ওর প্রতারণা। রঞ্জনা নামটা বিতানকে এখনো চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে! নাহলে আজ তিন বছর পরে রঞ্জনার একটা কলে এতো দূরে ছুটে আসতো! ম্যাগাজিন, আর্টিকেল, ফটোগ্রাফ সবই তো এক প্রকার বাহানা। ক্যামেরাটা চার্জে বসিয়ে দিল। দুদিনের মধ্যে স্টোরিটা কভার করে কলকাতা ফিরে যেতে হবে। তার আগেই রঞ্জনার

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিতান প্রশ্ন করবে। এতোদিন ধরেও এই দিনটার জন্যেই তো অপেক্ষা করেছে। কতো বিনিদ্র রাত্রি কাটিয়েছে ওর সামনে একবার দাঁড়াবার বাসনাতে। জোর করেই ম্যাগাজিনের স্টোরিটা তেমন দেওয়ার চেষ্টা করলো বিতান। কনট্রাষ্টেড কনসেপ্টটা ছবিতে ও চায়।

তার মধ্যেই নয়নতারা স্নান সেরে চলে এলো। বিতান ল্যাপটপে ব্যস্ত আছে দেখে ও বলল,

-"ওরা কিন্তু লাঞ্চের অর্ডারটা বারোটার মধ্যে দিয়ে দিতে বলেছে।"

-"হ্যাঁ, তো দিয়ে দাও.." না তাকিয়েই উত্তর দিল বিতান।

-"চিলি প্রণ আর মিক্সড ফ্রায়েড রাইস অর্ডার করি!"

বিতান এতোক্ষণে নয়নতারার মুখের দিকে তাকালো। শাড়ি ছেড়ে ও এই প্রথমবার অন্য কিছু পরেছে। হলদে নীল সুতির ছাপ লঙ স্কার্টে নয়নতারাকে আরো বাচ্চা মনে হচ্ছে। স্নানকরার পরে ওর কোঁকড়ানো চুল থেকে হলুদ টপে জল গড়িয়ে পড়ছে। প্রসাধনী ছাড়া ও নয়নের চোখ দুটো ভারী সুন্দর। রঞ্জনার মতো আকর্ষণ না থাকলেও ঘন কালো তারাতে স্নিগ্ধতা আছে। হয়তো এই মিষ্টি আবেশের জন্যেই কেউ নাম রেখেছিল নয়নতারা।

-"অর্ডারটা দিয়ে আসি!"

নয়নতারার কথাতে ভ্রু কুঁচকালো বিতান।

-"মানে! তুমি এইভাবে অর্ডার দিতে যাবে! আমি যাচ্ছি..."

নয়নতারা ফিকফিক করে হেসে বলল,

-"রুমসার্ভিসটা কি এমনিই আছে! আমি কেন বেরোবো!"

বিতান নিজেই লজ্জাতে পড়ে গেল। কত বড়ো বড়ো পাঁচতারা রেস্তোরাঁতে কাটিয়েছে বিতান। আর একটা গ্রাম্য মেয়ের কাছে এভাবে বোকা হয়ে গেল!

অর্ডারটা দিয়ে নয়নতারা বলল,

-"আমার কিন্তু খারাপ লাগেনি। কনসারভেটিভ হওয়া ভালো... পজেসিভনেসও ভালো। দ্যট ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেজ অফ লাভ!"

-"কি! মানে! কে কনসারভেটিভ!" তোতলিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলো বিতান।

-"সেকি! তুমি অভিজ্ঞ জার্নালিষ্ট হয়ে এটুকুর মানে জানোনা!" বিতানের গালের দাড়িটা নেড়ে দিয়ে চলে গেল নয়নতারা।

****

বিতান সকালে চেক-ইন করার সময়েই ওদের গেষ্টহাউজ কুইনভিলার রিসেপশনে খোঁজ নিয়েছে। মন-মোহনার শুটিং টিম ভিক্টোরিয়া রেসর্টে আছে। বিতানকে অবশ্য রঞ্জনা ওর হোটেলে যেতে মানা করেছে। রঞ্জনার কথা মতো ওরা সমুদ্র সৈকতেই দেখা করবে।

সমুদ্রের তীরের সান্ধ্য হাওয়া রঞ্জনার খুব প্রিয় ছিল। সূর্যাস্তের আগেই ওরা বেরিয়ে পড়তো। তীর ভূমি বরাবর বালুপথে হেঁটে যেত। মোহনার ধারে বসে উপভোগ করতো এলোমেলো দামাল হাওয়া। মৌচাকে বসে খেত প্রণ কাটলেট। রঞ্জনা বলতো খোলা আকাশের নীচেই অনুভূতিরা থাকে।

বিতানের হাত ধরে রঞ্জনা ছুটে যেত ঢেউয়ের দিকে। বিতান ওকে নিয়ে নামতো সমুদ্রের ঘন নীল জলে। হাঁটু অবধি জলে একে অপরের ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে হারিয়ে যেত অন্ধকারে। নিশ্চয় এতো বছর পরে মান্দারমনিতে এসে সেই সব পুরোনো স্মৃতিমনে পড়েছে রঞ্জনার। না হলে কেন কল করবে বিতানকে! রঞ্জনার চোখে বিতান অনুশোচনা দেখতে চায়। ওকে স্বীকার করতেই হবে ও অন্যায় করেছে। রঞ্জনার অহঙ্কারি বাদামী চোখের তারায় অনুতাপের বৃষ্টি না দেখা অবধি বিতানের মন যে শান্ত হবেনা। রঞ্জনার বিশ্বাসঘাতকতা ও ভুলতে পারেনি। পুরোনো অপমানের আগুনে এখনো দগ্ধ হয় বিতান। নয়নতারা রূপোলি রঙের ঝলমলে গাউন পরে বিতানের সামনে ইচ্ছে করেই ঘুরতে লাগলো। বিতান তখন জিন্স আর নেভি ব্লুচেক শার্ট পরে মোটামুটি প্রস্তুত।

-"জানতাম তুমি বিকেলে বেরোবে। তাই তো আগেই রেডি হয়ে নিয়েছি।" নয়ন তারা উচ্ছ্বসিত গলায় বলল।

বিতান ইতস্তত করে বলল,

-"দেখো নয়ন, আমরা ঘুরতে আসিনি। আর্টিকেলটা ঠিক মতো সাজাতে হবে। ছবি তুলতে হবে। থিমটাও একদম অন্যরকম। তুমি ঠিক বুঝবে না।"

নয়নতারা আজ আর ওর কথা শুনে পিছিয়ে গেলনা। ইচ্ছে করেই বিতানের চোখে চোখ রেখে কাছাকাছি গিয়ে বলল,

-"আর এখানে একা একা আমি কি করবো!"

বিয়ের পরে নয়নতারা এই প্রথমবার এতো সেজেছে। ওকে আর কাপড়ের পুঁটলি মনে হচ্ছেনা। সিলভার গাউনে আকর্ষণীয় লাগছে। ঠোঁটে গোলাপি লিপস্টিক, চোখে স্মোকি কাজল। নয়নতারা কে অনেক বেশি পরিণত মনে হলো। ওর চোখে বাচ্চামি নেই। শুধুই বিতানকে পাওয়ার আকুতি। বিতান ধীরে ধীরে ওর ঠোঁটের কাছে নিয়ে গেল নিজের দুটো ঠোঁট। চেনা নয়নতারাকে অচেনা রূপে দেখে বেসামাল হতেই যাচ্ছিল তখনই মনে পড়লো ওকে রঞ্জনার কাছে যেতে হবে। পুরোনো হিসেব যে বাকি রয়ে গেছে! নয়ন তারার কাছ থেকে পিছিয়ে এলো বিতান। তখনো নয়নতারা বন্ধ চোখের পাতায় ঝলমল করছে নেভিব্লু আইশ্যাডো। ঠোঁটে লেগে রয়েছে বিতানকে পাওয়ার তীব্র বাসনা। বিতান গলা ঝেড়ে বলল,

-"সরি নয়ন... এবার না বেরোলে খুব দেরি হয়ে যাবে। চলি..."

নয়নতারার খুব কান্না পাচ্ছিল। একমাস ধরে তো উপেক্ষা সহ্য করছে। আজ বিতানের সাথে ট্রিপে বেরিয়েও ওকে একলা কাটাতে হবে!

-"না বলে দিতে পারতে মণিমাকে! কেন নিয়ে এলে আমাকে! কেন বিয়ে করেছিলে! এভাবে মেরে ফেলবে বলে!" চেঁচিয়ে উঠলো নয়নতারা।

বিতানের ইচ্ছে করলো ওকে জড়িয়ে ধরে আপন করে নিতে। কিন্তু বাদামী চোখের টানকেও যে অগ্রাহ্য করতে পারলোনা।

এতো দিনের হিসেব মেটাবার সুযোগও হাতছাড়া করতে পারবেনা।
দরজার থেকে বেরিয়ে গেল বিতান। আরো একবার নয়নতারা চেঁচিয়ে বলল,
-"সবেরই একটা লিমিট আছে। আর কত ইনসাল্ট করবে আমাকে! তুমি কিচাও আমি তোমার জীবন থেকে চলে যায়! নিজেকে শেষ করে ফেলি!"
শান্ত ভাবে বিতান উত্তর দিল,
-"গানশোনো, মুভি দেখো। টিভি রিমোট সবইতো রয়েছে। জীবন শেষ করতে হবে কেন!"
একা বসে ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদতে লাগলো নয়নতারা। সবদোষ মণিমাকে দিয়ে বিড়বিড় করলো, "কেন মণিমা! কেন তুমি এই পাষন্ডের ঘাড়ে আমাকে তুলে দিলে!"

****

-"আমি জানতাম তোমাকে এখানেই পাবো। এইজায়গাটা তোমার খুব প্রিয় ছিল মনে আছে! সেই কাঁকড়া ধরার ছবিটা..."
-"মনে নেই আবার! তুমি কিভালো ছবি তুলতে! জানো বিতান, তোমার সব ছবি রাখা আছে।" মায়াবি চোখে তাকিয়ে বলল রঞ্জনা।
-"তাই নাকি!"
বিতানকে এতোদিন পরে সামনে পেয়ে রঞ্জনা ফিরে যাচ্ছিল ওদের সম্পর্কের চারটে বছর আগে।
-"এই সমুদ্র, মোহনা, বালি সব একই আছে.. শুধু আমরাই কেমন বদলে গেছি না!" আবেগি হয়েই বলল রঞ্জনা।
-"আমরা নই, তুমি বদলে গেছ রঞ্জু। নানান রূপে দেখেছি তোমাকে। অভিনেত্রী তো! এখন চিনতে পারি না কোনটা আসল!"

-"এতোদিন পরে আমাদের দেখা হলো। তুমি এই ভাবে কথা বলবে বিতান!" রঞ্জনার গলার স্বরটা কাতর শোনালো। বিতান থমকে গেল।
রঞ্জনা আবার বলল,
-"জানি তুমি আজও আমাকে ভালোবাসো, তাইতো এতো বড়ো সৈকতে ঠিক খুঁজে পেয়ে গেলে!"
-"না মিস রঞ্জনা, একদম ভুল। আমরা কুকুরের জাত না! তাই গন্ধ শুঁকে চলে এলাম..."
আবছায়াতেও রঞ্জনা দেখতে পেল বিতানের ঠোঁটের কোণে বিদ্রুপের হাসি।
-"ভালো আছো তাইনা! বিয়ে করেছো খবর পেলাম!" গম্ভীর হলো রঞ্জনা।
-"আমার মতো অর্ডিনারিজার্নালিষ্টের খবর রাখেন মেগাস্টার রঞ্জনা বাসু!"
অতীতের অপমান ঘুরে এসে কাঁটার মতো বিঁধলো রঞ্জনাকে। অস্বস্তিতে পড়েই ও আর কথা না বাড়িয়ে হাঁটতে লাগলো। কিন্তু এতো বছর পরে বিতানতো পুরোনো হিসেব না মিটিয়ে যেতে দিতে পারেনা।
-"আমার তো তোমার মতো পাবলিক পেজ নেই... তারপরেও খবর পেয়ে গেলে! নাকি খবর নিয়েছো!" রঞ্জনার পাশে এগিয়ে গিয়ে বিতান জিজ্ঞাসা করলো।
রঞ্জনার ঠোঁট দুটো তিরতির করে কেঁপে উঠলো। বিতান কি কিছু ভুল দেখলো! উত্তর না পেয়ে আবার বিতান বলল, -"কেন! তোমার নতুন বয়ফ্রেন্ড মিষ্টার ভাদুড়ী কি তোমাকে খুশি করতে পারছেনা!" রঞ্জনা আশা করেছিল বিতান ওর বাদামি চোখের নেশাতে আরো একবার নতুন করে বাঁধা পড়বে। কিন্তু বিতানের পাল্টা জবাবেই রঞ্জনা বুঝতে পারলো সেই দিন আর ফিরে আসবেনা। পুরোনো মেজাজে রঞ্জনা বলল,
-"এক্সকিউজমি! তুমি কিন্তু আমার পার্সোনাল লাইফে ইন্টারফেয়ার করছো!"
-"কুকুর কিন্তু আজ শুধু গন্ধ শুঁকে আসেনি ম্যাম। আপনিই প্রলোভন দিয়ে ডেকেছেন।"
রাগে ফুঁসতে লাগলো রঞ্জনা। চেঁচিয়েবলল,
-"হোয়াট ইউ মিন! আমার পার্সোনাল লাইফ নিয়ে কাঁটাছেড়া করার অধিকার আপনাকে কেউ দেয়নি মিষ্টার সরকার।"
-"আর যদি বলি আমি আজ এখানে জার্নালিষ্ট হয়ে আসিনি, এসেছি তোমার প্রাক্তনের অধিকারে!" বিতান শান্ত ভাবে উত্তর দিল।
ছলছলে হয়ে উঠলো বাদামি চোখের তারা। তবে বিতান থামলো না। বলতে লাগলো,
-"হ্যাঁ, রঞ্জু... এটুকু জানার অধিকার আমার আছে। কেন এড়িয়ে গেলে আমাকে! কেন ব্লক করে দিলে! কেন সরিয়ে দিলে তোমার জীবন থেকে!"
মান্দারমনির নিরালা প্রান্তরে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এলো রঞ্জনার আওয়াজ,

-"আমি সফল অভিনেত্রী হতে চেয়েছিলাম। স্টার হতে চেয়েছিলাম। সেলিব্রেটির জীবন চেয়েছিলাম। আমার কিছু স্বপ্ন ছিল, টার্গেট ছিল, সেটা পূরণ করতে চাওয়া তো কোনো অন্যায় নয়!"

-"সেটা কি ভাস্কর কপূরের সাথে বিছানায় শুয়ে!" ভাববার অবকাশ না দিয়েই অত্যন্ত ক্রুর ভাবে জিজ্ঞাসা করলো বিতান।

জ্বলন্ত চোখে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো রঞ্জনা। কোনো উত্তর দিল না। মনে মনে ভাবলো এই কিসেই বিতান! যে ওর সামনে পিছনে ঘুরতো। ওর খুশির জন্যে যেকোনো কাজ করতে রাজি ছিল!

-"রাজেশ, আমি, মিষ্টার কপূর থেকে পুলক ভাদুড়ী... আর কতজন কে তোমার সাকসেসের সিঁড়ি বানাবে রঞ্জু! সত্যিই তুমি স্টার হওয়ার যোগ্য! আমাদের মতো স্ট্রিটস্টার নও, বড় আকাশের নক্ষত্র।" বিতানের বলা নির্মম সত্যি আর সহ্য হলনা রঞ্জনার। চোখ দিয়ে দরদর করে জল গড়িয়ে পড়লো। মাথার উপরে চাঁদ উঠেছে। আকাশ ভর্তি তারা। ঝড়ো হাওয়া বইছে। ওরা দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে এতো বছর পরে ওদের চেনা সমুদ্রতটে। বিতান ঠিক সেটাই দেখতে পেল যেটাও এতোদিন চেয়েছিল। রঞ্জনা কাঁদছে। অনুতাপেই কাঁদছে। তবে এতোটা ও কি আশা করেছিল বিতান!

রঞ্জনা কাঁদতে কাঁদতে ওকে জড়িয়ে ধরে অনুরোধ করলো,

-"চলো, বিতান... আমরা সব ছেড়ে চলে যাই। অনেক দূরে কোথাও... বিশ্বাস করো আমি এখানে ভালো নেই। একদম ভালো নেই।"

চৈতন্য ফিরে এলো বিতানের। এসব কি বলছে রঞ্জনা! ওতো শুধু রঞ্জনাকে নিজের চোখে অপরাধী করতে চেয়েছিল। কিন্তু সব ছেড়ে চলে যাওয়া সেটা কি সম্ভব!

একটা সময়ে বিতান অনেক চেষ্টা করেছিল রঞ্জনাকে ফিরিয়ে আনার। ও তখন মুম্বাইয়ে মিষ্টার কপূরের সাথে। হয়তো বলিউডে সিনামা করার অফারও পেয়েছিল। এখন সব হারিয়ে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে ফিরে এসেছে কলকাতায়। ছোটোখাটো টেলিফিল্মে সুযোগ পাচ্ছে তাও হয়তো পুলক ভাদুড়ীর মতো পঞ্চাশোর্ধ অভিনেতার সাথে প্রেমের নাটক করে। তাই কি গ্ল্যামারের জগত থেকে বিদায় নিতে চাইছে! আরো একবার ওকে ব্যবহার করতে চাইছে! রঞ্জনাকে ওর থেকে সরিয়ে দিল বিতান। রঞ্জনা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, -"কেন বিতান! এজন্যেই তো তুমি একটা ফোনে এতো দূরে ছুটে এসেছো! তোমার মনে নেই সমুদ্রে নেমে আমরা কি করতাম!"

বিতান দুদিকে ঘাড় নেড়ে বলল, -"ওটা আমাদের ফেলে আসা অতীত রঞ্জু। সমুদ্রের বুদবুদের মতো সমুদ্রেই মিশে গেছে। শুধু কিছু প্রশ্ন বাকি রয়ে গেছল, সেটার উত্তর পেতেই এতোটা পথ ছুটে এসেছিলাম।"

-"কেন! আজ তুমি বিবাহিত বলে!" রঞ্জনার মেরুন ঠোঁটে একরাশ বিদ্রুপ।

বিতান দেখলো চোখের জলে ওর কাজল লেপ্টে গেছে। তবুও অহঙ্কার মিটেনি। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বিতান বলল,

-"হয়তো তাই হবে. . ."

বিতান বুঝতে পারলো রঞ্জনার সাথে দেখা করতে আসা ওর ভুল হয়েছে। পিছনে ঘুরে গেষ্ট হাউজের রাস্তা ধরলো। রঞ্জনা সহ্য করতে পারলো না বিতানের প্রত্যাখ্যান। চেঁচিয়ে বলল,

-"সেকি আমার থেকেও সুন্দরী? আমার থেকেও ভালোরাখতে পারবে তোমাকে?"

বিতান শান্ত ভাবে আরো একবার রঞ্জনার বাদামী চোখে চোখ রেখে বলল,

-"সুন্দরী! সত্যিই কি তুমি সুন্দরী! আয়নার সামনে নিজেকে প্রশ্নটা করোতো! আর ভালোরাখা! ভালো থাকতে জানলেই ভালো রাখা যায়।"

****

কুইন ভিলাতে ফিরে আসার সময় বিতানের নিজেকে খুব হালকা লাগছিল। নয়নতারার কথা মনে করেই ভাবলো আরেকটা দিন অফিসে ছুটি নেবে। মেয়েটা খুব আশা করেছিল ওর সাথে বেরোবে! আগে হয়তো কখনো সমুদ্রই দেখেনি। আবার ঘরে গিয়ে যদিও মণিমালাদেবীকে নালিশ করে বিতান ওকে বাইরে নিয়েই যায়নি তাহলে তো আরেক কান্ড হবে! নয়নতারার বয়সটা কম বলেই একটু বেশি ছেলেমানুষী করে। ওর তো কোনোদোষ ও নেই। বিতান ওকে বিয়ে করেছে। ওর কাছে কি নয়ন সামান্য কিছু প্রত্যাশা করতে পারেনা! বিতান ওকে রাগ দেখায়, বিরক্তি দেখায় তার পরেও তো মেয়েটা ওকে ভালোরাখতে চায়। আহা এরকম মেয়েকে ভালোনাবেসে কি পারা যায়! মণিমালাদেবী হয়তো ঠিকই বলেছিলেন, নয়নতারা সমুদ্র থেকে পাওয়া খাঁটি মুক্তো। মুক্তোর মতোই ওর মনটা একদম সাদা।

-"স্যার, চাবি কাঠিটা. . ম্যাম একটু বেরিয়েছেন।"

নয়নতারার কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে কুইন ভিলাতে পৌঁছে গেছল ও খেয়ালই করেনি। চমক কাটলো রিসেপশনের কমবয়সী চশমা পরে ছেলেটার কথাতে।

কিন্তু নয়নতারা একা বেরিয়েছে! শুনেই চোখ দুটো কপালে উঠলো বিতানের। ট্রেনের মধ্যে দুমিনিটও ওয়াশরুম গেলে যে মেয়ে ভয়ে অস্থির হয়ে যায়, সে এখানে অজানা জায়গায় বেরিয়েছে মানে! সাথেসাথেই জিজ্ঞাসা করলো বিতান,

-"কার সাথে গেছে! কোথায় গেছে! কখন ফিরবে কিছু বলেছে!"

রিসেপশনের অল্পবয়সী ছেলেটা বিতানের এতো প্রশ্নে ঘাবড়ে গিয়ে বলল,

-"নাতো স্যার। ওসব কিছু বলে যাননি। শুধু রুমের কি-টা আপনি এলে দিয়ে দিতে বললেন।" বিতানের মাথাতে কিছু এলোনা। এতো রাত্রে অন্ধকারে ও নয়নতারাকে কোথায় খুঁজবে! তবে কিএখানে ওর চেনাজানা কোনো বন্ধু এসেছিল! তাদের সাথেই দেখা করতে

গেছে! একটাতো ফোনও করতে পারতো। কথাটা ভেবেই পরের মুহূর্তে ভাবলো কখনোতো ও ফোননম্বরটা ও নিয়ে রাখেনি।

বিতান একই ভাবে রিসেপশনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে দেখে চশমা পরা ছেলেটা জিজ্ঞাসা করলো, -"এনি প্রবলেম স্যার! ম্যা আই হেল্প ইউ!"

মনে মনে করলো বিতান, তুই আর কি হেল্প করবি! আমারই তো ভুল।

ক্লান্ত ভাবে বিতান বলল,

-"নো. . . থ্যাঙ্কস।"

-"স্যার ডিনারের অর্ডার নেবো!"

বিতান ভাবলো নয়নতারা কখন ফিরবে তার ঠিক নেই। ও আর একা একা কি খাবে! তার চেয়ে নয়ন ফিরলেই কিছু অর্ডার দিতে বলবে। এমনিতেও নয়নতারা অর্ডার ভালো দেয়। দুপুরের কথাটা মনে করেই হালকা হেসে বলল, -"না, এখন কিছু লাগবে না।"

বিতান ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো চার তলায়। মনে হলো আর তো কোনো তাড়া নেই। কি হবে লিফটে! নয়নতারাই যখন বেরিয়ে গেছে রুমে গিয়ে আর কি-ই বা করবে! নিজের অনুভূতিতে নিজেই যেন চমকে উঠলো বিতান। ওর বিবেকই যেন ওকে ঘুরে প্রশ্ন করলো, ও নয়নতারার জন্যে এখানে এসেছে! নাকি রঞ্জনার জন্যে! আর ওর ম্যাগাজিনের কাজটা, সেটা কি তাহলে শুধুই দেখানো ছিল! বিতানের মাথার ভারী বোঝাটা হালকা হয়ে গেছে, তবুও কেমন যেন অবসন্ন লাগছিল! হয়তো এতো বছরের চাপ মুক্তির পরে এরকমই লাগে। রুমের ভিতরে গিয়ে আর আলো জ্বালতে ইচ্ছে করলোনা। কাজ করতেও মন চাইলোনা। অনেকদিনের পুরোনো ক্ষততে আজ মলম পড়েছে। অন্ধকারেই শুয়ে রইলো বিতান। নয়নতারা ফিরে এলে যে বকবক করে তুলে দেবে সে বিষয়ে ওর পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আজ আবার নয়ন একা বেরিয়েছে। এসেই হয়তো কোমরে হাত দিয়ে বলবে, দেখলে আমার কত সাহস! তুমি না থাকলে থোড়িই কিছু এসে যায়! আমি একাই সব পারি। নয়নতারার ঘন কালো নয়ন জোড়া মনে করেই কখন যে ওর চোখে ঘুম নেমে এলো ও বুঝতেও পারলোনা।

****

পাখির ডাক কানে আসতেই ধড়ফড় করে উঠে বসলো বিতান। ভোর হয়ে গেল! খোলা জানালা দিয়ে দেখলো আকাশে হালকা আলোর প্রভা। রুমের আলোটা জ্বেলেই চোখ দুটো ভালো করে ঘষলো। নয়নতারা এখনো হোটেলে ফিরেনি! মেয়েটা তা হলে গেল কোথায়! গলার কাছটা শুকনো লাগলো। বিকেলে নয়নতারার সাথে ঝামেলা হয়েছিল। ওযেন কেমনই ভাবে কথা বলছিল! সত্যিই নয়ন কোথাও চলে গেল না গো!

অস্থির ভাবে ঘরের এদিক ওদিক তাকাতেই বিতান আবিষ্কার করলো নয়নতারার লেখা চিরকুটটা। ওরল্যাপটপের ঠিক পাশেই রাখাছিল। রাত্রে আলো জ্বালায়নি বলেই চোখে পড়েনি। গোটা গোটা অক্ষরে লেখা আছে,

-"আমি জানি তুমি কি কাজে গেছ! আমিও বেরোলাম। অপেক্ষা করোনা।"

বিতানের বুকের বামদিকটা কেঁপে উঠলো।

নয়নতারা জানতো ও কোথায় গেছে! কার সাথে দেখা করতে গেছে! সব জেনেও ওকে আটকাবার চেষ্টা করেছিল! তারপরেও বিতান ওকে চরম উপেক্ষা করে ছুটে গেছে সমুদ্রে। কার জন্যে! যে ওকে চিরদিন ব্যবহার করেছে! রঞ্জনার চোখে সামান্য অনুতাপ দেখার জন্যেও এতোটা মরিয়া হয়ে উঠেছিল!

হাতের মুঠোটা শক্ত করে বেশ কয়েকবার নিজের কপালে মারলো বিতান। কিভাবে ফিরিয়ে আনবে ও নয়নতারাকে! মাকেই বা কোনমুখে বলবে মান্দারমনি এসে নয়নতারাকে হারিয়ে ফেলেছে! আর একমুহূর্তও দেরিনা করে বিতান দরজা লক করে নীচে নেমে গেল।

কুইনভিলার রিসেপশনের সামনে স্থানীয় দুজন লোক কথা বলছিল। বেশভূষা দেখে মনে হলো টোটো চালায়। হয়তো প্যাসেঞ্জার নিতে এসেছে। তবে গত কাল রাত্রের চশমা পরে ছেলেটা রিসেপশনে নেই। অন্য একজন ভদ্রলোক চেয়ারে বসে আছেন। বিতান কিছুনা বলেই চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ সেই মাঝবয়সী ভদ্রলোক ডাকলেন,

-"এক্সকিউজমি স্যার. ."

বিতান ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল,

-"হ্যাঁ, বলুন. . ."

ভদ্রলোকের মাথার চুল খুবই অল্প। দেখেই বোঝা যাচ্ছে টাক পড়তে শুরু হয়েছে। গালের পাশে বড়ো একটা আঁচিল।

-"প্রবলেম কিছু নেই। তবুও তাজপুরের ওইদিকে যাবেন না। পুলিশ টুলিশ আছে।"

বিতানের ভ্রু কুঁচকে বলল,

-"পুলিশ! এত ভোরে পুলিশ কেন! কিছু হয়েছে?"

ভদ্রলোক রিসেপশনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদুটোর দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করে বললেন, -"না স্যার, তেমন কিছু নয়। ওই রাতের দিকে একজন মহিলার ডেডবডি পাওয়া গেছে। জেলেরাই দেখেছে।"

বড় বড় চোখে বিতান বলল, -"ডেডবডি!"

-"মনেহয় সুইসাইড। এখন তো জোয়ারের সময় নয় যে ভেসে যাবে. . . . আর এখানে তেমন এন্টিসোশ্যাল এক্টিভিটি. . ." রিসেপশনিষ্ট ভদ্রলোককে ইতস্তত করতে দেখে সামনের লোকটা তাচ্ছিল্য করে বলল,

-"না, না... ওসব খুন, এক্সিডেন্টনয়। বড়লোকের মেয়ে ছেলে.. কেচ্ছা ছিল হয়তো... সুইসাইড-ই করেছে। জামাকাপড় দেখেতো তাই মনে হলো!"

বিতানের মাথাটা ঘুরাতে লাগলো। গতকাল বিকেলে নয়নতারার বলা কথাটা মনে আসছিল। ও তো বলছিল নিজেকে শেষ করে ফেলার কথা! তবুও বিতান থামেনি। তবে কি! বিতানের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। তবুও সাহস করে জিজ্ঞাসা করলো বিতান,

-"আপনি দেখেছেন! মানে বডিটা!"

লোকটা মুখে কিছু চিবোতে চিবোতে বলল,

-"হাঁ, ওই রাতে খবর পেয়ে দেখতে গেছলাম... ওই মাছের আঁশের মতো... কি বলে রূপোলি রূপোলি চকচকে জামা পরেছিল! ভালো ঘরের-ই মেয়ে মনে হলো। মুখটা দেখিনি স্যার। পুলিশ এসে সরিয়ে দিল।"

টলমল পায়ে গেষ্ট হাউজ থেকে বেরিয়ে এলো বিতান। ছুটতে লাগলো সমুদ্র তটের দিকে। নয়নতারা তো কাল বিকেলে সিলভার কালারেরই ড্রেস পরেছিল! তবে কি বিতানের জীবনে শেষ আলোর প্রভাটাও নিভে গেল! এসবই ওর উদাসিনতার ফলা ওর তাচ্ছিল্য নিশ্চয় ভিতরে ভিতরে শেষ করে দিয়েছিল নয়নতারাকে।

বিতান কি সব ভাবছে! নয়নতারাকে ঠিক ও খুঁজে পাবে। কখন যে ওর চোখদুটো ঝাপসা হয়ে গেছিল বুঝতেই পারেনি। খেয়াল হলো সামনে সুবিশাল সমুদ্র দেখে।

এতো বড়ো প্রান্তরে ও কোথায় খুঁজবে নয়নকে! নিরিবিলিতে একদম্পতি সমুদ্রের জলে দাঁড়িয়ে উষ্ণ আলিঙ্গনে উপভোগ করছে ভোরের নৈসর্গিক সৌন্দর্য। সমুদ্রের ঢেউয়ের আওয়াজ বয়ে যাচ্ছে এ প্রান্ত থেকে ওই প্রান্তে। শুধু ওর নয়ন নেই।

বিবেকের দংশনে প্রতি মুহূর্তে চুরচুর হয়ে যাচ্ছে বিতান। মনে পড়ছে নয়নের সাথে বিয়ের কথা। মালা বদল করে সাত পাক ঘুরে সাত জন্মসাথে থাকার অঙ্গীকার। অনেকটা ছুটে হাঁপিয়ে গিয়ে সমুদ্রের বেলাভূমিতেই বসে পড়লো বিতান। প্রভাতি আলো, সমুদ্রের ঢেউ, ঠান্ডা হাওয়া সব মিথ্যে লাগছে বিতানের। পিছন থেকে কারো একটা পায়ের আওয়াজ পেতেই ও চমকে উঠে বলল,

-"নয়ন..."

না, নয়নতারা নয়। একটা বাচ্চা মেয়ে মায়ের হাত ছেড়ে ছুটতে ছুটতে ওর কাছে চলে এসেছিল। চোখ দুটো ঠিক নয়নতারার মতো। ওকে দেখেই খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো। বাচ্চা মেয়েটার মা ওকে কোলে নিয়ে চলে গেল।

বিতান আবার হাঁটতে শুরু করলো। ওকে যে নয়নকে খুঁজে পেতেই হবে। সামনে ধূধূ বালি। সমুদ্রের জল বিতানের পা ভিজিয়ে দিচ্ছে। তবুও থামলে চলবেনা।

বেলাভূমি রেসর্ট পেরিয়ে বিতান চলে গেল লাল কাঁকড়ার বিচক্যাম্পে। শুরু হলো গ্রাম্য বসতি। কিছু দূরেই বয়ে গেছে পিচাবনী নদী। বেশির ভাগই মাঝি মোল্লাদের বাস। ভোরের

আলো ফুটতেই মাঝিরা ডিঙি নিয়ে সমুদ্রের কিনারাতে ফিরছে। নৌকা তটে বেঁধে জাল নামাচ্ছে। জাল ভর্তি কাঁকড়া, শামুক, সামুদ্রিক মাছ ভোরের আলোতে চকচক করছে।
মান্দারমনির বিচ থেকে নিরালার দিকে অনেকটা চলে এসেছে বিতান। একটু দূরেই নদীর মোহনা। তার কাছাকাছি যেতেই বিতান দেখতে পেল আকাশী রঙের চুড়িদার পরে মেয়েটাকে। সদ্য যে নৌকাটা তটে বাঁধা হলো তারই সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছে। কয়েকটা বাচ্চা ছেলে খালি গায়ে বডি বিল্ডার গোছের পোজ দিচ্ছে। ওদের সবারই মুখে নির্মল হাসি। বিতান জানে জেলেদের ছেলে পুলেরা সকালে সমুদ্রে আসে। হোটেলে টাটকা মাছ পৌঁছতে যায়। কিন্তু পশ্চিমে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটাকে! মেয়েটার কোঁকড়ানো চুলে এসে পড়ছে সূর্যের নরম কিরণ! ওর নয়নতারার মতো না!
আরেকটু কাছে যেতেই বিতান বুঝতে পারলো শুধু মেয়েটা নয়, ক্যামেরাটাও ওরই।
বিতান প্রচন্ড রাগী গলায় বলল,
-"মেরে ফেলতে চাও আমাকে! সারারাত্রি কোথায় ছিলে তুমি! জানো আমার কি অবস্থা!" নয়নতারা পিছনে ঘুরলো। শান্ত চাউনি। বিতান আরো একবার ধমক দিল,
-"কি প্রমাণ করতে চাও! তুমি বীর পুরুষ! খুব সাহস তোমার! একারাত্রে যদি কিছু বিপদ হয়ে যেত! জানো কাল রাত্রে তাজপুরে একটা বডি পাওয়া গেছে..."
নয়নতারা অবাক হয়ে দেখলো বিতানের কেমনই পাগল পাগল অবস্থা! চোখ ছলছল করছে, কপালে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে, জামাটা ভিজে গায়ের সাথে লেপ্টে গেছে।
-"জানি, মানে ওই জন্যেই তো ফিরতে পারলামনা। ওদের ঘরে ও বলল রাত হয়ে গেছে যখন থেকে যেতে।" গ্রাম্য বসতির দিকে ইঙ্গিত করে মিনমিনে আওয়াজে বলল নয়নতারা। ভ্রু কুঁচকে বিতান জিজ্ঞাসা করলো,
-"মানে! ওদের ঘরে তোমার চেনা জানা ছিল!"
-"তা কেন হবে! তোমার ছবির দরকার ছিল না! ইন্ডিয়ান রুরাল পোভার্টি! সেদিন তুমি পাসওয়ার্ড দিতে ভুলে গেছলে যখন আমি সব পড়েছিলাম।"
একের পর এক চমক লেগে বিতানের মাথাটা আলোর চেয়েও বেশি গতিবেগে ঘুরছে। বিড়বিড় করে বিতান বলল,
-"তুমি ও সব পড়তে পারলে!"
নয়নতারা ওর নিজের ভঙ্গীতে গাল ফুলিয়ে বলল,
-"আমি ইংলিশে গর‍্যাজুয়েট.. ওতোটা ও আন্ডার এস্টিমেট করোনা। তুমিই ভুলো মনা! কাল ক্যামেরা না নিয়েই ছবি তুলতে বেরিয়ে গেলে। তোমার জন্যেই তো আমাকে বেরোতে হলো....."

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

বিতান ভাবলো কি ভুলটাই ও করেছে! নয়নতারাকে ছবি তুলতে যাবে বলেছে আর ক্যামেরাটা নেয়নি! এজন্যেই মনে হয় রঞ্জনার ব্যাপারে সব জেনে গেছে। ইতস্তত করে বিতান জিজ্ঞাসা করলো,

-"তুমি আমাকে জানালে না কেন! মানে একটা কল তো করতে পারতে!"

-"নম্বর দিয়েছো! তবুও তো নোট দিয়েছিলাম তোমার কাজেই বেরোচ্ছি বলে..."

বিতান এবার বুঝতে পারলো চিরকুটের মানেটা! নয়নতারা তো শুধু লিখেছিল ও কোনকাজে গেছে জানে। বিতানই ভেবে ভেবে পাহাড় করেছে! রঞ্জনা বাসুর ব্যাপারে ও কিছুই জানেনা। তখন ও নয়নতারা বলে যাচ্ছিল,

-"তুমি তো কিছুই বোঝোনা! কেন যে আশা করি! একমাস হলো আমাদের বিয়ে হয়েছে, লোককে বলতেও লজ্জা করে..." এতো ক্লান্তিতে ও নয়নতারার কথা শুনে বিতানের হাসি পেয়ে গেল। পরাজয় স্বীকার করে বলল,

-"আচ্ছা বেশ, এবার থেকে সব বুঝবো.."

-"সত্যি বলছো!"

-"সমুদ্রকে সাক্ষী রেখে প্রমিস করলাম..."

বিতানের কথাতে আশ্বস্ত হয়ে নয়নতারা ওর কাছে ছুটে এসে ক্যামেরাতে তোলা ছবিগুলো দেখাতে লাগলো।

বিতান মনে মনে ভাবলো একেই তো বলে ভালোরাখা। বিতানের কাছে একটু ভালো হওয়ার জন্যে মেয়েটা এতো দিন ধরে চেষ্টা করছে আর বিতান সেটা দেখেও দেখেনি।

-"আর এই দেখো... এটা স্ট্রিটস্টারের কভার পেজের জন্যে... কন্ট্রাস্টেড থিমে.."

নয়নতারার কথা শুনে বিতান ক্যামেরার স্ক্রিনে ভালো করে নজর দিল।

একই ফ্রেমে এক বাবা সমুদ্র সৈকতে তার ছেলেকে বেলুন কিনে দিচ্ছে। অন্য বাবা নৌকার জাল প্রস্তুত করছে আর ছেলে সাহায্য করছে। সমুদ্র সৈকতে সূর্যাস্তের ছবিটা কভার পেজের জন্যে সত্যিই পারফেক্ট। এযেন দুই ভারতবর্ষ কথা বলছে তাদের চিরন্তন পিতৃত্বের।

এই প্রথমবার বিতানের মনে ভালোবাসার সাথে শ্রদ্ধাও তৈরি হলো বাচ্চামিতে ভরা মেয়েটার প্রতি। মনেহলো মেয়ে মানেই বিশ্বাসঘাতিনী নয়। সত্যিই ওর মা ঝিনুক থেকে মুক্তো খুঁজে এনেছে।

****

অফিসে ফোন করে ছুটিটা বাড়ালো বিতান। নয়নতারার সাথে ঘুরতে হবে না! হানিমুনটা বাকি রেখে মান্দারমনি থেকে কি ফিরে যাওয়া যায়! কুইনভিলা থেকে আজ যখন ওরা সূর্যোদয় দেখতে বেরোলো তখন প্রথম দিনের রিসেপশনিষ্ট গেষ্টহাউজের সামনে ছিলেন। বিতানকে দেখতে পেয়েই বললেন, -"স্যার, সেদিন আপনি মনমোহনার শুটিং- এর

খবর নিচ্ছিলেন না! শুনেছেন, শ্যুটিং বন্ধ হয়ে গেছে। ওই যে তাজপুরের কাছে বডিটা পাওয়া গেছে ওটা ওদের অভিনেত্রীর। সুইসাইড কেস! কয়েকদিন একটু ঝামেলা হতে পারে। তবে আপনাদের ভয় নেই। এনজয় করুন। কোনো সমস্যা হলে আমাদের ফোন করবেন।" বুকের ভিতরটা আরেকবার আলোড়িত হলো বিতানের। মন-মোহনার অভিনেত্রী মানে রঞ্জনা! নয়নতারা বিতানের হাতটা শক্ত করে ধরে বলল, -"কেন যে মানুষ সুইসাইড করে! ভয় লাগে না! আমার তো সমুদ্রের কাছে যেতেই ভয় লাগে।" নয়নতারার স্নিগ্ধ ঘন কালো চোখ দুটো ভুলিয়ে দিল বাদামি চোখের রেশ।

-"দেখি আজ তোমার কত ভয় লাগে!"

বিতান দুষ্টু চোখে বলল।

সমুদ্রের ভিজে বালিতে হাঁটতে হাঁটতে বিতানের মনে হলো প্রভাতি আলো বলছে, ধুয়ে যাক সব পুরোনো ক্ষত, নতুন জীবনে তোমাদের স্বাগত।

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

গল্পটা আম্লিক

উন্মনা মুখার্জী লাহিড়ী

কষ্ট করে ঘাড় ঘোরানোর চেষ্টা করে প্রাপ্তি; পারেনা । কানের নীচ থেকে গলার কাছটা দপদপ করে ওঠে । যন্ত্রনাটা গিলে নিয়ে সে বলে ওঠে – ' ' জল খাব।' ' প্রশস্তি কাছেই ছিল, সে চামচে করে আস্তে আস্তে জল খাইয়ে দেয় প্রাপ্তিকে । আজ তার বড় ও মেজ পিসি এসেছেন । বাইরের ঘর থেকে মেজপিসির গলার স্বর ভেসে আসে – ' ' ওই ফ্যাশন ডিজাইনিংই তোর মেয়ের কাল হল । এখন ফ্যাশনের ঠেলা বোঝ । আমাদের ঘরের আর সব মেয়েরা তো বি. এ., বি. এস. সি. ই পড়েছে, তাতে কী তাদের মান কমে গেছে ? বুঝিনা বাপু । ' ' প্রাপ্তি তার বাবার অসহায় গলা শুনতে পায় – ' ' থামো মেজদি, মেয়েটা শুনতে পাবে । ' ' প্রাপ্তির চোখের কোল ভিজে ওঠে । একটু আগে আধো ঘুম আধো জাগরণে সে শুনতে পেয়েছিল, তার ঘরে বসে বড়পিসি বলছেন –" আরও তো অনেক মেয়ে আছে । ওর মুখেই কেন ছুঁড়ে মারল ?" বড়পিসির না বলা কথাটার মনে মনে সমাপ্তি ঘটায় প্রাপ্তি । আজ থেকে আড়াই মাস মত আগে তার মুখে অ্যাসিড ছুঁড়ে মারে কেউ একজন । দু মাসের ওপর হাসপাতালে যমে- মানুষে লড়াই করে এক সপ্তাহ হল সে বাড়ি এসেছে । আর তারপর থেকে ঝেঁটিয়ে আসছে পাড়া- প্রতিবেশী, আত্মীয়- স্বজন, বন্ধু- বান্ধব – তাকে একবার চাক্ষুষ করার জন্য । এমন চাঁদপানা মুখের এই দশা – খেদোক্তি শোনা যাচ্ছে দর্শনার্থীদের কণ্ঠে । কেউ আবার ভিতরের গল্প শুনতে চায় । জানতে চায়, ছেলেটা কে ? কতদিনের প্রেম ? বাবা- মায়ের নাজেহাল অবস্থা । এর মধ্যে আবার আছে থানা- পুলিশ, কোর্ট- কাছারি ।

আপনজনের হাহুতাশ, তার হতশ্রী চেহারা, প্লাস্টিক সার্জারির মত ব্যয়সাপেক্ষ চিকিৎসা তারা করাতে পারবে কিনা – এসব আর বেশী ভাবায় না প্রাপ্তিকে । এই ক মাসে তার বয়স যেন বেড়ে গেছে দশ বছর ! কাছের মানুষ অচেনা হয়ে গেছে, আবার অনাত্মীয় কেউ বন্ধুর মত পাশে থেকেছে তাদের পরিবারের । তবুও উত্তীয়র এভাবে সরে যাওয়াটা তার ধ্বস্ত মনটাকে কেটে ফালা ফালা করে দেয় । সল্টলেকের এন.আই.এফ.ডি. তে ফ্যাশন ডিজাইনিং প্রথম বর্ষের ছাত্রী প্রাপ্তি । বাবা সি.ই..এস.সি. র কর্মী, মা গৃহবধূ । বোন, প্রশস্তি ক্লাস টেনের ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে । সামনে প্রাপ্তিরও পরীক্ষা ছিল । বন্ধুরা সবাই পরীক্ষা দিল, সে তখন হাসপাতালে । উত্তীয় তাদের ইন্সটিটিউশনেরই প্রাক্তনী । একটা ফ্যাশন শো তে আলাপ তাদের । তারপর শুরু হয় একটা ভালোলাগার, একটা ভালোবাসার সম্পর্ক । যদিও মুখফুটে " ভালোবাসি তোমায় " বলা হয়নি দুজনের কারোরই । ওই অভিশপ্ত দিনটির পর হাসপাতালে একবার মাত্র এসেছিল উত্তীয় । তার দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছিল । হয়ত তার বিকৃত মুখটা দেখে মনে মনে শিউরেও উঠেছিল ! বাড়ি এসে তার ফোনে একটা পুরনো মেসেজ দেখতে পায় প্রাপ্তি – মুম্বাই চলে যাচ্ছে উত্তীয়। আর এখন তো উত্তীয়র মুঠোফোন হয় সর্বদা বন্ধ নয় পরিষেবা সীমার বাইরে ! বারংবার বার্তা পাঠিয়েও কোনো উত্তর পায়নি প্রাপ্তি । হাসপাতালে তার কাছে ফোন ছিলনা । কেমন জিবনাম্রিতের মত সেই দুঃসহ

সময়টা পার হয়েছে সে । উত্তীয়র নির্লিপ্ততা ও মুম্বাই চলে যাওয়ার যন্ত্রনাটা , তার কাছে সালফিউরিক অ্যাসিডে দগ্ধ হওয়ার চেয়েও বেশী বেদনাবহ !

ধীরে ধীরে সেরে উঠছে প্রাপ্তি । কঠোর বাস্তবটাকে সইয়ে নিচ্ছে । মুখে , গলায় দু একটা সার্জারি হয়েছে । ঈশ্বরের অসীম কৃপায় তার চোখ দুটো অক্ষত আছে । সবচেয়ে বেশী পুড়েছিল তার ডান কান ও গলার ডানদিক । সম্পূর্ণ বিস্মৃত হতে চাইলেও , বারেবারেই তার মনের জানালায় উঁকি দিয়ে যায় সেদিনের সন্ধ্যেটা । সন্ধ্যে ঠিক বলা যায়না । ঘড়িতে আটটা- সাড়ে আটটা বাজবে । ক্লাসেরই জরুরী প্রয়োজনে সে বন্ধুদের মেসে গিয়েছিল । ফেরার পথে রাস্তাটা যেন অন্যদিনের থেকে শুনশান মনে হয়েছিল তার । মেট্রো স্টেশন থেকে একটু দূরে তাদের বাড়ি । স্ট্যান্ডে রিকশা দেখতে না পেয়ে , সে হেঁটেই বাড়ি ফিরছিল । চোখ মোবাইলে নিমগ্ন । এরকম আগেও কতবার বাড়ি এসেছে । ঘোষালদের আমবাগান পেরিয়ে যেই টার্ন নিয়েছে , কী যেন একটা তার ডানদিক ঘেঁষে ধেয়ে এল । প্রতিবর্ত প্রেরণায় সে বাঁদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় । তৎক্ষণাৎ তার মুখের ডানদিকে এসে লাগে জ্বালা ধরানো জলীয় অনুভূতি । হৃৎপিণ্ডটা ধরে যেন সবলে দুদিকে টান দিচ্ছে কেউ , আগুনের আঁচে ছেয়ে যাচ্ছে গোটা মুখ । কাটা পাঁঠার মত ছটফট করতে থাকে প্রাপ্তি । আর কিছু মনে নেই ! বছর ঊনিশের মেয়েটির আকাশ জোড়া স্বপ্ন নিমেষে ধুলিস্যাৎ হয়ে গিয়েছিল । শারীরিক যন্ত্রনাকে ছাপিয়ে সে ট্রমার মধ্যে চলে যায় । তারপর দুঃস্বপ্নের প্রাথমিক পর্যায়টা পেরিয়ে গেলে বাড়ির লোকজন ,পুলিশ অফিসার , এমনকী হাসপাতালের স্টাফদের অনেকেই তাকে জিজ্ঞাসা করেছে –" ছেলেটা কে ? কী নাম ? " এই প্রশ্ন তো সে নিজেও নিজেকে করে চলেছে প্রতিনিয়ত । না, সেদিন সে কাউকে খেয়াল করেনি । একটা হাত সাঁ করে চলে আসছে তার দিকে , আর একটা আবছা পুরুষালী অবয়ব ! মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে একজনেরই নাম – রাকেশ । অটোস্ট্যান্ডের ওখানে পৈত্রিক মুদি দোকানে বসে । এখন অবশ্য তা কাচে ঘেরা এ.সি. গ্রসারি স্টোর্সে উন্নীত হয়েছে । বড্ড বিরক্ত করত তাকে, রাকেশ । মোবাইল নম্বরটাও যেন কীভাবে জোগাড় করেছিল । প্রায়ই তার সাথে ঘুরতে যেতে , সিনেমা যেতে বলত । মোটেও পাত্তা দেয়নি প্রাপ্তি । ছোটোখাটো বিষয় ভেবে এড়িয়ে গেছে । প্রাপ্তি তখন উত্তীয়তে বুঁদ । একদিন মনেহয় চায়ের দোকানের কাছে , বাইক দাঁড় করিয়ে রাকেশ বলেছিল – " আমার প্রস্তাব নাকচ করে তুমি খুব বড় ভুল করলে । একদিন তোমায় পস্তাতে হবে । " তবে সে তো মাস ছয় আগের কথা । ইদানীং আর রাকেশকে রাস্তা- ঘাটে দেখেনি প্রাপ্তি । বড় বিচিত্র মানুষের মন, বড় বিকৃত ! পুলিশকে রাকেশের নামটাই বলেছিল দিশাহীন প্রাপ্তি ।

বছরখানেক অতিক্রান্ত । কলেজ থেকে ফিরছে প্রাপ্তি । মোবাইল স্ক্রিনে জ্বলজ্বল করছে মোহনার নাম । মোহনাকে সে তার বাড়ির ঠিকানা মেসেজ করে দেয় । মোহনা তারই মত অ্যাসিড আক্রান্ত , বাড়ি ফলতা । মনের জোর বাড়াতে হবে মোহনার । ফুরফুরে মেজাজে বাড়ি ঢোকে প্রাপ্তি । এই মনের জোরটুকু প্রাপ্তির বহু কষ্টার্জিত ।হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার পর প্রথমে খুবই ভেঙে পড়েছিল প্রাপ্তি । ঘরের আয়না পর্যন্ত ওড়না দিয়ে ঢেকে রেখেছিল । প্রায় এক বছর পর সে অনেকটা সুস্থ হয়ে ওঠে । সলিড খাবার খেতে শুরু করে । তবে ডান কানের শ্রবনশক্তি খুব ক্ষীণ হয়ে গেছে । মুখের ডানপাশটা দগ্ধে গেলেও , চুল দিয়ে ঢেকে রাখলে খুব একটা বোঝা যায়না । তার গলায় , কাঁধে দগদগে ঘা । এখন সে সুন্দর

সুন্দর স্কার্ফ দিয়ে মুখের একাংশ আড়াল করে রাখে । না , ফ্যাশন ডিজাইনিং এর পুরনো পথে সে আর হাঁটেনি । সাজগোজ- ফ্যাশনের জগৎ থেকে বহু দূরে চলে গেছে তার মন । একটা সময় সে তীব্র অবসাদের কবলে পড়ে যাচ্ছিল , যখন শুনল রাকেশ জামিন পেয়ে গেছে । রাকেশের বন্ধু ও দোকানের কর্মচারীরা সাক্ষ্য দিয়েছিল- রাকেশ সেদিন সারা সন্ধ্যে দোকানেই ছিল । শুধু পান গুমটির হরি সিং এজাহার দিয়েছিল – রাকেশ তার দোকানের পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিল সেসময় । প্রাপ্তি নিজেই মজবুত সাক্ষ্য দিতে অক্ষম হয়েছে , তো অন্যকে কী বলবে ! এত নড়বড়ে সাক্ষ্য প্রমাণের দরুণ , শ্রীঘরে বেশীদিন থাকতে হয়নি রাকেশকে । তবে তখনও তাদের বাড়িতে হুমকি টেলিফোন আসা বজায় ছিল । মামলার নিষ্পত্তি হয়নি । এমনই এক সময় বোন প্রশস্তিকে নিয়ে সে হাজির হয়েছিল কলেজস্ট্রিট – বইপাড়ায় । দোকানির জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে কিনে এনেছিল খান কতক আইনের বই । পড়াশোনা করতে শুরু করেছিল – তার সাথে ঘটে যাওয়া অন্যায়ের আইনি মারপ্যাঁচ সম্বন্ধে । নিসঙ্গ জীবনে মোটা মোটা বইগুলি তার সাথী হয়ে উঠেছিল- শান্তি দিয়েছিল , স্বস্তি দিয়েছিল । তাই পরবর্তী একাডেমিক ইয়ারে সে ভর্তি হয়েছিল হাজরার নাম করা ল' কলেজে । এটা তার অন্তিম বর্ষ । পাশাপাশি সে যুক্ত হয়েছে " পথ" নামে একটি এন.জি.ও. র সাথে । সেখানে তার মত অ্যাসিড আক্রান্ত মেয়ে আছে ছয় সাত জন । নানা কারণে বাড়িতে তাদের আর ঠাঁই হয়নি । হতদরিদ্র পরিবারের মেয়ে সাবিনা গর্জে উঠেছিল – " একদিন আমি ওই কুকুরটার মুখেও অ্যাসিড ঢেলে দেব । বুঝবে জীবন্ত দগ্ধ হওয়ার কষ্ট । " আবার " পথে" র নন্দিতা , তার ছবির অনিন্দ্যসুন্দর মুখাবয়বের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে মাঝেসাঝেই ! এইসব সাবিনা , রানী , পুষ্পা , নন্দিতা , শীতলদের মনে আত্মবিশ্বাস যোগায়, চিকিৎসায় সাহায্য করে , সরকারী অনুদানের ব্যাপারে তদ্বির করে এবং সর্বোপরি আইনি লড়াইয়ে পাশে থাকে প্রাপ্তি । নিজের ব্যক্তিগত বেদনা অনেক কম মনে হয় এদের সান্নিধ্যে ! আগে রাস্তায় মুখ নীচু করে হাঁটত প্রাপ্তি , লোকের কৌতূহলী দৃষ্টি এড়াতে পারতপক্ষে বাড়ি থেকে বেড়োত না । এখন সে সাবলীল , স্বচ্ছন্দ্য – বাহ্যিক রূপ নিয়ে । মুখটা না ঢেকেও বাইরে যেতে পারে সে । তবে অন্যের চোখে যখন সে ছায়া দেখে তার কুরূপতার – পীড়া দেয় তাকে । তাই এই আড়াল । সেসময় তাকে নিয়ে যখন টিভিতে , কাগজে টুকরো খবর বেড়োত – সে কুঁকড়ে থাকত অপমানে । আর এই তো সেদিন হাসিমুখে টিভিতে নিজের অপরাজিত মনোভাবের কাহিনী শুনিয়ে এল – প্রাপ্তি চৌধুরী ।

এন.জি.ও. র বাচ্ছাদের পিয়ানোয় " উই শ্যাল ওভারকাম" বাজিয়ে শোনাচ্ছে সমুদ্র । মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছে প্রাপ্তি । সমুদ্র, " পথ" এর বহুবছরের সাথী । স্কুলে পড়ার সময় অ্যাকসিডেন্টে দুচোখ নষ্ট হয়ে যায় সমুদ্রর । পরবর্তী জীবনে ব্রেইল পদ্ধতিতে পড়াশোনা করে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছে সে। সমুদ্র এখন পারিবারিক ব্যবসার সাথে যুক্ত । আর সুরের সাধনা তার ধ্যান- জ্ঞান । খুব ভালো মাউথ অর্গানও বাজায় সে । প্রাপ্তি যখন প্রথম এই সংস্থার কাজের সাথে যুক্ত হয় , সমুদ্র তাকে সহজ- স্বাভাবিক হতে প্রভূত সাহায্য করেছিল । সমুদ্রের সাহচর্যেই সে বুঝেছে – এই ঘটনায় তার জীবনে দাঁড়ি পরে যায়নি, বরং শুরু হল নতুন জীবন, নতুন লড়াই , নবরূপে স্বপ্ন দেখা । সর্বপ্রথম নিজেকে ভালোবাসতে হবে – " পথ" ই পথপ্রদর্শক হয় প্রাপ্তির জীবনে । প্রাপ্তির আইনজীবী হওয়ার পদক্ষেপ, তার মা- বাবা সহ সকল শুভাকাঙ্ক্ষীদের উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়েছে - তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে । প্রাপ্তি তার সকল

সিদ্ধান্তে বাবা-মা ও প্রাণাধিক প্রিয় বোনকে পাশে পেয়েছে । এও তার পরম প্রাপ্তি । সৌভাগ্যবশত প্রাপ্তির মুখের বহুলাংশই অক্ষত আছে । আজও অনেকের মুগ্ধ চোখ ছুঁয়ে যায় তাকে । ল' কলেজের সিনিয়র অর্ণব দা তাকে কত কিছু বোঝাতে চেয়েছে ! অর্ণব দা তাকে জীবনসঙ্গিনী করতে চায় – সমস্ত সামাজিক নিষেধাজ্ঞা ভেঙে । প্রাপ্তি রাজী হয়নি । নিজের পায়ের তলার মাটিটা শক্ত হোক আগে, কারোর সাময়িক করুণার পাত্রী হতে চায়না সে । কিন্তু সব হিসাব গোলমাল হয়ে গেল সমুদ্রর সুরের মূর্ছনায়, তার জ্যোতিহীন চোখে । আরও বেশ কিছু বছর পর হয়ত একসাথে পথ চলবে – প্রাপ্তি ও সমুদ্র , অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে তারা । সমুদ্র তো মাঝেমাঝেই ঠাট্টা করে বলে ওঠে – "তোমার অর্ণবদাকে প্রত্যাখ্যান করে , আমার মত একজন অন্ধ মানুষের মধ্যে তুমি যে কী দেখলে ..." । প্রাপ্তি গম্ভীর হয়ে উত্তর দেয় – "তোমার আমার আপাত অপূর্ণতাই আমাদের একদিন সম্পূর্ণ করে তুলবে । আমরা দুজনে মিলে হব একটা গোটা মানুষ , তুমি দেখো ।" এক সমুদ্র ভালোবাসা প্রাপ্তি হয় দুজনের ।

প্রাপ্তির জয়ের মুকুটে আরও একটা রঙিন পালক যোগ হল আজ । মোহনার ওপর হামলাকারীরা দোষী সাব্যস্ত হয়েছে । যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে প্রধান অভিযুক্ত । না, প্রাপ্তি কোনোদিন নিজের সাথে হয়ে যাওয়া অপরাধের সাজা দিতে পারেনি রাকেশ সিং কে । প্রমাণাভাবে বেকসুর খালাস পেয়েছে সে । আজ দুই ছেলে মেয়ে নিয়ে সুখী সংসার তার । শুধু প্রাপ্তির জীবনটা অন্যরকম হয়ে গেল । আনমনে যখন তার গলার, গালের তলতলে চামড়ায় হাত পড়ে যায় , তখন খুব রাগ হয় প্রাপ্তির । সে তো কোনও দোষ করেনি । তবে কেন এই হিংসার বলি সে ! কারোর সাথে মতের অমিল হল , প্রেম প্রস্তাবে কেউ সাড়া দিল না – অমনই নষ্ট করে দাও তার স্বাভাবিক লালিত্য , দলা পাকানো মাংস খণ্ডে পরিণত হোক একদা সুমুখশ্রী – কী জান্তব হিংসা , কী বিজাতীয় উল্লাস ! এই মানসিকতার কী কোনোদিন পরিবর্তন হবে না? – স্বগতোক্তি করে প্রাপ্তি । খোলাবাজারে নির্বিচারে অ্যাসিড বিক্রি বন্ধের ওপর কাজ করছে এখন প্রাপ্তি । অ্যাসিড আক্রান্তরা শারীরিক -মানসিক যন্ত্রনায় নিয়ত পুড়তে থাকে , অনেকক্ষেত্রে চরিত্র হননও করা হয় , অনেকের স্থান হয়না বাড়িতে , কেউ কেউ মানিয়ে নিতে না পেরে আত্মহত্যা করে বসে , দীর্ঘমেয়াদী-ব্যয়সাপেক্ষ চিকিৎসা বেশীরভাগের কাছেই সহজলভ্য নয় আর দু-একজন তো এই হিসাবের বাইরে – প্রাণঘাতী আক্রমনে প্রথমেই চলে যায় না ফেরার দেশে । এই সব চিরতরে পরিবারের বোঝা হয়ে যাওয়া মেয়েদের স্বনির্ভর করার কাজে ব্রতী প্রাপ্তি এবং "পথ"। এখনও অনেক পথ চলা বাকী প্রাপ্তির, প্রাপ্তিদের ।

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

নতুন ঠিকানা

প্রিয়া ভট্টাচার্য্য

ভিড়ে ঠাসা বাসে ভীষণরকম চেঁচামেচিতে নড়ে উঠল স্নিগ্ধা! কিন্তু চিৎকারটা কিসের হচ্ছে? মেনলি হট্টগোলটা করছে কন্ডাক্টর! চিৎকার করে বলছে "টাকাপয়সা নাই কিন্তু বাসে চাপার শখ হয়েছে? পয়সা বের কর নাহলে এখানেই নামিয়ে দেব!" স্নিগ্ধা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল, যাকে উদ্দেশ্য করে কথা গুলো বলা হচ্ছে সে একটি বছর সতেরোর মেয়ে! কোলে বছর দুয়েকের একটি বাচ্ছা! মেয়েটিকে দেখে মায়া হল স্নিগ্ধার, কন্ডাক্টরকে ডেকে বলল, "ঠিক আছে ওর ভাড়াটা আমি দিয়ে দেব ! আপনার তো ভাড়া নিয়ে কাজ, কে দিচ্ছে সেটা নিয়ে না!" পাশ থেকে এক ভদ্রলোক বলে উঠলেন –" বেশি খচখচ না করে ভাড়াটা নিয়ে নে"। কন্ডাক্টর মেয়েটিকে বলল – "যাবি কোথায়?" মেয়েটি একবার স্নিগ্ধা আরেকবার কন্ডাক্টরের দিকে তাকিয়ে মাথা নীচু করে বলল – "জানিনা"! স্নিগ্ধা বুঝতে পারে মেয়েটি বিপদে আছে! "ঠিক আছে, বাসটা তো নৈহাটি থামবে আপনি ওখানেরই টিকিট করে দিন।" মেয়েটিকে নিজের কাছে ডেকে ভালো ভাবে পরখ করে নিয়ে শান্ত গলায় জানতে চাই তার কথা! "বাচ্চাটা কার?" স্নিগ্ধার প্রশ্ন শুনে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে মেয়েটি, "আমার গো দিদিমণি, সোয়ামিটা ভালো লয় গো! প্রতিদিন টাকা চাই আর মারে। আজ আমার মেয়েটাকেও মেরেচে ! তাই পালিয়ে এয়েচি, আর থাকবনি ওর কাছে!" মেয়েটির কথাগুলো কানে বিঁধে ওঠে স্নিগ্ধার! স্নিগ্ধা কে যখন প্রথম দেখতে গিয়েছিল ওর শাশুড়ি, বিমলা দেবী স্নিগ্ধার বাবাকে বলেছিলেন মেয়ে লেখাপড়া জানে, মূর্খ নয় এই অনেক! আমরা হলাম বনেদীবাড়ির বৌ, বাইরে চাকরির কোনও প্রয়োজন নেই! স্নিগ্ধার বাবার আর সেদিন বলা হয়নি তার মেয়ে নার্সিং ট্রেনিং নিয়েছে, আসলে এত বড় বাড়িতে বিয়ে হচ্ছে সেকি কম বড় কথা! তারপর ছেলেটাকে মানুষ করতে হবে তাই একটা বোঝার দায়মুক্ত হয়েছিল বিয়ে দিয়ে! স্নিগ্ধা বিশ্বাস, শাশুড়ির দেওয়া গয়না পড়ে নতুন বৌ হয়ে এসেছিল প্রায় তেরো বছর আগে ! লোকজন এলেই শাশুড়ির ডাকে এসে নিজেকে কেবলমাত্র শিক্ষিতা জাহির করতে নিজের ডিগ্রীর জানান দিতে হত সকলকে!

আসলে তার শাশুড়ির কাছে নার্স মানেই হাজার অজানা জাতির লোকের সংস্পর্শে যাওয়া আর মল মূত্র পরিস্কার করা! স্নিগ্ধা অনেকবার এই কথাগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে, বোঝাতে চেয়েছে নার্সদের গুরুত্ব, লাভ হয়নি অশান্তি বেড়েছিল, এমনকি নিজের স্বামী রজতও বিরূপ হয়েছিল!

রাগে অভিমানে চুপ করে গেছিল স্নিগ্ধা! সেদিন যদি সাহস করে বেরিয়ে আসত স্নিগ্ধা, তাহলে আজ সমাজটা অন্যরকম হত! রান্নাঘরে নিজেকে বন্দি করে, আত্মসুখ বিসর্জন দিয়ে সংসারে মজেছিল স্নিগ্ধা! প্রথম কন্যা সন্তান একটু বড় হতেই আবার সুসংবাদ, এবার পুত্র! শাশুড়ি মায়ের কাঙ্খিত বংশধর! ছেলে মেয়ে, সংসারের দায়িত্ব, সন্তানদের পড়াশোনা এই করেই এতগুলো বছর কেটে গেছে! ছেলে মেয়ে দুটিই পড়াশোনায় বেশ ভালো! হঠাৎ তার বারো বছরের মেয়ে স্নিগ্ধা কে বলে, "মা আমাদের স্কুলের সব মা চাকরি করে, ওদের সব বায়না মায়েরাই পূরণ করে! তুমি একটা চাকরি করলে কত ভালো হত, বাবাকে কিছু চাইলেই বাবা পরে দেব, পরে দেব বলে! তুমি একটা চাকরি করো না মা! প্লিজ! " স্নিগ্ধার অপূর্ণ ইচ্ছা আবার নাড়া দিয়ে উঠেছিল! শ্বশুর শাশুড়ি স্বামীর সামনে একদিন সাহস করে কথাটা বলেই ফেলল স্নিগ্ধা! সে চাকরিতে জয়েন্ট করতে চাই একজন নার্স হিসেবে, স্নিগ্ধার ভগ্নিপতি সরকারি হসপিটালের ডাক্তার সেই ব্যবস্থা করে দেবে সব! ছেলেমেয়েরা বড়ো হচ্ছে, ওদের খরচ, সংসারের খরচ, তাছাড়া দেশের মানুষের সেবা করা কোনো অপরাধ নয়! রজত ও জানে একটা দোকানের উপর নির্ভর করে সংসার চালানো এখন কতটা কঠিন! আগের বনেদিয়ানা আর এখন তাদের নেই! বাড়িটাও জরাজীর্ণ, ফাটল ধরেছে, সংসার টানতেও বেগ পেতে হচ্ছে তাই সে আর কোনো আপত্তি করেনি সেদিন, তাছাড়া সময়ের সাথে মানসিকতার ও অনেক পরিবর্তন এসেছে, এখন প্রায় সব ছোটো বড়ো পরিবারের বৌ মেয়েরা বাইরে চাকরি করছে! কিন্তু শত বুঝিয়েও কোনো কাজই হয়নি, স্নিগ্ধার শ্বশুর শাশুড়ি কিছুতেই ওই দশজাতের ছোঁয়া নিয়ে ঘরে ঢুকতে দেবে না তাকে!

সত্য হয়তো কখনও লুকানো যায় না, শ্বশুর শাশুড়ি কে না জানিয়েই হসপিটালে জয়েন্ট করে স্নিগ্ধা! বাড়িতে এসে পৌঁছায় তার জয়েনিং লেটার! শ্বশুর মশাই সন্ধ্যেবেলা সবার সামনে পড়ে চিঠিটা! সেদিন স্নিগ্ধার থেকেও বেশি

খুশি হয়েছিল তার ছেলে মেয়ে! মা চাকরি করবে এটা যেন চরম আনন্দের তাদের কাছে! কিন্তু শ্বশুর শাশুড়ি তার হাতে খাবে না, অতঃপর আলাদা হল তাদের হাঁড়ি! স্নিগ্ধা কে দেখলেই কেমন একটা অচ্ছুত ভাব নিয়ে নিজের ঘরে চলে যায় তার শাশুড়ি মা! স্নিগ্ধার তাদের ঘরে প্রবেশ নিষিদ্ধ! চাকরি পেয়ে প্রথম বেতন পেয়ে বাচ্চাদের জন্য জামা, খেলনা, ফল্ মিষ্টি নিয়ে এসেছিল এমনকি তার বোন আর ভগ্নিপতিকে একদিন নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছে স্নিগ্ধা, শুধু শাশুড়ি শ্বশুরই তার কোনো জিনিসে হাত অবধি দেয়নি! কষ্ট হয়েছিল স্নিগ্ধার, তাদের নিজের বাবা মা' ই ভাবে স্নিগ্ধা, কখনো অশ্রদ্ধা করেনি !

" দিদিমণি" মেয়েটির ডাকে সম্বিৎ ফিরল স্নিগ্ধার, কখন যে নিজের কাহিনীতে বিভোর হয়ে গেছিল! নৈহাটি এসে গেছে বাসটা, মেয়েদের যে এখনকার যুগে স্বাবলম্বী হওয়া কত প্রয়োজন তা এই মেয়েটিকে দেখেও বুঝলো, নৈহাটি নেমে ওদের একটা হোটেল এ নিয়ে গিয়ে পেট ভরে খাওয়াল আর বাচ্চাটার জন্য দুধ কিনে ফোন করল ওর বোনকে! স্নিগ্ধার বোন পাপিয়া রায়, একটা এনজিও চালায়, মেয়েদের স্বনির্ভর হওয়ার পাঠ দেয়, হাতের বিভিন্ন কাজ করে আয় করতে শেখায়, সমাজের পীড়িত, অত্যাচারিত মেয়েগুলির জন্য একটু ভালোথাকার ব্যবস্থা করে আর কি! পাপিয়াকে ফোন করে সবটা বলে পাপিয়ার কথা মতো নিয়ে গেল তাদের এনজিওতে। " আজ থেকে এটাই তোর নতুন ঠিকানা রে লক্ষী, তোর মেয়েকে মানুষ করতে হবে তোকে", স্নিগ্ধার কথাগুলো লক্ষী যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না, চোখের জল পড়ছিল অঝোরে, স্নিগ্ধাকে প্রণাম করতে যেতেই আটকালো স্নিগ্ধা, বুকে টেনে নিয়ে স্নেহের আলিঙ্গন করে, বাচ্চাটার মাথায় হাত রেখে বিদায় নিল সেখান থেকে!

" এই রে আজ বড্ড দেরি হয়ে গেল", মনে মনে ভাবে স্নিগ্ধা! লক্ষীকে নিয়ে আসা ক্যাবটাতেই বাড়ি ফিরছে সে! ক্যাবের টাকা মিটিয়ে তাড়াতাড়ি পায়ে সিঁড়ি উঠছে, ভিতরে ঢুকে দেখে শাশুড়ি মা মেঝেতে শুয়ে, রজত আর বাচ্চারা হাওয়া করছে আর শ্বশুর মশাই কারোর সাথে ফোনে ব্যস্ত! " কি হয়েছে মায়ের? এরকম গোঙাচ্ছে কেন? দেখে তো সেরিব্রাল এ্যাটাক মনে হচ্ছে! তাড়াতাড়ি অ্যাম্বুলেন্স ডাকো! " স্নিগ্ধার মুখে অ্যাম্বুলেন্স -এর নাম শুনে ঝাঁঝিয়ে ওঠে তার শ্বশুর, হসপিটালে ছত্রিশ জাতের সাথে থাকবে না তার স্ত্রী, " বাড়ির

ডাক্তারকে খবর দিয়েছি এসে যাবে! ওসব এ্যাটাক নয়, উপোস করে মাথা ঘুরে গেছে একটু"। শ্বশুরের এই কথাগুলোয় কর্ণপাত না করে অ্যাম্বুলেন্স ডাকে সে, হসপিটালে ডাক্তার জানাই সেরিব্রাল এ্যাটাক, আরেকটু পরে আসলে আর কিছু করার থাকতো না! কিছুদিন হসপিটালে থাকার পর বাড়ি ফিরে আসে বিমলাদেবী, স্নিগ্ধার শাশুড়ি মা! এখন আর স্নিগ্ধাকে তাদের ঘরে ঢুকতে নিষেধাজ্ঞা নেই, রান্নাটাও বৌমার হাতেরই খান, ডাক্তার বেশী তেলমশলা বারণ করেছে! আসলে হসপিটালে থাকার সময় একটা নার্স অনেক যত্ন সেবা শশ্রুষা করে তাকে আবার সুস্থ হতে সাহস জুগিয়েছে, সেটা স্নিগ্ধা বিশ্বাস! কত নার্স, ডাক্তার তার খবর নিতে আসত ! কত রোগী তার মতো, একেক নার্স, ডাক্তার আসছে এক একবার চেকাপ করতে! আজ আর ছোঁয়াছুঁয়ির ভয় নেই, যেখানে মানুষ পুনর্জীবন লাভ করে সেটা তো মন্দির মানুষের কাছে! "বৌমা তোমার হসপিটালটা বাড়ি থেকে অনেক দূরে হচ্ছে, তাই রজতের বাবাকে বলছিলাম এই বাড়িটা বেচে দিয়ে তোমার হসপিটালের কাছাকাছি একটা বাড়ি কিনব! তোমার মতামতটা শুনতে চাইছিলাম।"

অবাক স্নিগ্ধা. . . . . .

কিচ্ছু বলতে পারল না সে . . . . . .

সবার অজান্তেই চোখের কোণে জল জমে এল. . . . . .

সূর্যশেখর ও ডাইনিবুড়ি

শ্রীমন্ত দে

বিলাসপুরের রাজকুমার সূর্যশেখর ইচ্ছা রাজ্য ঘুরে দেখার। কিন্তু মহারাজ তার ইচ্ছায় সিলমোহর দিতে নারাজ। মহারানীও তার এই ইচ্ছার কথা শুনে আঁৎকে ওঠেন। তাঁরা চান না তাদের একমাত্র সন্তান রাজ্য ভ্রমণে যাক। কারণ মহারাজের অবর্তমানে তাকেই তো রাজ্যভার গ্রহণ করতে হবে। মহারাজ এবং মহারানীর অনুমোদন না পেয়ে রাজকুমার বিমর্ষ হয়ে পড়ে। এরপর সে এর কারণ খুঁজতে থাকে। কেন মহারাজ এবং মহারানী তাকে রাজ্য পরিদর্শনে যেতে দিতে চান না। একদিন মনমরা রাজকুমার অন্ধকার ঘরে একলা বসে আছে। ঘরের সমস্ত প্রদীপ নেভানো। এমন সময় বিদূষক এসে বলল- কি রাজকুমার! এভাবে একলা বসে আছেন যে,প্রদীপ জ্বালানোর বুঝি কেউ নেই? দাঁড়ান আমি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিচ্ছি।

প্রদীপ জ্বালাতেই প্রদীপের শিখায় ধরা পরল রাজকুমারের বিমর্ষ মুখখানা।

- কি রাজকুমার আপনাকে এমন বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন?

- আপনি তো সবই জানেন,শুধু আপনি কেন এই রাজ্যের সকলেই জানে আমার বিমর্ষ হবার কারন। তাহলে এমন প্রশ্নের কি কোনো প্রয়োজন আছে? কথাটা শুনে বিদূষকের সদাহাস্য মুখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

- আমি সব জানি রাজকুমার। শুধু আপনার মন ভালো করার জন্য. . .

- প্রয়োজন নেই,আপনি এখন আসুন।

- কিন্তু মহারাজ এবং মহারানীর অনুমোদন না দেবার কারণ জানবেন না!

- কারণ!বলুন আমাকে রাজ্য পরিদর্শনের না পাঠানোর কি কারণ থাকতে পারে।

- সেটা বলার জন্যই তো আমি এসেছি রাজকুমার।

- আর হেঁয়ালি না করে কারণটা তাড়াতাড়ি বলুন।

- শুনুন রাজকুমার,আমি এখন আপনাকে যা বলবো তা কাকপক্ষীতেও যেন জানতে না পারে। যদি কথাটা জানাজানি হয়,তাহলে মহারাজ আমার গর্দান নেবেন।

- আপনি নিশ্চিন্তে বলতে পারেন।কাকপক্ষীতেও জানতে পারবে না আমাদের কথোপকথনের কথা।

এরপর বিদূষক ঘরের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করে রাজকুমারকে শোনাতে লাগল অত্যন্ত সন্তর্পনে লুকিয়ে রাখা এক রোমহর্ষক সত্যি কাহিনী-

বিলাসপুর রাজ্যে বসবাসকারী প্রজারা অত্যন্ত সুখে এবং আমোদ-প্রমোদে কালাতিপাত করে আসছে। এখানে কোনদিনই দুঃখের লেশমাত্রও ছিল না।কিন্তু হঠাৎ করে রাজ্যে এক বিপর্যয় দেখা দেয়। রাজ্যের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে যে প্রকাণ্ড জঙ্গল আছে,সেই জঙ্গলে যারা যেতে থাকে তারা আর ফেরৎ আসে না। প্রজারা অত্যন্ত কাতরভাবে মহারাজের কাছে আবেদন জানায় যে,নিখোঁজদের তিনি যেন ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেন। প্রজাবৎসল মহারাজ প্রজাদের কথা ভেবে বিশাল সৈন্যবাহিনী পাঠান ওই জঙ্গলে। কিন্তু সেই সৈন্যবাহিনীও আর ফিরে আসে না। দুশ্চিন্তা ক্রমশ বাড়তে থাকে।তিনি ভেবে পান না কী করবেন। এমন সময় চন্দ্রশেখর ও নক্ষত্রশেখর দুই রাজকুমার এগিয়ে আসেন মহারাজকে সাহায্য করতে।

- এই দুই রাজকুমার কোন দেশের ছিলেন?
- এই দুই রাজকুমার এদেশেরই ছিলেন।
- এদেশের!মানে?
- এই বিলাসপুরের।
- তার মানে?
- একথা আপনার অজ্ঞাত যে,আপনার দুজন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিল।
- আমার দুজন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিল?
- হ্যাঁ রাজকুমার ছিল, কিন্তু এখন আর নেই।
- তাহলে কোথায় তারা?
- আপনি মন দিয়ে শুনতে থাকুন,আপনার সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন।

কিন্তু মহারাজ এবং মহারানী রাজকুমারদের ওই বিপদের মধ্যে পাঠাতে রাজি ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত রাজকুমারদের জেদের কাছে তাঁরা নতি স্বীকার করেন এবং ওই জঙ্গলে যাওয়ার অনুমতি দেন। কিন্তু শর্ত রাখেন বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে তাদের যেতে হবে। মহারাজের শর্ত অনুযায়ী এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে তাঁরা দুজনে ওই জঙ্গলে যান নিখোঁজদের ফিরিয়ে আনার জন্য। এরপর সৈন্যবাহিনী সহ তাঁরা ও আর ফিরে আসেননি। মহারাজ অনেক চেষ্টা করেও তাঁদের কোনো হদিস পাননি।

- কি বলছেন আপনি!এসব সত্যি ঘটনা?
- হ্যাঁ রাজকুমার!এর একবর্ণও মিথ্যে নয়। যদি কথাগুলো সত্যি না হবে,তাহলে মহারাজ এবং মহারানী কেন আপনাকে বাধা দেবেন।
- ওনারা যতই বাধা দিন না কেন আমি কিন্তু যাবই। আমাকে যেতেই হবে আর জানতে হবে আসল রহস্যটা কি। আমাকে জানতে হবে ওই মানুষগুলোর সাথে,সৈন্যদলের সাথে এবং আমার দাদার সাথে কি হয়েছে। কে বা কারা এসব করছে।
- মহারাজ এবং মহারানী তো আপনাকে যাবার অনুমতি দেবেন না।
- আমি অনুমতি চাইলে তো দেবেন।
- মানে!
- মানে,আমি আজ রাতের অন্ধকারেই যাব সেখানে কাউকে কিছু না জানিয়ে।
- আপনি যদি বিপদে পড়েন,আর ফিরে না আসেন!
- এসব কথা জানার পর হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা কি শোভা পায় একজন রাজকুমারের? আমি বিপদকে ভয় পেয়ে যদি নিজেই মহলে অবস্থান করি,তাহলে প্রজাদের কি করে রক্ষা করব? বিদূষকের হাজার বাধা উপেক্ষা করে সেদিন রাতেই রাজকুমার সূর্যশেখর কাউকে কিছু না জানিয়ে রণসাজে সজ্জিত হয়ে নির্গত হল উত্তর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত জঙ্গলের উদ্দেশ্যে। রাজকুমার তার প্রিয় ঘোড়ার পিঠে চড়ে যেতে থাকলো অন্ধকার ভেদ করে। একসময় গিয়ে পৌঁছালো উত্তর পশ্চিমদিকের জঙ্গলে। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যে সে কোনো কিছু স্থির করতে না পেরে সকালের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। এক সময় সকাল হলো। সে দেখল কি সুন্দর বনের শোভা। চারিদিকে কত বিচিত্র গাছ, বিচিত্র ফুল,বিচিত্র ফল,আর নানা রকমের পশুপাখি।এসব দেখে তার হৃদয় ভরে গেল। সে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো এত সৌন্দর্যের মধ্যে এই ভয়ঙ্করতা আসে কি করে!এরপর সে বিজয়কে নিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করতে চাইলেও বিজয় প্রবেশ করতে চাইল না।

সে বারবার পিছিয়ে আসতে লাগল। রাজকুমার বুঝতে পারল এই অবলা প্রাণীটি বিপদের গন্ধ পেয়েছে,তাই জঙ্গলে প্রবেশ করতে চাইছে না। সে বাধ্য হয়ে ঘোড়াটাকে জঙ্গলের বাইরে রেখে একাই পায়ে হেঁটে জঙ্গলে প্রবেশ করল। জঙ্গলে প্রবেশ করতেই হঠাৎ একটা দমকা বাতাস সারা বনটাকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। সাথে সাথে কেঁপে উঠল রাজকুমারের মন। কিন্তু হেরে যাবার পাত্র তো সে নয়,তাই সাহস নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল সামনের দিকে। এত বড় জঙ্গলে সারাদিন ঘোরাঘুরি করেও সে কোনো কূল-কিনারা করতে পারল না। সকাল গড়িয়ে দুপুর হল,দুপুর গড়িয়ে বিকেল এবং বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। রাজকুমার কি করবে ঠিক করতে পারল না। হঠাৎ সে দূরে আলোর রেখা দেখতে পেয়ে এগিয়ে চলল সেই দিকে।কাছে গিয়ে দেখতে পেল একটা ছোট্ট গ্রাম। এই গ্রামের কথা রাজ্যের কারও জানা নেই। জানবেই বা কি করে,কেউ তো এই জঙ্গলের ধারে কাছেও আসে না। রাজকুমার আরও কাছে যেতেই কয়েকজন গ্রামবাসী তাকে বন্দী করে গ্রামে নিয়ে গেল গ্রামের ভিতরে। সেখানে রাজকুমারের বিচার সভা বসল।যখন গ্রামবাসীরা জানতে পারল যে,এই ব্যক্তি এই রাজ্যের রাজকুমার,তখন তারা তাকে মুক্ত করে যথাসাধ্য আদর আপ্যায়ন করল। রাজকুমার তাদের বলে কেন সে এই জঙ্গলে এসেছে।কথাটা শুনে গ্রামবাসীরা ভয়ে আঁৎকে ওঠে। কারণ গ্রামবাসীরা চায়না রাজকুমার বিপদের মধ্যে যাক। রাজকুমারের অনুরোধে গ্রামের সর্দার প্রকৃত ঘটনার রহস্য উদঘাটন করে বলে- এই জঙ্গলের শেষ প্রান্তে এক ডাইনিবুড়ি থাকে। ওই জায়গাটাই তার সম্রাজ্য। সেখানে যে যায়,সে আর ফিরে আসে না। ওই ডাইনিবুড়ির একটা সুন্দর সরোবর আছে। সেখানে সব সময় নানা রকমের সুন্দর সুন্দর পদ্ম ফুল ফুটে থাকে।কিন্তু ওগুলো পদ্মফুল নয়,ওগুলো মানুষ।

- মানুষ?

- হ্যাঁ মানুষ। যারা ওখানে যায়,ডাইনিবুড়ি তাদের মন্ত্রের দ্বারা ওই সরোবরের পদ্মফুল করে রাখে। আমাদের এই গ্রামেরও অনেকেই ওই সরোবরের পদ্মফুল হয়ে আছে।আমরা এখন আর কাউকে ওদিকে যেতে দিই না। তারপরও যদি কেউ ভুল করে চলে যায়,সে আর ফিরে আসে না।

- কিন্তু আমি যাব। আমাকে যেতেই হবে।

- আপনি যাবেন না রাজকুমার। আপনি ওখানে গেলে আপনিও আর ফিরে আসবেন না।

সর্দার এবং গ্রামবাসীদের নিষেধ উপেক্ষা করে পরের দিন সকালে রাজকুমার রওনা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হল ডাইনিবুড়ির সাম্রাজ্যের উদ্দেশ্যে। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাজকুমার পথ চলতে শুরু করল। সূর্য যখন মধ্যগগনে,তখন তৃষ্ণার্ত এবং ক্লান্ত রাজকুমার একটা বড় গাছের নিচে বসে বিশ্রাম নিতে লাগল। শীতল ছায়ায় রাজকুমারের দুচোখ জড়িয়ে যেতে লাগল। এমন সময় সে যেন অস্পষ্ট কিছু কথাবার্তা শুনতে পেল। ভালো করে মন দিয়ে শুনতে লাগল সেই কথাগুলো এবং বোঝার চেষ্টা করতে লাগলো। গাছের উপরে দুটো পাখি একে অপরের সাথে কথোপকথনে ব্যস্ত। তাদের কথোপকথনের মধ্য

দিয়ে ভেসে এলো ডাইনিবুড়ির কথা। ডাইনি বুড়ি নাকি এই জঙ্গলের পশুপাখিদেরও মন্ত্রবলে সরোবরের পদ্মফুল করে রেখেছে। ডাইনিবুড়ি প্রতিদিন ভালো ভালো লোভনীয় খাবার ছড়িয়ে রাখে উঠোনে। পশুপাখিরা ওই খাবার খেতে গেলেই সে তাদের মন্ত্রের দ্বারা পদ্মফুল করে দেয়। প্রথম পাখিটা দ্বিতীয় পাখিকে জিজ্ঞাসা করল - আচ্ছা এর থেকে কি বাঁচার কোনো উপায় নেই?

দ্বিতীয় পাখিটা বললো- আছে,তবে সে খুব কঠিন উপায়। ডাইনিবুড়িকে মুখ বেঁধে ওই সরোবরের জলে ফেলে দিতে পারলে সরোবরের পদ্মফুলগুলো আবার আগের মত তাদের স্বরূপ ফিরে পাবে এবং ডাইনিবুড়ি নিজে চিরকালের জন্য ওই সরোবরে পদ্মফুল হয়ে যাবে।

- তাহলে এটা কেউ করছে না কেন?

- কারণ ডাইনিবুড়ি তার আশেপাশে থাকা প্রাণীদের উপস্থিতি নিজের ক্ষমতাবলে বুঝতে পারে,তাই তার মুখ বাধা তো দূরের কথা,তার ধারে কাছেও কেউ যেতে পারে না।

- তাহলে ডাইনি বুড়ির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কি কোনো উপায় নেই?

- আছে,তবে সে খুব কঠিন উপায়। প্রতি পূর্ণিমার রাতে ডাইনি বুড়ি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে। ওই রাতে যদি কোনো রাজকুমার এখানে এসে তার মুখ বেঁধে এক নিশ্বাসে তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ওই সরোবরের জলে ফেলে দিতে পারে, তাহলেই এটা সম্ভব।কিন্তু মনে রাখতে হবে যে কোনো জিনিস দিয়ে ওর মুখ বাঁধলে হবেনা। ওই সরোবরে যে সাদা শালুক ফুল ফুটে আছে,সেই শালুক ফুলের ডাঁটি দিয়ে ঠিক রাত্রি সপ্তম প্রহরে ওর মুখ বাঁধতে হবে। তবে ওই শালুক ফুলের ডাঁটি অত সহজে নেওয়া যাবে না। ওই সরোবরে আছে অনেক হিংস্র কুমীর। তাদের নজর এড়িয়ে কাজটা করতে হবে।

এমন সময় রাজকুমারের প্রচন্ড হাঁচি পেল। সে চেষ্টা করেও নিজেকে সামলাতে না পেরে শব্দ করে হেঁচে দিল। হাঁচির শব্দ শুনে পাখিদুটো ঝটপট করে উড়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলে রাজকুমার বললো- ও বন্ধু পাখিরা তোমরা চলে যেও না। আমি তোমাদের সাহায্য চাই।

প্রথম পাখি- কে তুমি?

দ্বিতীয় পাখি - আর আমরা কিভাবে তোমাকে সাহায্য করতে পারি?

- আমি এই রাজ্যের রাজকুমার সূর্যশেখর। আমি এসেছি ডাইনিবুড়ির হাত থেকে সকলকে উদ্ধার করতে।

প্রথম পাখি ও দ্বিতীয় পাখি বললো- প্রণাম রাজকুমার। বলুন আমরা আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি।

- আমি এতদূর পর্যন্ত তোমাদেরসব কথা শুনেছি। পুরোটা শুনতে চাই।

- ঠিক আছে রাজকুমার। বাকিটাও বলছি শুনুন তাহলে। কিন্তু ওই সরোবরে কুমিরের চোখ এড়িয়ে শালুক ফুলের ডাঁটি সংগ্রহ করা খুব কঠিন কাজ।

- তাহলে কিভাবে সংগ্রহ করা যাবে?

- ওই সরোবরের তীরে একটা সোনার পাতার গাছ আছে,ওই গাছের একটা পাতা সরোবরের একদিকে ফেলে এক দৌড়ে অপরপ্রান্ত থেকে এক পলকে তুলে নিতে হবে ডাঁটি সহ শালুক ফুলটা। এরপর চুপিচুপি যেতে হবে ডাইনিবুড়ির মহলে। সেখানে পদে পদে বিপদ অপেক্ষা করছে।প্রতিটি দ্বারে প্রহরী হয়ে আছে প্রকাণ্ড প্রকান্ড অজগর সাপ।

- তাহলে কিভাবে যাব ওই ডাইনিবুড়ির কাছে?

- এই জঙ্গলের মধ্যে আছে এক বিশাল সর্পবৃক্ষ। ওই সর্পবৃক্ষের ফুল নিয়ে গিয়ে সাপের মুখের কাছে রেখে দিলেই ওরা ওই ফুলের সুগন্ধে ঘুমিয়ে পড়বে।

- কোথায় পাব সেই গাছ?

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

- সেই গাছের ফুলগুলো পূর্ণিমা রাতে চাঁদের মত জ্বলতে থাকে। এই জঙ্গলেই পাওয়া যায় সেই গাছ। খুঁজে নিতে হবে।আর একটা কথা রাজকুমার।
- কি কথা?
- ডাইনি বুড়ির মুখ বেঁধে ফেললেও তাকে এক নিঃশ্বাসে তুলে নিয়ে গিয়ে সরোবরের জলে ফেলা সহজ কাজ নয়।
- কেন?
- ডাইনিবুড়িকে দেখতে কঙ্কালসার হলেও ওর ওজন হাতির ওজনের সমান। তাই আপনাকেও অনেক শক্তি অর্জন করতে হবে।
- কিন্তু কিভাবে এত শক্তি অর্জন করব?
- চিন্তা করবেন রাজকুমার। এই জঙ্গলে শক্তিবৃক্ষ নামে একটি গাছ আছে। যে গাছের ফল খেলে কিছুক্ষণের জন্য শরীরে হাতির শক্তি আসে।
- কোথায় পাব সেই ফল ?
- আমরা সেই ফলের সন্ধান জানি। আমরা সেই ফল আপনাকে এনে দেব।আপনি সর্পবৃক্ষের সন্ধানে যান। আর আমরাও যাচ্ছি শক্তিবৃক্ষের ফল সংগ্রহ করতে।যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনি ফুল সংগ্রহ করে এখানে চলে আসবেন। কারণ আজ পূর্ণিমা রাত্রি।আজকেই কাজটা করতে হবে। এই বলে পাখিদুটো উড়ে চলে গেল। আর রাজকুমারও চলল ফুল সংগ্রহ করতে। কিন্তু যাবার আগে নিশান স্বরূপ ওই গাছে ঝুলিয়ে দিল তার গলায় থাকা মুক্তার মালাটি। এরপর সে যে পথ দিয়ে যেতে লাগল সেই পথের দু'ধারে ঝোপঝাড় তরবারি দিয়ে কেটে দিতে লাগল,যাতে ফেরার সময় পথ হারিয়ে না ফেলে। সারা বন তন্নতন্ন করে খুঁজেও সে সর্পবৃক্ষের ফুলের সন্ধান করতে পারল না। একসময় সে দেখতে পেল এক জায়গায় প্রচুর জোনাকির ভিড়। সেদিকে সে যত এগোতে লাগল তত তার চোখে পরলো আলোর রেখা। কিছুদূর যাবার পর সে দেখতে পেল একটা গাছে যেন অসংখ্য চাঁদ ঝুলছে। তার আর বুঝতে অসুবিধা হল না যে,ওটাই সর্পবৃক্ষ এবং ওই ফুলগুলি সর্পবৃক্ষের ফুল। এরপর সে কালবিলম্ব না করে সর্পবৃক্ষের কাছে গিয়ে চটপট কয়েকটা ফুল তুলে নিয়ে ফিরতে লাগল সেই গাছের কাছে। নির্ধারিত পথ ধরে সেই গাছের নিচে এসে দেখল তার জন্য আগে থেকেই অপেক্ষা করছে পাখি দুটো।
- কি রাজকুমার ফুল পেয়েছেন?
- হ্যাঁ পেয়েছি। এই দেখো। তোমরা ফল পেয়েছ?
- হ্যাঁ রাজকুমার, আমরাও ফল পেয়েছি। এই নিন।

রাজকুমার পাখিরদের কাছ থেকে ফল গ্রহণ করল।

- আর দেরি করবেন না রাজকুমার। এখন ষষ্ঠ প্রহর। হাতে বেশি সময় নেই।
- কিন্তু কোন দিকে কিভাবে যাব কিছুই তো বুঝতে পারছি না।
- চলুন আমরা আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

এরপর পাখি দুটো রাজকুমারকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। ওই সরোবরের তীরে রাজকুমারকে পৌঁছে দিয়ে তারা চলে গেল। রাজকুমার চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে পেলো সেই সোনার পাতার গাছটা। সরোবরের জলে দেখতে পেল অসংখ্য পদ্ম ফুল ফুটে আছে। মনে মনে

ভাবল ডাইনিবুড়ি কতজনকেইনা পদ্মফুল করে রেখেছে। প্রথমছ সে খুঁজতে লাগল সরোবরের জলে ফুটে থাকা সাদা শালুক ফুল। ভালো করে দেখার পর সে খুঁজে পেল একটা সাদা শালুক ফুল ফুটে আছে। আর দেরি না করে সোনার পাতার গাছের কাছে গিয়ে সোনার পাতা সংগ্রহ করলো। যেদিকে শালুক ফুল ফুটে আছে তার ঠিক উল্টো দিকের জলে পাতাটা ফেলে দিয়েই একছুটে গিয়ে শালুক ফুলটা তুলে নিল। এরপর সন্তর্পনে এবং সজাগ দৃষ্টি রেখে গেল ডাইনি বুড়ির মহলের দিকে। সেখানে গিয়ে সে লক্ষ্য করলো প্রতিটি প্রবেশদ্বারে এক একটা প্রকান্ড অজগর সাপ পাহারা দিচ্ছে। সে আস্তে আস্তে সাপের মুখের কাছে রেখে দিতে লাগলো সর্পবৃক্ষের ফুল। সাপের মুখের কাছে ফুলটা রাখতেই প্রকাণ্ড সাপ ঘুমিয়ে যেতে লাগল। এভাবে একের পর এক প্রবেশদ্বার পেরিয়ে সে পৌঁছে গেল ডাইনিবুড়ির শয়ন কক্ষে। যেখানে ডাইনিবুড়ি নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। প্রথমে সে পাখিদের দেওয়া শক্তিবৃক্ষের ফলটা খেয়ে ফেলল,তারপর সাদা শালুক ফুলের ডাঁটি দিয়ে ডাইনিবুড়ির মুখটা বেঁধে ফেললো শক্ত করে। আর কালবিলম্ব না করে এক নিঃশ্বাসে ডাইনিবুড়িকে উঠিয়ে নিয়ে ছুটলো সরোবরের দিকে। সেখানে গিয়ে ওই সরোবরের জলে ছুড়ে ফেলে দিলো তাকে। সঙ্গে সঙ্গে একটা বড় পদ্মফুল হয়ে গেল ডাইনিবুড়ি। ডাইনিবুড়ি পদ্মফুল হতেই অন্যান্য পদ্মফুলগুলো আপন স্বরূপ ফিরে পেল। সকলের নিজেদের প্রকৃত রূপ ফিরে পেয়ে অবাক হল।তখন পাখিদুটো বলে উঠলো - জয় বিলাসপুরে রাজকুমার সূর্যশেখরের জয়।

বাকিরাও সকলে একসঙ্গে- জয় রাজকুমার সূর্যশেখর জয়- বলে জয়ধ্বনি দিতে লাগলো।

বনের অন্যান্য পশুপাখিরা ডাইনি বুড়ির বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে মনের সুখে জঙ্গলে এদিক-ওদিক চলে গেল। মুক্ত দুই রাজকুমার চন্দ্রশেখর ও নক্ষত্রশেখর সূর্যশেখরের কাছে এসে বলল- তুমি বিলাসপুরে রাজকুমার?

- হ্যাঁ দাদা,আমি তোমাদেরই ছোটভাই।

এরপর দুজনে সূর্যশেখরকে জড়িয়ে ধরল।এরপর দুই দাদাকে সঙ্গে নিয়ে সূর্যশেখর ফিরতে লাগলো রাজমহলের উদ্দেশ্যে। আর পিছন পিছন আসতে লাগল হারিয়ে যাওয়া সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী। তারা যেতে যেতে সমুদ্রের মতো গর্জন করে জয়ধ্বনি দিতে লাগলো- জয় রাজকুমার সূর্যশেখরের জয়। জয় রাজকুমার সূর্যশেখরের জয়। এই জয়ধ্বনি শুনে সারা রাজ্যের মানুষ পথে বেরিয়ে এলো। তারাও জয়ধ্বনি করতে করতে এগিয়ে যেতে লাগল রাজমহলের দিকে। মহল থেকে মহারাজ ও মহারানী বেরিয়ে এসে সূর্যশেখর সহ তাদের হারিয়ে যাওয়া দুই সন্তানকে দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে গেলেন। তাঁরা আরও দেখলেন ওই জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়া সেনাবাহিনীও তাদের সাথে ফিরে এসেছে। সূর্যশেখরের এই বিজয়ে খুশি হয়ে মহারাজ তাকে বিলাসপুরের রাজ সিংহাসন প্রদান করলেন। বিলাসপুর পূর্ব গরিমা ফিরে পেল এবং সকল রাজ্যবাসী আনন্দে দিন অতিবাহিত করতে থাকল।

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

গুড ফ্রেইন্ড

মানবেন্দ্র সাহা

পড়ন্ত বিকেল। রোদের আলোর তেজ কমতে শুরু করেছে। সেই ছোট্টবেলা থেকে এখন পর্যন্ত এরা সব বন্ধু - রাইহানা, নীভা, জাহিদ, লিসা , তনিমা। এখন বাড়িতে ভালোই লাগছে না মোটেই। সবার মতের মিল হলো। মোবাইলের স্বরে। বিকেল সাড়ে পাঁচটা তনিমাদের বাড়ির ওখানে, ওই একটু আগে পুকুর পাড়ে। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে পাঁচটা সকলেই এলা তবে একজন, মানে লিসা ছাড়া। ও সবসময়ই লেট ওম্যান। পাক্কা দশ মিনিট পরে এলো।

চলেছে মাঠে মনের টানে। মনও উদার আকাশে ডাকছে। মাঠও ডাকছে অঙ্গুলিহেলনের নির্দেশে। সবুজ পাটের ক্ষেত। তাদের সারি সারি দোলা-দুলুনি; দেখতে বেশ ভালো লাগে। সকলেই পা ছড়িয়ে বেশ আয়েস করে বসলো। সূর্যমামার শেষ গাঢ় আলাপচারিতায় চোখ সকলের। কিন্তু তাতেও মন ছিল না রাইহানার। কিছু একটা অস্বস্তির মত কাঁটা হয়ে বিঁধছে গলায়, একেবারে হৃদয় পর্যন্ত। চোখের ইশারায় লিসাকে ধরল। লিসা হঠাৎ করে বললো-

"এই নীভা শোন। তোকে অনেকদিন ধরেই দেখছি আনমনা। এখনো দেখছি মোবাইলে কাকে কিসব ম্যাসেজ করেই চলেছিস? কি ব্যাপার বলতো। খোলসা করে বলবি।"

মৃদু হেসে বললো নীভা-

"না, না, তেমন কিছু নয়, একটা গুডফ্রেইন্ড হয়েছে।"

লিসা এক তাড়া দিয়ে বলেই বসলো-

"গুড ফ্রেইন্ড! গুড ফ্রেইন্ড মানে!

এসব কথা চলতে চলতেই আকাশ প্রায় কালো চুলের বন্যায় ঢেকে গেছে। আদর করছে সব গাছ-ঝোপ-সব-সবকিছুকে। চুম্বন করছে গাঢ়ভাবে অন্ধকারে মুখ ডুবিয়ে। আঁধার ঘনিয়ে এলো। তখনো আমতা আমতা করে বলেই চলেছে নীভা-

"না, না, তেমন নয়। একদিন ফেসবুক সূত্রে পরিচয় হল রজতের সঙ্গে। এই আর কি?

-ও বুঝেছি - রজতই তোর গুড ফ্রেইন্ড। আমরা সবাই ব্যাড ফ্রেইন্ড ঠিক আছে। লিসার চোখে-মুখে রক্তিম আভা স্পষ্ট। আর কিছু বলল না। তেজ দেখালো -খুব জেদি টাট্টুঘোড়ার তেজ। নীভাও আর কারো সঙ্গে তেমন কথা বললো না। তোয়াক্কাও করেনা

নীভা। আমার তো গুড ফ্রেইন্ড আছেই! হিংসে হচ্ছে হিংসে! বুঝিনা। হিংসের জ্বালায় সব মরছে। মরুক, মরুক! দরকার নেই ওদের। সে ও আর এগিয়ে এলোনা। বুঝলো ও না তাদের ছোটবেলার বন্ধুদের সেই অভিমান। অভিমান ভাঙ্গানোর গরজও নেই।

মনে রং ধরেছে! কত আশা। হৃদয়জুড়ে গুড ফ্রেইন্ডের ভালোলাগা; চোখে ভাসছে রজতের ছবিতে দেখা সুন্দর মিষ্টি মুখখানি। কানে কানে গুঞ্জন গীত করছে। রজতের মিষ্টি স্বর, কথা বলার ধরন। কানে কানে সব সময় শুনতে ইচ্ছে করছে একই গান, একই কথা, একই সুর-

ভালোবাসি ভালোবাসি
এই সুরে কাছে দূরে জলে-স্থলে
বাজায় বাঁশি।
ভালোবাসি-ভালোবাসি।

নীভা তার মাকে সব কথা জানায়। বলে তাদের বন্ধুদের অভিমানের কথা। নীভার মা বলে ওঠে -

-বাদ দে, ওদের কথা। ওদের হিংসে! বুঝলি নে হিংসে। হিংসেতে জ্বলছে। ছাড় তো ছাড়।

গলা খাদে নামিয়ে আরও বললো-

-ওরা অনেক বড়লোক না! রজত কী সুন্দর দেখতে। একেবারে রাজপুত্র।

এসব কথা শুনতে শুনতেই কল্পনার জোয়ারে ভাসছে নীভা। নীভা মন্ডল। কলেজে পড়ে। এবারে থার্ড ইয়ার। বয়স একুশ বছর। আমার রজতা রজত মন্ডল। সি. ইউ. তে পড়ে এম. এ। চাড্ডিখানি কথা!

স্বপ্নের নীল ছবিরা ভাসছে। রাতের অন্ধকার মানে দুপুর রাত। লিখল মেসেজে-

গুড ফ্রেইন্ড, কেমন আছো?

অপরপ্রান্তের লেখা, স্ক্রীনের পর্দায় ভেসে উঠলো-

আমি যে তোমার কথায় ভাবছিলাম। তুমি জানতে চাইলে। বেশ। জানো- মনে পড়েছে 'শেষের কবিতা' র অমিত -লাবণ্যের কথা-

-কি হয়েছে তাদের?

-কি আর হবে অমিত সবসময় মুগ্ধ করে কিন্তু হৃদয়জুড়ে নয়। হৃদয় ছুঁয়ে ফেলে, নিজের হৃদয়গুপ্ত রেখে কথা টানে, বলার ভানে। বুঝলে তো।

-ও, তাই বুঝি! তুমি কি সেই অমিত হতে চাইছো?

-না না, আমার হৃদয় ভরে যা আসে, প্রাণভরে তা বলি, বাস্তবতাকেও হার মানায়।

-কি বলছ! সত্যি! জানোতো আমি কিন্তু তোমার মত সুন্দর নয়!

-লজ্জা দিচ্ছো কেন বলতো? তোমার সেই সৌন্দর্য্য আছে। ভুলিয়েও রাখবে তা জানি। আচ্ছা শুভ রাত্রি।

স্ক্রীনের পর্দার আলো নিভে গেল। জ্বলল নীভার স্বপ্ন কোন। রাত বাড়ছে হুঁশ নেই। রাত প্রায় আড়াইটে। একটি প্যাঁচা ও ডেকে উঠল। আলস্যতা বাসা বাঁধলো। ক্লান্ত দেহে, ক্লান্ত মনে এলিয়ে গেল শরীর রজতের স্বপ্ন মেখে।

সকালে রোদ উঠেছে। এসে লাগছে নীভার চোখে মুখে। তাকেই আদর করে আরো জড়িয়ে আছে। হঠাৎ রিংটোনের শব্দে আবেশ কাটলো ঘুমের। ঘুমের কী? না, ঘুমের সঙ্গে রজতের ও। বাস্তব রজতের স্ক্রীনে ফুটে উঠল-

-আমি মুগ্ধ বটগাছের দেহের আকর্ষনে নয়, তার সুশীতল ছায়ায়, তার পাতার মৃদু হিল্লোল, তাতে যে সুর আছে, তাতে নেশা লাগে। বন্ধু সেই সুর তুমি-শুধু তুমি। হ্যাঁ, তুমিই আমার সেই হৃদয় সুর। বাজছে। বেজে চলেছে। বাজবে সারা জীবন ধরে। সুপ্রভাত।

এক লাফে এক লহমায় সবকিছু পূর্ণ করে পেল নীভা। নীভার মনে বারবার ঘুরছে-বন্ধু সেই সুর তুমি। তুমি আমার সেই হৃদয়ের সুর। কাকের কর্কশস্বর, কাকিমাদের ঝগড়া, মায়ের কাজে সাহায্য করা সবকিছুতেই যেন আনন্দের রেশ বইছে। কোনো বিরক্তি বোধ নেই। সবকিছু - একেবারে সবকিছুই মনে হচ্ছে মুগ্ধকর। প্রকৃতি ও। ঐ যে দুটি কাক নিম গাছের ডালে বসে আছে, কর্কশ গলায় চিৎকার জুড়েছে, সেখানেও শুনতে পাচ্ছে -

তুমিই আমার সেই হৃদয় সুর।

সত্যি আমি পারি কারো ভালো বন্ধু হতে, ভালো বন্ধু পেতেও। স্বগতোক্তি স্বরে বিড়বিড় করে বলে উঠছে নীভা-

হ্যাঁ আমিই। আমিই তোমার সেই হৃদয়সুর। সেই সুরেই বাঁধবো তোমায়। আমি আর তুমি একই সুরে বাঁধা পড়বো। নুপুর বেজে চলবে আমার পায়ে সারারাত। আর তুমি গান গেয়ে চলবে। তোমার গানের সেই হৃদয়সুরে আমার নৃত্যের ছন্দ মিলেমিশে একাকার হবে। আমি ও তুমি হব আমরা। হ্যাঁ আমরা। সুখী দম্পতি। নীড় বাঁধবো সুখের। সুখের নীড়।

-মিষ্টি সুরের ছন্দ, কল্পনার জাল বুনছে নীভা। ছন্দ পতন ঘটল। ঘটলো মায়ের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে-

-এই কচি আয়, খাবি তো। বেলা যে প্রায় বিকেল গড়িয়ে এলো।

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

খেয়ালই করেনি নীভা। ঘড়ির দিকে তাকালো। বলছে ঘড়ি ৩টে বেজে ১৫ মিনিট। আরে আজই তো রজতের সঙ্গে দেখা করার কথা। বিকেল ৫:৩০ মিনিট। বারাসাত স্টেশনের ১ নং প্ল্যাটফর্মের শেষে, শিয়ালদার দিকে; যেখানে প্ল্যাটফর্মের শেষ একটা ছোট রাস্তার সঙ্গে মিশে গেছে। ঠিক তার ওপরে রেলিং এর ধার ঘেঁষে দাঁড়াবে বলেছিল। বাঁ হাতটা রেলিং এ ধরে থাকবে। ডান হাতে Vivo -এর একটি মোবাইল। এই ছবি এঁকেছিল রজত নীভার চোখে।

পড়ি মড়ি করে ছুটল নীভা বড় রাস্তার দিকে। তাদের বাড়ি থেকে সরু রাস্তা ধরে প্রায় মিনিট আটেক তো লাগবেই। মিনিট পাঁচেক যেতে না যেতেই দু' ধারে পুকুর ভর্তি জলা সেখানে সাবধানে চলতে হয়, নইলে ধপাস্। মনে পড়ে সেই ছোট্টবেলার কথা। হয়েছিল কী- ক্লাস থ্রী তে পড়ে, নাচতে নাচতে হাঁটছে, নাচার ছন্দে একেবারে পুকুর জলে ধপাস। ভাগ্যিস সহেলী কাকিমা ছিল। ভাবলেই গা কেঁপে ওঠে। ভয় জাগে মনে। সেই ভয় মিশে আছে আমার রক্তে। তাই, পা খুব সাবধানী হয়ে যায়। হাঁটা হয় ধীরগতিতে।

বড় রাস্তার ধারে এলা এপার থেকে ওপার গেল। আরেকটু এগোলেই পদ্মলাভপুর মোড়। লোকে কথার টানে বলে -পর্নামপুর। এখন, বাজে প্রায় চারটে বেজে পাঁচ মিনিট। যাক বাবা হাতে পাঁচ মিনিট সময় আছে। বাস তো এ সময় আসে চারটে দশে। তবুও চিন্তা, বাস চলে যায় নি তো আগে! জিজ্ঞেস করেই ফেলল, বাঁ পাশের বড় মুদিখানা দোকানের কাকুকে। বাস যায়নি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল নীভা।

বাস এলো প্রায় চারটে বেজে তেরো মিনিট। বাসে উঠেও পড়ল হুড় মুড় করে। গেট থেকে ডান দিকে তাকাতেই চোখে পড়লো নীভার শেষ লেডিস সিট ফাঁকা আছে। জানলার ধার ঘেঁষে বসেও পড়ল সীটে। আঃ কি যে ভালো লাগছে। বাস চলছে। ভালোলাগার উদ্দামতাও বেড়ে চলেছে। বাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে নীভা। মনে মনে একরাশ কল্পনায় আঁকা ছবিতে। মনে হচ্ছে এই চলা যেন আমি আর রজত চলেছি একটি উড়ুক্কু পাখিতে চেপে। আর কেউ নেই সাথে। শুধু তুমি আর আমি। উড়ছি মেঘ ধরবো বলে। তালগাছের মাথা ছোঁব বলে। উড়ছি সুপারি গাছের ডাগাটাকে প্রায় ছুঁয়ে ফেলবো বলে।

চমক ভাঙলো নীভার। বাসের খালাসী বলে চলেছে একটানা-

-হেলাবটতলা, স্টেশন রোড। নামুন-নামুন। বাস প্রায় ছাড়বে ঠিক, সেই সময় হুড়মুড় করে নীভা নামছে। খালাসির মৃদু কর্কশ কণ্ঠস্বর-

-কি ম্যাডাম, ঘোর ভাঙলো?

-এসব কথা কানে গেল কী না জানিনা। নেমেই 'থ' মেরে দাঁড়িয়ে, মোবাইলটা হাতে নিয়ে দেখল, এখন পাঁচটা কুড়ি মিনিট। ছুটে চলেছে, ছুটছে নীভা। আর হাতে মাত্র

দশ মিনিট সময় আছে। স্টেশনের সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত পদক্ষেপে নেমেও গেল। হন্ হন্ করে হেঁটে রজতের বলা সেইখানে নির্দিষ্ট জায়গায় (১ নং প্ল্যাটফর্মের শেষের দিকে) পৌঁছেও গেল।

মনে মনে কত ভালোলাগা, চঞ্চলতা ভিড় করেছে তার নীড়ে। পাখি হতে চাই পাখি। পাখির নীড় তৈরি করবে। ভালোবাসার নীড়-স্বপ্নের নীড়। সেই নীড়ে আমার স্বপ্নরা ভিড় করবে। বন্ধু, তোমাকেই সমর্পণ করেছি আমার হৃদয় - আমার শরীর। শরীর নিংড়ে কি ভালোবাসা আসে? তবে তাই নাও, নাও না। রেলের ঘোষণায় স্বপ্নের ঘোর ভাঙলো- বসিরহাট-শিয়ালদা লোকাল ৩ নং প্লাটফর্মে আসছে। অধীর চঞ্চলতা আরো গ্রাস করল তার মনকে, একাগ্র চিত্তকে। হৃদয় জুড়ে ছন্দ-নৃত্যের ছন্দ বাজছে। কানে সেই সুর বেজে উঠেছে, রজতের সুর -

এসো, আমার হৃদয়ের সুর
এসো প্রিয়, এসো
এসো আমার নাও-এ এসো।

ট্রেনতো বেরিয়ে গেল স্টেশন ছেড়ে। প্রায় দশ মিনিট। আসছে না কেন? মন খারাপের পালা বুঝি নীভার মনের ঘরে এলা না, না- দুশ্চিন্তা-কিছু অসুবিধা হল না তো? ফোন করলো-

-হ্যালো, হ্যালো শুনতে পাচ্ছ-কোথায় তুমি? আমি তো বসে আছি সেই তখন থেকে। তুমি কোথায়?

-ট্রেনটা মিস করে গেলাম। মায়ের জ্বর এসেছিল হঠাৎ করে। ফার্মেসি থেকে ওষুধ কিনে বাড়িতে দিয়ে আসতে দেরি হয়ে গেল। একটু সবুর করো, আমি ঠিক সাড়ে ছ' টায় পৌঁছে যাব। শুনছো, শুনতে কি পাচ্ছো - তুমি আমার সেই হৃদয় সুর।

কথার মিষ্টতা, কত কত কথার ফুলঝুড়ি, হৃদয় নিংড়ানো বুলি রজতের সেই স্কুল থেকেই অভ্যেস।নীভার চোখ বুঝে জল এলো। রজত তার মাকে কত ভালবাসে! যাক্ এইটুকু অপেক্ষা তার কোনো অপেক্ষায় নয়। আরো অনেক সময় অপেক্ষা করতে হলেও সে রাজি। বিড়বিড় করছে। কবিতায় পেয়েছে তাকে -

তোমার হৃদয়ে বেঁধেছি ঘর
বেঁধেছি আপন স্বর
ওগো, প্রিয়ে, তুমিই আমার হৃদয় ঘর।

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

ছলনায় রজতের জুড়ি মেলা ভার। ট্রেনে বসেই লিখে জানান দিচ্ছে নীভাকে, তার কথার ফুলঝুড়ি দিয়ে। লিখছে সে-

-ট্রেনে বসে আছি। মনে হচ্ছে তুমিই আমার পাশে হাতটি ধরে বসে আছো। আর বলছো চোখে চোখ রেখে-

আমি তোমায় ভালোবাসি।

জীবন নদীর ওপারেও ভালবাসবে, আমি জানি। আকাশ পানে হারিয়ে গেলেও তুমি আমার হাতটি ধরে, আলতো চেপে মৃদু হেসে বলবে -দুষ্টু। আমি তখন আরো জড়িয়ে ধরে আদর করে বলবো- আমি যে আরো দুষ্টু হতে চাই। তোমার ওই মিষ্ট স্বরে বারবার 'দুষ্টু' ডাক শোনার জন্য।

সত্যিই মনমুগ্ধকর কথার বুনুনিতে কেনা মুগ্ধ না হয়ে থাকতে পারে! নীভাও মুগ্ধ হয়েছে। মুগ্ধ হয়েছে হৃদয়, মুগ্ধ হয়েছে বাতাস। সেও বুঝি কানে কানে বলছে এসে-

প্রিয়, একটু সবুর করো
শুনিয়ে দেব স্বর আমার মর্মর কলতানে
তাকাও যদি আমার পানে
শনশন বনবন স্বরে
ডাকবো যখন আমার বাহুপাশে
গুঞ্জরিয়া গীত তোমার স্বরে
বলবো তখন -
আমায় আদর করো,
আদর করো আমার ঘরে।

দ্রুত পদক্ষেপের ভান করে ছুটছে রজত। ছুটছে প্রিয়ার টানে। প্রথম দেখাতেই চিনলো নীভাকে, বলল তখন-

আমি তোমার রজত,
তুমি তো সেই নীভা
আমার নীভা
বলো সত্যি করে, আমার নীভা!

-নীভা কেঁপে উঠলো। নীভার হাত-পা সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠলো রজতের হাতের স্পর্শেই। শরীর বেয়ে ঝড় আসবে না তো! ঝড়! নীরবতায় চোখের জলে বুঝিয়ে দিল নীভা।

বুঝিয়ে দিল হাতের তালুর মৃদু চাপেও। তুমিই তো আমার সেই রজত, হৃদয়ের সুর। দু' জনেই একসঙ্গে সমস্বরে গেয়ে উঠলো-

তুমি আমার হৃদয় সুর
গাইবে তুমি আকাশ জুড়ে
ভাসিয়ে দেবো নদীর ভিড়ে;
তোমার আমার স্বর
আমরা হলাম ঘর।

(গুড ফ্রেইন্ড বলো, আরো বলো, বলে চলো; তোমার কথা ও সুরে মেলাবো আমি কণ্ঠ। আমার হৃদয় স্নিগ্ধ হচ্ছে, শান্ত হচ্ছে আমার হৃদয় ঝড়, বলো- বলো রজত বলে চলো)

বাঁধবো আমি যতন করে,
হৃদয় আপন ভরে।

সত্যিই এত তাড়াতাড়ি নীভার জীবনে এত সুখ -এই এত্ত সুখ আসবে। জাস্ট ভাবতে পারছে না। সময় প্রায় ফুরিয়ে যে যায়, এবার ঘরে যাবার পালা, সাঙ্গ হল আপাতত আমার এ ভবলীলা। তখনও হঠাৎ রজত কবিতার সুরে বলে উঠলো-

তুমিই আমার আকাশের সেই তারা,
একটুখানি হৃদয় হারা।
হৃদয় জুড়ে কান্না আসে
সত্যি বলছি, তুমি না থাকলে পাশে।
বাজবে তোমার সেই নুপুর নিক্কনের ঝংকার
সেই তো আমার হৃদে বড় অহংকার।
তুমিই আমার গর্ব হাসি
তুমিই আমার মরণফাঁসি।

আবৃত্তি করতে করতে রজত বলে উঠলো-

নীভা, তুমি পারলে, আমার গলায় মরণফাঁসি (মানে তুমি) পরাতে। আমৃত্যু তুমিই আমার গুড ফ্রেইন্ড। শুধু আমরা দু' জন।

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

যৌবনের রহস্যময়তায় গন্ধে মাতোয়ারা নীভা। নীভা যে স্বাদ পেতে চলেছে। সেই স্বাদের গন্ধ মেখে চলল। চলল তার বাড়ি। চাঁপাডালি বাস স্ট্যান্ড এ লাস্ট 87A বাস ধরতেই হবে। ইস্, এবার যদি বলি, গুড ফ্রেইন্ডের সঙ্গে দেখা হলো, কত কথা। কি সুন্দর মিষ্টি স্বভাব! জ্বলে যাবে, ওরা সব জ্বলে যাবে! রজত বলেছিল- বাড়ি পৌঁছেই ফোন করবে নীভা। না হলে আমি খুব দুশ্চিন্তায় থাকবো।

বাস থেকে নেমে, বাড়ির রাস্তায় এসে ফোন করছে রজতকে, তার প্রিয়-প্রিয়তমকে- ফোনের একটানা রিংটোন বেজেই চলেছে। তারপর বন্ধ। মোবাইল সুইচড অফ্। রাতের আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। দুশ্চিন্তার অন্ত নেই নীভার মনে। কোনো অঘটন ঘটল না তো? বাঁশ গাছের মর্মর শব্দে কান ঝালাপালা হচ্ছে। হৃদয় নিংড়ে কান্না আসছে কি তার? কান্না। বালিশ চাপা কান্না। সারারাত চেতন-অর্ধচেতনে কাটলো। যত বার ফোন করছে নীভা, সেই একই কথা বলছে -

এই নম্বরটি অন্য কোনো নম্বরে ফরোয়ার্ড করা হয়েছে।

আর কোনো উত্তর সে পাইনি। তখনও ভোরের আলো ফোটেনি। অন্ধকার তখনও ভোরের জন্ম দিতে পারেনি। পারেনি বলেই কি অন্ধকারের গর্ভ আরো অন্ধকার। না কি আলোর জন্ম দেবে বলে, আলোর পেটের ভারেই আরো ঘন অন্ধকার। জানলার শিক ধরে বসে আছে অপলক চোখে সেই বাঁশবনের দিকে। ভয় পাচ্ছে ভয়। কিসের ভয়? ভয় এসে জড়ো করছে নিরাশা, তার চোখে-মুখে। গিলে খাচ্ছে হতাশা- বিষাদ একেবারে গোগ্রাসে।

ভোরের আলো ফুটে উঠছে। মোহ ভাঙছে নীভার। মোহ। অন্ধ মোহ। লোভ-লোভাতুর মোহ। লোভ -লোভাতুর হৃদয়। আরো লোভ পেয়ে বসলো যেন একের পর একা এখনো সে গুড ফ্রেইন্ডের খোঁজ চালিয়ে যাচ্ছে। খোঁজ পাচ্ছে কি? হ্যাঁ বা না-এর দ্বন্দ্বে আবার হয়তো নতুন কোন গুড ফ্রেইন্ডকে বেছে নেবে, নীভা। মনে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা হয়ে দাঁড়িয়েছে-

এত ভালবাসতে ইচ্ছে করছে কেন?
পৃথিবীতে ভালোবাসা কমে গেল বলে?
সবই কি ভাটার টান?
শোষণ করছে ভালোবাসার প্রবল স্রোত।

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

আমার চোখে লকডাউন

জয়ন্তী মুখার্জি

আমার জীবনে এইরকম ঘটনা ঘটবে ভাবতেই পারিনি। জীবনের শেষ বেলায় এসেছি, কত কি দেখলাম, ভোগ করলাম: যেমন অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, আইলা আরো কত কি। তবে সেসব ছিল সাময়িক ভয়। আতঙ্ক ছিল তবু যেন সহ্য করা গিয়েছিল।

কিন্তু এই লকডাউন অভূতপূর্ব। স-ব-ব-ন্ধ! মানুষ মানুষের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করেছে! এমনকি কারো সঙ্গে কথা না বললেই যেন ভাল হয়। সবাই বাঁচার চেষ্টা করছে কিন্তু সবাইকে নিয়ে নয় কেমন যেন আলাদা আলাদা হয়ে, সবার থেকে সরে থেকে।

আবার এমন বিপদেই কিছু মানুষ দেখা দিয়েছেন ভগবান রূপে। নিজেদের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে আপনজনদের কথা ভুলে মানুষের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। এই তালিকায় রয়েছেন ডাক্তার এবং নার্সরা। ব্যক্তিগত স্বার্থ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে তারা দিনরাত এই অতিমারীর মধ্যে মানুষের সেবা করে চলেছেন। তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। নিরলস কর্মরত পুলিশেরা রোদে দাঁড়িয়ে মানুষদের ভালোর জন্য প্রথমে ভালো কথায় লকডাউন মানার বিষয়ে সচেতন করে চলেছেন। প্রয়োজনমতো কড়া তারা হচ্ছেন। তবু সবটাই মানুষের ভালো চেয়ে। মুখে মাস্ক পড়তে হবে নিজের সুরক্ষার জন্য। এতে অনেকের আপত্তি তবু এসবই ভাইরাসের ভয় এই সচেতনতা বার্তা তারা অহরহ দিয়ে চলেছেন।

এবার আমাদের কথায় আসি। আমাদের মত মধ্যবিত্ত ঘরে সংসার একরকম চলছে। অসুবিধা হলেও তা সহ্যের সীমা ছাড়ায়নি। কিন্তু লক্ষ্য করছি আমাদের মধ্যে এই বুঝি সব ফুরিয়ে গেল ; হয়ত বন্ধের মধ্যে সংসার চালাতে অসুবিধা হবে তাই জিনিস থাকতেও কেনার জন্য হুড়োহুড়ি চেষ্টা। ঘরে দিন চলে যাবার মত সবকিছু থাকতেও যেন একটা অহেতুক হাহাকার। মোটামুটি খাওয়া-দাওয়া চলছে । যথেষ্ট ঘুম হচ্ছে তাও মনের মধ্যে কিসের যেন একটা অভাব। আমার মনে হয় আমরা ঠিক থাকলেও কত মানুষ আছে যাদের খাওয়া-পড়া ও রাতের ঘুম সব চলে গিয়েছে। অনাহার হয়ে উঠেছে এ নিত্যসঙ্গী। যারা বাইরে কাজ করে তারা বাড়ি আসতে পারছে না। এইসব কারনেই মনে হয় আমাদের মান ও হুঁশ বারবার খোঁচা দিচ্ছে। তাই মনের মধ্যে থেকে থেকেই উঠছে হাহাকার। সত্যিই এখন আমরা কেউই ভালো নেই।

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

আমকথা

রজত দত্ত

পর্ব-১
জয় শ্রী রাম

ঘাবড়াবেন না, আমি কোনো ধর্মীয় স্লোগান দিচ্ছি না। আমি বলছি হনুমানের কথা। না গাছের ডালে বসেথাকা হনুমান বা আমাদের বাড়ীতে যে দুইপেয় হনুমান আছে, তাদের কথাও বলছি না। আমি বলছি পবন পুত্র হনুমানের কথা, রামভক্ত হনুমানের কথা। মর্ডান বজরংবলী র কথাও না।

লঙ্কারাজ রাবনপুত্র মেঘনাদ, ইন্দ্রজিৎ স্বর্গ বা ইন্দ্রপুরী জয় করলেন। পরিচিত হলেন হাজারো সুস্বাদু স্বর্গীয় ফলের সাথে। কিন্তু তার মন জয় করলো আম। স্বর্গের সেরা ফল আম্ আমের আঁটি, আমের চারা নিয়ে স্বগর্বে ফিরলেন লঙ্কায়। শুরু হল স্বর্গীয় ফলের মর্তে চাষ।

এদিকে তো মেঘনাদ এর বাবা রাবন এক কান্ড করে বসেছেন, সীতাকে হরণ করে নিয়ে এসেছেন লঙ্কায়। অশোক বনে বন্দী সীতা চোখের জল ফেলছেন আররাম নাম করছেন। আরওদিকে রঘুকুলপতি রামচন্দ্র দলবল নিয়ে রওনা হয়েছেন লঙ্কার দিকে। দলপতি হনুমান সীতা মাতার খোঁজ নিতে আর শত্রুপক্ষের খোঁজ নিতে দিলেন এক মহা লাফ। একি আরমাইক পাওয়েলের long jump এ বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টিকারী ৯.৯৫ মিটার বা সাড়ে ঊনত্রিশ ফুটের লাফ!!?? এ ছিল ৩৭৪ কিলোমিটার এর লম্বা লাফ। স্বাভাবিক, অত বড় লাফ দেবার পর খিদে তো পাবেই। এদিক সেদিক তাকাতে তাকাতে নজরে এল একটি সবুজ বাগান। রংবেরং এর পাকা ফল ঝুলছে গাছ থেকে। সময় নষ্ট না করে টপাটপ খেতে শুরু করলেন হনুমান। আমের স্বাদে পাগল হনুমান আমখাচ্ছেন আরআঁটি গুলো ছুড়ে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছেন। এ কি আরযে সে হনুমান!!! পবনপুত্র হনুমান। গায়ের জোর প্রশ্নাতীত। সেই আমের কয়েকটা আঁটি সমুদ্র পার হয়ে পড়ল ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে। ছড়িয়ে পড়লো সারা দেশময়। শুরু হল আমের জয়যাত্রা।

পর্ব -২
অষ্টোত্তর শতনাম

রাবনের দেশ থেকে তো রামের দেশে আম এলো। সৌজন্যে হনুমান।

"আম শব্দটি একটি মৈথিলী শব্দ। আরষোড়শ শতকের শেষদিকে Mango কথাটা ইংরেজী অভিধান ভুক্ত হয়। যদিও এই আমের মতই "mango" শব্দটিতেও আমাদের ই অধিকার। দ্রাবিড়ীয় শব্দ "মনগ" শব্দটি পর্তুগীজরা ধার করে ও "মনগ" বদলে হয় "Manga"। আরসেই "Manga" থেকেই অধুনা ইংরেজী "Mango" শব্দটির আমদানি। আমের বিজ্ঞান সম্মত নাম Mangifera Indica। এখানেও আমাদের প্রভাব।

কথিত আছে তৎকালীন সমাজের এক বিশিষ্ট নগরবধূ আম্রপালী তথাগত গৌতম বুদ্ধকে একটি আম বাগান উপহার দেন যাতে তিনি আমগাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিতে পারেন। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছে এ একপবিত্র গাছ। আরএ লাইন গুলো তো আমাদের সকলের ই চেনা জানা.... "আলপনা এঁকে তোমায় সাজিয়ে দিলাম পট / আমের পল্লব দিলাম জল ভরা ঘট" । আমের পল্লব ছাড়া হিন্দুদের পূজার ঘট স্থাপন হয় না। মহাভারতে উল্লেখ পাই, পান্ডবরা অজ্ঞাতবাসের সময় পুরদেশে এলে, কৃষ্ণসখা সুদাম পান্ডবদের কাছে কিছু আমদেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে পৌছে দেওয়ার জন্য। এমন ই ছিল আমের মাহাত্ম্য।

শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম এর মতোই আমের ও অনেক নাম। জানি একটু বাড়িয়ে বলা হল, তবুও। "মৃষালোক", "মাকুন্দ", "সখ", "কামাঙ্গ", "সরস", "মধুদূত", "অঙ্গনপ্রীয়", "পিকবল্লভ" এগুলি তো সবই তার (আমের) নাম। মহর্ষি বাল্মীকি যেমন আমকে বলেছেন "চূ্যত", তেমনি কবি কালিদাস আমকে বলেছেন "আম্র ", বৎসায়ন আমকে "সহকার" বলে উল্লেখ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে আমকে "আমবু" বলা হয়েছে। হিউয়েন-সাং আমকে "পোর- ই-হিন্দি " বলে উল্লেখ করেছেন। আরবী ভাষায় আমকে বলা হয় "আম্বাজ", আরফারসীতে "আম্বা"। কি অষ্টোত্তর শতনামের কাছাকাছি গেল কি না?? এখানেই শেষ না, মৎস পুরান, বায়ু পুরানেও আছে আমকথা। আমীর খসরু (১২৫৩-১৩২৫) পর্যন্ত আমের প্রশংসায় রচনা করেছিলেন কবিতা। আমকে হিন্দুস্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ ফল হিসাবে ভূষিত করেন। শুধু কি তাই ই?? ১৫৫৮ সালে আবুল ফজল্ তার লেখা আইনই-আকবরী তে আমের বিভিন্ন প্রজাতির কথাও উল্লেখ করেন। এমনকি ইবন্-বতুতা (১৩০৪-১৩৬৯) তার লেখাতেও আমকে ভারতের শ্রেষ্ঠ ফল হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

আরএকজনের কথা না বললেই নয়, ভারতীয় আমের গ্লোবালাইজেশন যদি কেউ সর্বপ্রথম করে থাকেন, তিনি হলেন হিউয়েন-সাং। তিনি ৬৩২-৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারত ভ্রমণ কালে আমের সাথে পরিচিত হন। আর তিনিই ভারতীয় আমকে বহিঃ বিশ্বের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন।

পর্ব-৩

প্রেম

এই পর্বে বলবো কয়েকজন প্রেমিকের কথা, অবশ্যই অমর আম প্রেমিকেদের কথা। অশোক থেকে আলাউদ্দিন খিলজী, বাবর থেকে শুরু করে আকবর আকবরথেকে বাহাদুর শাহ জাফর, বীরবল থেকে শুরু করে মির্জা গালিব সকলেই আমের প্রেমে পড়েছিলেন। মুঘল সম্রাটরা যেসকল সুদৃশ্য "বাগ" অর্থাৎ বাগান তৈরী করেন সেখানেও প্রাধান্য আম গাছের। বাবর ছিলেন আম ভক্ত তার কাছে আম ছিল ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ফল। ওদিকে আমপ্রেমে সম্রাট আকবরও কিছু কম যান না। আকবরতার শাসনকালে দারভাঙ্গার কাছে লাখবাগে প্রায় এক লক্ষ আমগাছ লাগান। আরএটি ছিল এই উপমহাদেশের সর্বপ্রথম সুসংগঠিত আমবাগান। বাহাদুর শাহ জাফরকে তার চিকিৎসকরা পাকস্থলীর পীড়ার জন্য কঠোর ভাবে আমখেতে বারণ করেছিলেন। কিন্তু আমের প্রেমে পাগল বাহাদুর শাহ জাফর নিষেধাজ্ঞা কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রত্যেক বার খাবার পর অনেকগুলো আমখেতেন।

বাংলার নবাবেরা আমপ্রেমে পিছিয়ে ছিলেন না। মালদা, মুর্শিদাবাদ তথা সারা বাংলা জুড়েই একাধিক আমবাগান তৈরি করেন। আমের নামকরণ করেন "বেগম ফুলি ", "বিবি পসন্দ", "নবাব পসন্দ "। আর

নবাবী "কহিতুর" আমপাড়ার পদ্ধতি শৈল্পিক। নিজের চোখেই তা দেখেছি। আমার এক দাদুর বাড়ীতে কহিতুর আমগাছ ছিল। আরসে আমপাড়তে হত মোটা তুলোর গ্লাভস্ পরে বা ভালোকরে তুলোর মোড়া জাল কোটা দিয়ে। অযত্ন করে বা খোঁচা দিয়ে পাড়লে, বা আমমাটিতে পড়লে দর্পচূর্ণ হত, মানহানি হত আমের। বড় অভিমানী সে আম। শুধু কি তাই!!?? সকালে আমপাড়ার সময় যদি ভুলবসতঃ কোথাও জোরে আঙুলের চাপ পড়তো, তাহলে বিকালের মধ্য সেই সামান্য চাপ পড়া জায়গায় পোকা হয়ে যেত। এমন নাজুক ছিল সে আম। আরআমপাড়ার পদ্ধতিটাও ছিল আসাধারন কৌশল ও শিল্পনৈপুণ্যর মিশেল। আরএই না হল নবাবী আম!!

বীরবলের আমপ্রেম ছিল অন্য পর্যায়ের। জনশ্রুতি, একদিন সম্রাট আকবরবীরবলকে শাহী খানা খেতে বলেন। যথারীতি, বীরবলও পেটপুরে খেলেন। সম্রাট তাকে আরো কিছু খেতে অনুরোধ করলে, বীরবল জানান, তার পেট একদম ভর্তি, তিল ধরানোর জায়গা নেই। এসময় একজন এসে বীরবলের থালায় আম রেখে গেলে, বীরবল অম্লান বদনে সব খেয়ে নেন। সম্রাট রেগেগিয়ে জিজ্ঞাসা করলে "এটা কি রকম হল!? "। হাসিমুখে বীরবল বললেন "হুজুর, রাস্তায় যখন খুব ভীড় থাকে, তখন সেই পথে আপনি গেলে, সবাই আপনাকে জায়গা করে দেয়। আপনি যেমন রাজা, আমও তেমনই ফলের রাজা। আপনাকে যেমন আমরা রাস্তা ছেড়ে দেই, পেট ও আমকে দেখে রাস্তা তৈরী করে দিয়েছে। তাই আমি আমখেতে পেরেছি। এহেন ছিল বীরবলের আমপ্রেম।

মির্জা গালিবের থেকে বড় আমপ্রেমী আরকেউ ছিল কি না, তা আমার জানা নেই। সারা দেশ থেকে তার গুণমুগ্ধ ভক্তরা তার জন্য আমপাঠাতো।কথিত আছে তিনি সারাজীবনে প্রায় চার হাজার প্রকার আমের স্বাদ গ্রহন করেছিলেন। গালিবের রসবোধ আমের থেকে কোনো অংশে কম ছিলো না। আর তার কয়েকটা উদাহরণ আপনাদের প্লেটে ...

লাল কেল্লায় বাহাদুর শাহ জাফর পায়চারি করছেন। সঙ্গে মির্জা গালিব। কিন্তু গালিবের নজর, মন সব ই তখন বাগানের পাকা আমের দিকে। কিন্তু বাদশাহী বাগানের আমে তো একমাত্র অধিকার, স্বয়ং বাদশাহের। বাদশাহ বিষয়টি নজর করেন ও কৌতুহলভরে জিজ্ঞাসা করেন যে গালিব কি দেখছেন, তার মন কোথায়? রসিক গালিব উত্তর দেন

"বরসরে হর দানা বনোশতা অয়াঁ
কয়ী ফঁলা ইবনে ফঁলা ইবনে ফঁলা।

(যার অর্থ চলতি কথায় দানে দানে পে লিখা রহতা হ্যয় খানেওয়ালেকা নাম)

গালিব সম্রাটকে জানান, "যে শুনেছি প্রতিটি দানায় তার খাদকের এবং তার বাপ দাদার নাম লেখা থাকে। আমি দেখছি কোন আমে আমার ও আমার বাপ দাদার নাম লেখা আছে। এই রসিকতার ফল হাতেগরম। ঐ দিন ই বাদশাহের কাছ থেকে গালিবের জন্য উপহার এল। আরউপহারটি কি ছিলো, তা বলা নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন।

মির্জা গালিবের বন্ধু, হাকিম রেজাউদ্দিন খাঁ মোটেই আমপছন্দ করতেন না। তারা দুজনে একদিন রাস্তায় হাঁটছিলেন। নজরে এল্ রাস্তায় দুটি গাধা, রাস্তায় পড়েথাকা আমের খোসা না খেয়ে, শুধুমাত্র, গন্ধ শুঁকে

ছেড়েদিল। হাকিম সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বললেন "দেখেছেন মির্জা সাহেব, আম কিরকম ফল্ যা গাধারাও খেতে চায় না"। আর তিনি তো গালিব ই, অমর আমপ্রেমী। আমের অপমান সহ্য হবে কেন? তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন "ঠিকই বলেছেন হাকিম সাহেব, শুধু গাধারাই আমপছন্দ করে না"। আম প্রেমীর সাথে পাঙ্গা!!!

গুগল ও কয়েকটি বই ঘেঁটে যেসব তথ্যসূত্র পেয়েছি,তাতে, মির্জা গালিব এর থেকে বড় আমপ্রেমী আর কেউ ছিলো বলে আমার মনে হয় না। গালিব আরগালিবের অমর আমপ্রেমকে স্মরণ করে আজও প্রতি বছর লাখনৌ শহরে আয়োজিত হয় একঅসাধারণ কাব্য অনুষ্ঠানের। আর সেই কাব্য অনুষ্ঠানের নাম....

"আম অউর গালিব"।

পর্ব-৪

জাতের নামে বজ্জাতি

আমতো ফলের রাজা। তার আবার জাত বিচার কি!! বিখ্যাত লেখক ফ্রাইয়া, আম আবেগে উদ্দ্বেলিত হয়ে, ১৬৭৩ সালে আম প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে গ্রীক দেবতার প্রিয় ফল নেকটারিন থেকেও সুস্বাদু হল আম। তার আবার জাত বিচার!!

গুগল ও আরো কয়েকটি তথ্যসূত্র থেকে পাওয়া গেল যে ভারতে প্রায় চার হাজার প্রজাতির আমআছে। কিছু বেঁচে আছে, আর কিছু তলিয়ে গিয়েছে ইতিহাসের স্রোতে। আনুমানিক ১৭০০ সালে ভারতের বাইরে, প্রথম, ব্রাজিলেই আমগাছ লাগানো হয়, যা ১৭৪০ নাগাদ ব্রাজিল থেকে পৌছায় ওয়েস্ট ইন্ডিজে।সম্ভবতঃ জাতটি ছিল "আলফানসো ", যেটা আজও বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আমহিসেবে বিবেচিত।

মানুষের আরকরকম জাত ? জাতের নামে বজ্জাতি যখন চলছে, ফলের রাজা আমের জাত নিয়ে মানুষের বজ্জাতির একটা হিসাব করা যাক। গুনতে থাকুন আমের জাতি বৈচিত্র-- গোল্লা, বড়বাবু, বেগমফুলি, মন্ডা, দুধকুমার, কালাপাহাড়, নিলম, মিছরি দমদম, খান বিলাস, ইলিশ পেটি, ভুতো বোম্বাই, মায়া, জিলিপি কাড়া, বিশ্বনাথ চ্যাটার্জি, কাকাতুয়া, কৃষ্ণকলি, ক্ষীরমোহন, বৈশাখী বৌভুলানি, আতা, আতাউল.... কি হাঁপিয়ে গেলেন!!?? না ছাড়ব না, "ধরেছি আজতোমায় ছাড়বো না"। গুনতে থাকুন, গুনতে থাকুন..... অগ্নি, অমৃত ভোগ, গৌরজিত, চিনি, জর্দা, দর্শন, নারিকেল, বাউনি লতা, বৃন্দাবনী, তাল পানি, বাতাসা, লোহাচূর, সুর্য্যপুরী, পদ্মমধু, যাহারা, বেলা, নীলাম্বরী..... থাক আরকষ্ট দেব না। তবে ভুলেও ভাববেন না, এখানেই শেষ। এতো হিমশৈলের চূড়া মাত্র।

এবার, for a change, এবার গল্প দাদুর আসর...

১৮০০ সাল নাগাদ, গৌড়বঙ্গের কোনো একটি গ্রামে বাস করতেন, ফজলি বিবি। তার উঠনে ছিল এক সুস্বাদু আমের গাছ। এলাকার কালেকটর, রাজভেনশ সাহেব এলে, ফজলি বিবি তার গাছের আমনিয়ে সাহেবের সাথে দেখা করতে যান। আমখেয়ে খুশি হয়ে, সাহেব আমের নাম জানতে চান। বৃদ্ধা প্রায়

কিছুই বুঝতে পারেন না, শুধু মাত্র নেম বা নাম কথাটি ছাড়া। ও তিনি তার নাম বলেন। আর তারপর থেকে, ফজলি বিবির নামানুসারে সেই আমের নাম হয় "ফজলি"। আবার অন্যমত ও আছে। ফজলআলি বা ফজলমিঞা নামে এক মুঘল সেনাধ্যক্ষর নাম থেকে তার বাগানের আমের নাম হয় ফজলি। কোনটা ঠিক?? আমি বা গুগল, কেউ ই জানি না।

মুঘল আমলে, দ্বারভাঙায় ব্যপক আমচাষ শুরু হয়। আঠেরো শতকে এখনকার ই এক ফকির, এক বিরাট আম বাগান তৈরী করেন। সেই ফকিরের পায়ে, একটু সমস্যা ছিলো। আর জনশ্রুতি, সেই ল্যাংড়া ফকিরের আমবাগানের আম ল্যাংড়া নামে পরিচিত হয়।

ইংরেজবাজারে নরহাট্টায়, গোপাল নামে এক ব্যক্তির, সুবিশাল আমবাগান ছিল। আর তার নামানুসারে, তার বাগানের আমের নাম হয়, "গোপাল ভোগ"। এক্ষেত্রে আরো একটি মত আছে। শ্রী কৃষ্ণের সখা সুদাম, পান্ডবদের হাত দিয়ে তার বন্ধু গোপালের জন্য আম পাঠান। আর তা থেকেই আসে "গোপাল ভোগ" নাম।

মালদার, চন্ডীপুরের বাসিন্দা লক্ষ্মণের ছিল এক বিশেষ সুমিষ্ট আমের বিরাট বাগান। আর তার নাম থেকেই আসে "লক্ষন ভোগ"।

আবার আশ্বিন মাসে পাকে বলে এই বিশেষ ধরনের আমের নাম "আশ্বিনা "।

ভারতের mango capital হলো লখনৌ। এখান থেকে ২৫ কিমি দুরে অবস্থিত মালিহাবাদ। এখানকার বিখ্যাত দশেরা উৎসবের নাম থেকে এখানকার এক বিশেষ প্রজাতির আমের নামকরণ করা হয় "দশেরী"।

"আমরুপালী" কথা থেকে আসে, "আম্রপালী" নাম। কাঁচা "আম্রপালীর" গায়ে একটু ছাই ছাই রং এর আস্তরণ থাকে। সম্ভবতঃ সেই কারনেই, এই নাম। নিজের বাড়ির গাছে লক্ষ্য করেছি, তাই বলতে পারলাম। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, গৌতম বুদ্ধের সময়কালের এক বিখ্যাত নগরবধূ ছিলেন আম্রপালী। তিনি গৌতম বুদ্ধকে একটি আমবাগান প্রদান করেন। "আম্রপালী" নামের উৎস সেটাও হতে পারে। সত্যমিথ্যা বিচারে, আমি গুগলের মত ই অসহায়।

বালুকা, মাসিমপুরের রাজা, তাজ বাহাদুর সিং এর ছিল এক বিশাল আমবাগান। সেই আমবাগান থেকে, কেতকী গ্রামের এক আমব্যবসায়ী নফলউদ্দিন / নফরউদ্দিন, একটি আমের চারা নিজের বাগানে রোপন করেন। শুকনো মাটিতে জলদেবার জন্য, তিনি জলভরা হাঁড়ি বসিয়ে, ফিলটার পদ্ধতিকে ব্যবহার করেন। কিন্তু কে বা কারা সেই হাঁড়ি ভেঙে দিয়ে যায়। আরসেই আমবাগানের আমের নাম হয় "হাঁড়িভাঙা"।

পর্তুগীজ এক সামরিক বিশেষজ্ঞ আলফানসু-ডি-আলবাকারিক এর নামানুসারে ভারতের অন্যতম সেরা আমের নামকরণ হয় "আলফানসো"। এই অসাধারণ টক-মিষ্টি সুস্বাদু আম "কাকডি হাপুস" নামেও পরিচিত। এর অর্থ, কাগজের মত পাতলা খোসা।

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

গোলাপের মতো রং আর সুগন্ধ যে আমের, তার নাম আরকি হতে পারে "গোলাপখাস" ছাড়া??

আমের জাত নিয়ে বজ্জাতি তো অনেক হল। তবে ব্যক্তিগত ভাবে যে আমটি আমি খুঁজছি, এত তথ্যের সন্ধান দিলেও, গুগুল যার সন্ধান দিতে ব্যর্থ, যে আমটি আমি খেতে চাই, ভগবানের কাছে রোজ প্রার্থনা করি, "ভগবান, এই আমটি অন্তত একটা আমাকে খাওয়ার সুযোগ করে দাও", সেই আমটির নাম "বৌভুলানি "। এ আমনাকি এমন সুস্বাদু, এমন সুস্বাদু, যে এ আমের স্বাদ বৌ কে ও ভুলিয়ে দিতে পারে। স্বাদ চুলোয় যাক, কাজ হলেই হবে। "please ভগবান, please ,এই আম অন্তত একটা জোগাড় করে দাও"।

আর হ্যাঁ, আপনারা যদি কেউ এই "বৌভুলানি " আমের সন্ধান পান, আপনি খান বা না খান, আমার জন্য অন্তত একটু করো পাঠিয়ে দেবেন। তাহলে কথা রইল কিন্তু..... .

পর্ব -৫

আমরস

আমের রস কি শুধুমাত্র খাদ্যপ্রেমীদের? আমরসের আবেদন কি শুধুমাত্র স্বাদকোরকে? না। এমনটা কখনোই নয়। সাহিত্যের মাটি আমরসসিক্ত। তা সে সংস্কৃত সাহিত্যই হোক, বা দেশী বিদেশী সাহিত্য। সাহিত্য রস আর আমরসের একঅদ্ভুত অপুর্ব মিশ্রণ, সাহিত্য রসকে আরো সুস্বাদু করে তুলেছে। সেইসব কিছু অপুর্ব সুস্বাদু খাবারের পরিবেশন এই পর্বে।

সরস মেনুকার্ডের প্রথমটা তুলনামূলক একটু নিরস, নতুন খাবার। গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড বইটিতেও হাজির আম। তাও আবার যে সে আম না। পৃথিবীর সবথেকে বড় আম। ২০০৯ সালে, ফিলিপাইনস্ এর সাজিও ও মারিয়া সিকাবো বভিওনগানের (অনেক কষ্টে বাংলায় লিখলাম) আম বাগানে, এখনও পর্যন্ত পৃথিবীর সবথেকে বড় আমটি ফলেছিল। ওজন? বেশী না, মাত্র ৩ কেজি ৪৩৫ গ্রাম, আর তার দৈর্ঘ ৩০.৪৩ সেমি আর প্রস্থ ১৭.১৮ সেমি।

কবি কালিদাস, "মেঘদূত " কাব্যে একটি পর্বতের পরিচয় করান "আম্রকূট" নামে। আরকবি কালিদাস ই আম্রমুকুলকে হিন্দুদের প্রনয়ের দেবতা মন্মথর, পঞ্চরের একটি শর বলেছেন। প্রেমার্ত হৃদয়ে আম্রমুকুলের সৌরভ যে বেদনার সৃষ্টি করে, লোকগীতিতে প্রাচীনকাল থেকেই তার উল্লেখ পাওয়া যায়। সংস্কৃত সাহিত্যে "আম্রগন্ধক ", "আম্রনিশা", "আম্রগন্ধী" শব্দ গুলির ব্যবহার বারংবার। শৈব সাহিত্যে লিঙ্গকে বলা হয়েছে "আম্রতারকেশ্বর"। এমনকি খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে, মৌর্য সম্রাট অশোকের দ্বারা নির্মিত, সাঁচীর স্তুপেও আমও আমগাছের উপস্থিতি মেলে।

আরখনার বচন ?? সেখানে তো আছেই..... " মাঘে বোল, ফাগুনে গুটি, চৈত্রে কাটাকুটি, বৈশাখে আঁটি, জ্যৈষ্ঠে দুধের বাটি"। প্রশ্ন হতেই পারে, খনার বচনের নামে যা খুশি চালালেই হল!!?? মাঘ মাসে আমের বোল!? কবে হল!!?? হতো, মশাই হতো। মাঘ মাসের শুক্ল পঞ্চমী তিথিতে হয় সরস্বতী পূজা। আরভুলে গেলে চলবে?? সরস্বতী পূজায় লাগে আমের মুকুল। গ্লোবাল ওয়ারমিং এর ঠেলায়, জলবায়ু পরিবর্তন ঘেঁটে গেছে, আরখনার বচন ও।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম আমের উল্লেখ পাওয়া যায় দ্বাদশ শতাব্দীতে, গৌড় রাজ লক্ষন সেনের বিশিষ্ট সভাকবি উমাপতি ধরে সংস্কৃত শ্লোকে.....

" সুগন্ধিঃ কোহনি সাৎ কুসুমসময়ে কোহনি বিপপী
শলটো সামোদঃ ফলটরিণতৌ কোহনি সুরভি।
প্রসুনপ্রারম্ভাৎ প্রভৃতি ফলপাকাবধি পুনর্
জাগত্যকত্রৈব স্ফীতি সহকারে পরিমলঃ"।।

অর্থাৎ -- কোনো কোনো বৃক্ষ ফুল ফোটাবার ফলে সুগন্ধী হয়। কোনো কোনো (বৃক্ষের) কাঁচা ফল হয় সুরভি (সুস্বাদু), কোনো কোনো (বৃক্ষ) আবার ফল পাকলে হয় মনোরম। কিন্ত ফুল ফোটাবার শুরু থেকে ফলপেকে যাওয়া পর্যন্ত (আগাগোড়া) পরিমল (আর্থাৎ মধুর) জগতে একমাত্র আমবৃক্ষেই প্রকটিত।
(প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, সংস্কৃত পরীক্ষায় আমি একবার ফেল করেছিলাম, আরজীবনে কোনদিন হাফ্ সেঞ্চুরী করতে পারি নি। একাধিক বার বন্ধুর খাতা দেখে লিখে সংস্কৃত পরীক্ষায় উতরেছি, আরতাই, এক্ষেত্রে আমার বন্ধু গুগুল)

অনেক্ষণ এপাড়ায় আছি। এবার একটু পাড়া বেড়িয়ে আসি। মানে ঐ আরকি, পশ্চিম পাড়ায়। ইংরাজী সাহিত্যে "mango" কথাটি Simile ও Metaphor উভয় হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন "She is as sweet as mango" এটা Simile, কিন্ত Sandra Cisneros এর লেখা বিখ্যাত বই "The House on Mango Street" এ "Mango" কথাটির ব্যবহার Metaphorical। কি অবাক কান্ড! আমনিয়ে যে Political Satire হতে পারে, কেবা তা জানতো!! মহম্মদ হানিফের লেখা "A Case of Exploding Mangoes" একটি অসাধারণ Political Satire.

আমরস যে কোন দিক থেকে গড়িয়ে কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে, তার একটা উদাহরণ দেই.... ১৯৪২ সালে, E M Foster এর বিখ্যাত বই "A Passage to India" তে একজায়গায় Dr. Aziz, Dr. Fielding কে বলছেল " For you, I shall arrange a lady with breasts like mangoes "। বাব্বাঃ!! আমনিয়ে যে এরকম আদি রসাত্মক ভয়ঙ্কর রকম অসভ্য লেখা!!!! কল্পনাতীত ছিল।

থাক বাবা, বেপাড়ায় ঘুরে আরকাজ নেই। নিজের পাড়ায় টো টো করি। আমবাগান মানেই ইতিহাস। ১৭৫৭ সালে পলাশীর আমবাগানে সিরাজদ্দৌল্লার পরাজয় ঘটে। সুরা আরআমে হয় তাৎক্ষণিক বিজয় উৎসব। আবার ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল, মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলার আমবাগানে, শপথ গ্রহণ করে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার। আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনের আমতলাতেই হয়েছিল এক ঐতিহাসিক রক্তাক্ত সিদ্ধান্ত। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করবার দাবীতে, ছাত্রছাত্রীরা ১৪৪ ধরা ভেঙে রাস্তায় প্রতিবাদে নামার সিদ্ধান্ত নেয়। আর বাকিটা ইতিহাস....

".....ওমা ফাগুনে তোর আমের বনে
ঘ্রাণে পাগল করে
মরি হায় হায় হায়.... "

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

খুব চেনা লাগছে? একদম ঠিক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা, বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি"। এছাড়াও লক্ষন ভাণ্ডারীর লেখা "আম গাছের ব্যাথা", মোহম্মদ ইরফানের লেখা "পাকা আম, আমরসে টইটম্বুর দুটি কবিতা। কিন্তু কি আশ্চর্য, আমের প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার "কাঁচা আম " কবিতা টি শুরু করেছিলেন...."তিনটি কাঁচা আমপড়েছিল গাছের তলায়.... " দিয়ে, আরঠিক একই নামে, কাজী নজরুল ইসলাম তার ছড়া "কাঁচা আম" ছড়ায় লেখেন..

" কাঁচা আমগাছে ঝুলে
দেখে জিভে ভরে জল
আয়তোরা আমতলে
এলোমেলো ঝড় কড়-মড়
দুটো আমঝরে পড়ে
ভর্তা খাবে টক-ঝালে।"

"মামা বাড়ি" কবিতায় পল্লী কবি জসিমউদ্দিন লিখছেন.....

"ঝড়ের দিনে মামার দেশে আমকুড়াতে সুখ
পাকা জামের মধুর রসে রঙীন করি মুখ"

কম যান না মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও। তিনি লিখছেন.....

"মধুমাখা ফলমোর বিখ্যাত ভুবনে
তুমি কি তা জান না ললনে"

"....দূর্গার হাতে একটা নারকেলের মালা। সেটা সে নীচু করিয়া দেখাইল, কতগুলি কচি আমকাটা,..... দূর্গা চুপিচুপি বলিলো-- তুই একটু তেল আরনুন নিয়ে আসতে পারিস? আমের কুসি জারাবো"
জানি এতক্ষণে ধরে ফেলেছেন। ঠিকই, "আম আঁটির ভেঁপু " বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরসের কি গভীর সাহিত্য স্বাদ।

আমরসকে একটু অন্য ভাবেও, খানিকটা ঘুরিয়ে বা কখনো কখনো metaphorically ব্যবহার করার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জুড়ী মেলা ভার। তিনি লিখেছেন...

"দলে দলে আসে আমের মুকুল
বনে বনে দেয় সাড়া"

আবার তিনিই লিখেছেন, "সাধারণতঃ স্ত্রীজাতি কাঁচা আম ঝাল লঙ্কা, এবং কড়া স্বামীই ভালবাসে"। আবার জীবনস্মৃতি গ্রন্থের "ভারতী" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন.. "কাঁচা আমের রসটা অম্লরস- কাঁচা সমালোচনাটাও গালিগালাজ "। এমন ই গভীর আমরস।

পাড়া যাই হোক না কেন, এ বা ও, দুপাড়ার ই সাহিত্যের মাটি আমরসে সিক্ত। আমরসের প্রভাব শুধুমাত্র পেটেই না, সাহিত্য আরহৃদয়ের অনেক গভীরে।

পর্ব - ৬

নটে গাছটি মুড়োলো

যে আমটির কথা, "আমকথা" র শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, একবারও উল্লেখ করি নি, সেই আমটির নাম হিমসাগর। কারণ, মিষ্টি তো শেষ পাতের জন্যই। এই সবথেকে সুস্বাদু আমটিই যে আমার প্রিয় তা কি আরবলবার অপেক্ষা রাখে??

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো লিখেইছিলেন.....

"আমসত্ত্ব দুধে ফেলি,
তাহাতে কদলী দলি,
সন্দেশ মাখিয়া তাতে -
হাপুস হুপুস শব্দ
চারিদিক নিস্তব্ধ
পিঁপড়া কাঁদিয়া যায় পাতে। "

বাড়ির গাছের পাকা হিমসাগর আমের নির্ভেজাল আমসত্ত্ব। লালমোহন বাবু এটা পেলে নিশ্চিত ভাবে বলতেন " এটা আমার...."। আর আমিও বলছি.... "এটা ……..

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

একানব্বই বছরে টিনটিন -- কিছু কথা ও আলোচনা

উত্তীয় ভট্টাচার্য্য

টিনটিন স্রষ্টা জর্জ রেমি বা হার্জের নামটা মনে আসলেই আমার মাথায় প্রেমেন্দ্র মিত্তিরের নাম আসে। দুজনের লেখনী, স্টাইল, জীবন ও যাপন... প্রায় কোনোকিছুতেই বিন্দুমাত্র মিল না থাকলেও একটা বিষয়ে দুজনেরই অদ্ভুত রকমের মিল। প্রেমেন্দ্রবাবু যেমন নিজে যে জায়গাগুলোয় কখনো যেতে পারেননি, সেসব জায়গায় নিয়ে নিয়ে গেছেন ঘনাদাকে। নিজে না গিয়েও পাঠককে ঘনাদার সাথে নিয়ে গেছেন মানসভ্রমণে কখনো জার্মানি, কখনো পেরু, অস্ট্রেলিয়া কখনো বা নাম না শোনা দ্বীপপুঞ্জে, কখনো ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির মুখের ভেতর। ঠিক তেমনই হলেন হার্জ। তিনি নিজে যে জায়গাগুলোয় যাননি, সেই জায়গাগুলোতেই নিয়ে গেছেন টিনটিনকে। কঙ্গো, সোভিয়েত রাশিয়া, মিশর, পেরু, নেপাল, তিব্বত, ভারত... সমস্ত জায়গায় টিনটিনের অভিযানের কাহিনী পড়ি, আর হার্জের অদ্ভুত ডিটেলিং প্রেমেন্দ্র মিত্রকে মনে করায়।

টিনটিন আমার পড়া সেই বিরল সিরিজগুলোর একটা, যার বাংলা অনুবাদ আমার কাছে সমানভাবে প্রিয়। টিনটিনের সর্বক্ষণের সঙ্গী ফক্স টেরিয়ারের নাম ফ্রেঞ্চে মিলু থেকে ইংরেজিতে স্নোয়ি হয়ে বাংলায় হয় কুট্টুস, থমসন-থম্পসন হয়ে যায় জনসন-রনসন, ক্যাপ্টেন হ্যাডক মাঝেমাঝেই চেঁচিয়ে ওঠেন, " বেআক্কেলে উল্লুক মর্কট " কিংবা "উড়ন্ত গর্জনশীল টাইফুন" অথবা আমার ফেভারিট "জ্বালা ধরানো কোটি কোটি ফোসকা" । নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ঝরঝরে প্রাণবন্ত অনুবাদের ফলে টিনটিন হয়ে ওঠে পাশের বাড়ির ছেলে। বেলজিয়াম এসে যায় বাড়ির পাশে। ছোটবেলার একটা দীর্ঘ সময় ভেবে এসেছিলাম টিনটিন আসলে বাঙালিই।

টিনটিনকে বাঙালির কাছে বিখ্যাত করার পথিকৃত আনন্দমেলা হলেও এর পেছনে আসল কারিগর কিন্তু সত্যজিৎ রায়। তখন আনন্দমেলার সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথবাবু এমন কোনো কমিক্স ধারাবাহিক ভাবে ছাপতে চাইছিলেন যেটা পড়ে ছোটরা আনন্দও পায়, আবার বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানও অর্জন করে। সত্যজিৎ রায়কে একথা বলতেই তিনি সাজেস্ট করেন টিনটিনের নাম। সেই থেকে শুরু হয় আনন্দমেলায় টিনটিনের যাত্রা। দু-পাতা টিনটিনের কমিক্সের জন্য পনেরো দিন অপেক্ষা করে বসে থাকা... সে এক কঠিন সময় ছিল বইকি !

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

সালে টিনটিনের পথ চলা শুরু " সোভিয়েত দেশে টিনটিন" - এর মাধ্যমে । 24 টা কমিক্স নিয়ে তৈরী টিনটিন সিরিজ যেকোনো কিশোরেরই প্রিয় । তবে কিশোরসাহিত্য হলেও টিনটিনেরও বেশ কিছু গল্প সম্পূর্ণভাবে পলিটিক্যাল, বিতর্কিত এবং কোথাও বা সমালোচিত । দুটো কমিক্স নিয়ে আলোচনা করলেই ব্যাপারটা খানিকটা পরিষ্কার হবে । প্রথমটি হল সোভিয়েত দেশে টিনটিন, দ্বিতীয়টি বিপ্লবীদের দঙ্গলে ।

প্রথমটিতে আমরা দেখি কমিউনিস্ট এক নেতা জনসাধারণের দিকে বন্দুক তাক করে বলছে, " যারা এই তালিকার বিরুদ্ধে আছো... তারা হাত তোলো... " ভীত জনগণ স্বভাবতই হাত তুললো না । তখন নেতাটি খুশি হয়ে বললেন, " কেউ নেই? তা হলে ঘোষণা করছি কমিউনিস্ট দলের প্রার্থীরাই সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হল । " হার্জ নিজে একটা দীর্ঘ সময়ে রাশিয়ার কমিউনিজমের বিরোধী ছিলেন । সোভিয়েত দেশে টিনটিনের অনেক জায়গাতেই সেই প্রভাব লক্ষ্য করা যায় । আবার মুসোলিনির অ্যান্টি- কমিউনিস্ট প্রোপাগান্ডাও এর একটি কারণ হতে পারে ।

এবার আসা যাক বিপ্লবীদের দঙ্গলের কথায় । হার্জ সেখানে মাত্র দুটো চিত্র দিয়ে চমৎকার এক মেসেজ তুলে ধরেছেন । গল্পের বিষয়বস্তু হল নিজের বন্ধুদের বাঁচাতে অত্যাচারি জেনারেল টাপিওকাকে সরিয়ে টিনটিন গদিতে বসালো আলকাজারকে । বদলে গেল শাসক, দেশের পতাকা, সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম । কিন্তু দেখা গেল মানুষগুলো টাপিওকার আমলে যেমন থাকতো, এখনই তেমনই থেকে গেল... ভাঙাচোরা ঘরবাড়ি, শতছিন্ন জামাকাপড়, দারিদ্র চারিদিকে । নতুন শাসক এলো, কিন্তু সান থিওডোরাসের মানুষ যে তিমিরে ছিল , সেখানেই রইল । ও হ্যাঁ, বিপ্লবীদের দঙ্গলে টিনটিন কিন্তু আরেকটা কারণেও আলাদা । এখানে কিন্তু এক জায়গায় দেখা গেছিল অ্যাসটেরিক্সকে ।

এছাড়াও কঙ্গোয় টিনটিন , তিব্বতে টিনটিন এগুলো একটু গভীরভাবে দেখলে সূক্ষ্ম রেসিজম খুঁজে পাওয়া যাবে । সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে কঙ্গোয় টিনটিনে ।কালো মানুষদের ফুটিয়ে তোলা, তাঁদের কাজকর্ম, কথা বলা... সবেতেই নেগেটিভিটির ছাপ স্পষ্ট । হার্জ প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস করতেন ম্যাজিক, অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃততে । অন্যান্য বহু ইউরোপীয়ের মতো তাঁরও ধারণা ছিল যে ভারত ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া দেশগুলি ব্ল্যাক- ম্যাজিক, দড়ি- খেলা, সাপুড়ে ইত্যাদির আখড়া । সেজন্য তাঁর কমিক্সে ভারতে খালি দেখা মেলে শিখ নয় দেহাতি কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের ।

পরবর্তীতে অবশ্য নিজেকে শুধরে নেন হার্জ । এবং নিজেকে শুধরে নেওয়ার কারণেই তিনি অনন্য । টিনটিনের পরের দিকের কমিক্সে অনেকটাই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায় তাঁর । যদিও আমেরিকায় টিনটিনে পুঁজিবাদী আমেরিকার ধনতান্ত্রিক মনোভাবকে তুলোধোনা করা

সিরিয়াস পাঠকের চোখ এড়াবে না । তেল নিয়ে আমেরিকার আগ্রাসন, রেড ইন্ডিয়ানদের হটিয়ে দেওয়া ...হার্জের গল্পে এসেছে নানা পলিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল । সেজন্যই কিশোর সাহিত্য হলেও টিনটিন অনেকটা হ্যারি পটারের মতোই একটি ডিপলি পলিটিক্যাল একটি সিরিজ।

টিনটিনের পোশাক নিয়ে একটা ছোট্ট তথ্য না দিলেই নয় । নিজের নীল শার্টের ওপরে মাঝেমাঝেই একটি খয়েরি কোট পরতে দেখা যায় টিনটিনকে । এই কোটগুলির নাম ট্রেঞ্চকোট। যুদ্ধের সময়ে ট্রেঞ্চে থাকাকালীন সৈনিকরা পরতো এই ধরণের কোট (যে কারণে ট্রেঞ্চকোট নাম), শীত ও বর্ষার হাত থেকে বাঁচার জন্য । ব্রিটিশ কোম্পানি বারবেরি এই ধরণের কোট জনসাধারণের পরার উপযোগী করে বাজারে নিয়ে আসে । মারাত্মক বিখ্যাত হয় সেই কোট । টিনটিনও এই ট্রেঞ্চকোটই কিন্তু পরে ।

লাল বোম্বেটের গুপ্তধন আমার অন্যতম প্রিয়, কারণ এখানেই প্রথম আসে অন্যতম প্রিয় চরিত্র প্রফেসর ক্যালকুলাস । যদিও হার্জ ক্যালকুলাস নামটি ব্যবহার করেননি । ফ্রেঞ্চে তাঁর নাম ছিল টুর্নেসল । ইংরেজিতে অনুবাদের সময় তা বদলে দাঁড়ায় ক্যালকুলাসে । জিনিয়াস কিন্তু প্রায় কালা এই বিজ্ঞানীর অমায়িকতা বড্ড স্পর্শ করে কিশোরমনকে । গোঁয়ার, হঠকারী ক্যাপ্টেন হ্যাডকের বারবার ক্যালকুলাসের কাছে জব্দ হওয়াও হাসির উদ্রেক ঘটায় । ক্যালকুলাস পাতায় এলেই কেমন যেন মনটা ভালো হয়ে যায়, যেমন হয়ে যায় কাঁকড়া রহস্যে প্রথম ক্যাপ্টেন হ্যাডককে দেখে, কিংবা দমফাটা হাসি পায় কৃষ্ণদ্বীপের রহস্যে টিনটিনকে স্কার্ট পরতে দেখে ।

টিনটিনের কোনো কমিক্সকেই খারাপ বলা যাবে না । বরং অনাবিল আনন্দ দেয় প্রত্যেকটাই । সূর্যদেবের বন্দী, পান্না কোথায় , চন্দ্রালোকে অভিযান , চাঁদে টিনটিন, ক্যালকুলাসের কান্ড, কালো সোনার দেশে, নীলকমল... প্রত্যেক কটাই অসাধারণ । কোনটা ছেড়ে কোনটা বলি !

আরেকটা কথা । টিনটিন কিন্তু চাঁদে পা রেখেছিল 1954 সালে । নিল আর্মস্ট্রঙ্গের পনেরো বছর আগে । তাই এবার থেকে যখন কেউ জিজ্ঞাসা করবে চাঁদে পা দেওয়া প্রথম মানুষের নাম, সঠিক জবাবটা কিন্তু টিনটিন হবে ।

টিনটিনের সাথে আমার সম্পর্ক সেই ছোটবেলা থেকে । আগেই বলেছি, টিনটিন আমার কাছে বাড়ির পাশের ছেলেটার মত, সে যতই সে ল্য পেটিট কাগজের সাংবাদিক হোক না কেন ! তার অভিযানে সঙ্গী হয়েছি আমিও । টিনটিন ফারাওয়ের চুরুটে শয়তান রাস্তাপপুলাসকে শায়েস্তা করলে মনে হয়েছে আমি নিজেও জিতে গেছি । তাই এহেন বন্ধুর জন্মদিন আসবে, আর কিছু লিখবো না, এমন কি হয়?

একানব্বই হয়ে গেল । সেঞ্চুরি, ডাবল সেঞ্চুরি, ট্রিপল... কত পথ পড়ে সামনে । সব আসবে । ক্যাপ্টেন হ্যাডক, প্রফেসর ক্যালকুলাস, কুট্টুস, নেস্টর, জনসন-রনসন, বিখ্যাত গায়িকা বিয়াঙ্কা কাস্তাফিওর, বন্ধু চ্যাং, দুরন্ত আবদুল্লা এবং আরো সবাইকে নিয়ে ইউনিকর্ন জাহাজের মত দেখতে কেক কাটা হবে মার্লিন স্পাইক হলে । নেপথ্যে পাশাপাশি কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন হার্জ আর নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

শুভ জন্মদিন, টিনটিন ।

(ছবি ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত)

"কলরবে কাহন যাত্রা"

আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষণায়

অরুণ কুমার ঘোষ

এবারের গ্রামঃ রাহানা

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

রাহানা

অরুণ কুমার ঘোষ
(আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক ও লেখক)

ভূমিকা: আমডাঙা ব্লকের একটি বৃহৎ গ্রাম হল রাহানা। আর সেই কারণেই রাহানাকে দুটি অংশে ভাগ করা হয়েছে- রাহানা-১ ও রাহানা-২। দুটি অংশ মিলিয়ে ছয় শতাধিক পরিবারের বাস। মুসলিম প্রধান গ্রাম হলেও এখানে বেশ কয়েক ঘর হিন্দুও বাস করে। বর্তমানে সেই কয়েক ঘর হিন্দু থেকে রীতিমতো একটি পাড়ার আকার ধারণ করেছে। এই হিন্দুরা মূলত 'কাহার' সম্প্রদায়ের তবে ২/৩ ঘর দাস (ঋষিদাস) সম্প্রদায়ের হিন্দুও বাস করে। রাহানা গ্রামটি শিক্ষা-দীক্ষায় যে প্রথম সারিতে পড়ে তা বোধহয় বলার অপেক্ষা রাখে না। ২০১১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী এই গ্রামে শিক্ষিতের হার উল্লেখ করার মতো - পুরুষ ৮৩.৯২ শতাংশ এবং মহিলা ৭৬.৮৭ শতাংশ। শিক্ষার সঙ্গে সমৃদ্ধি তথা উন্নয়নও অঙ্গাঙ্গিকভাবে যুক্ত তা রাহানা গ্রামে ঢুকলেই বোঝা যায়।

নামকরণ: 'রাহা' (ফা. রাহ্) বি. রাস্তা; পথ ২। উদ্ধারের পথ; মুক্তিপথ ৩। উপায়; চারা ৪। জাতীয় উপাধিবি : ৫। মূল্য নির্ধারণ - বাঙ্গালা ভাষার অভিধান। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

'রাহা'র সঙ্গে নেতিবাচক শব্দ 'না' যুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ রাহা + না = রাহানা। 'রাহানা' শব্দটি এইভাবে গঠিত হয়েছে রাস্তা বা পথ বা উপায় না পাওয়া। অর্থাৎ যেখানকার মানুষের কোন পথ/রাস্তা/উপায় নেই। অর্থাৎ যেখানে নিরুপায় অবস্থায় অবস্থান করে মানুষ। পথহীন/ উপায়হীন স্থান হল রাহানা। ৩৪ নং জাতীয় সড়কের গা-ঘেঁষে একটি সুসমৃদ্ধ সুবৃহৎ জনপদ কীভাবে উপায়হীন/ পথহীন হতে পারে? আর সেটা যদি আক্ষরিক অর্থে হত তাহলে এই বিশাল জনপদ গড়ে উঠলো কীভাবে? কোন্ যুক্তিতে? পথ-ঘাট, উপায়হীন বদ্ধ স্থানে কোন্ দুঃখে মানুষ বাস করতে যাবে?- এ এক মারাত্মক প্রশ্ন। 'রাহানা' কথার অর্থ এমনটা ধরলে 'রাহানা' তাৎপর্যহীন এক পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। 'রাহা' শব্দের অর্থ যদি 'উদ্ধারের পথ' বা 'মুক্তির পথ' হয় তবে 'রাহানা' শব্দের

অর্থ দাঁড়ায় ' উদ্ধারের পথহীন' বা ' মুক্তির পথহীন' । অর্থাৎ যেখান থেকে উদ্ধার পাবার বা মুক্তি পাবার কোন উপায় নেই- এক অবরুদ্ধ স্থান।

' রাহা' শব্দের চতুর্থ অর্থ হল- ' জাতীয় উপাধিবিঃ' । যেখানকার মানুষের কোন জাতীয় উপাধি নেই, নেই কোন নামডাক সেই স্থানই হল ' রাহানা' । শিক্ষা-দীক্ষা, সমৃদ্ধিতে রাহানা জনপদ বর্তমানে এক ঈর্ষণীয় জায়গায় পৌঁছে গেছে। সেই রাহানার মানুষ সুদূর অতীতে নাম-গোত্র, পরিচয়হীন ছিল তা ভাবতেও কষ্ট হয় বইকি! ' রাহা' শব্দের পঞ্চম অর্থ ' মূল্য নির্ধারণ' আর ' রাহানা' শব্দের অর্থ মূল্য নির্ধারণহীন। অর্থাৎ যার মূল্য নির্ধারিত হয়নি। রাহানা জনপদ নামকরণের ক্ষেত্রে এমনটা বোধহয় প্রযোজ্য নয়। তাহলে? রাহানা জনপদের ' রাহানা' কোন অর্থে প্রযোজ্য? যত গন্ডগোলের মূলে আছে একটি নেতিবাচক শব্দ ' না' । ' না' টা না থাকলে আমাদের আর এত চিন্তা করতে হত না, রাহা' র অনেকগুলো অর্থের যে কোন একটি ঠিক খাপ খেয়ে যেত কিন্তু বিধি বাম! যত নষ্টের মূল এই ছোট্ট ' না' ।

' রাহানা' নামকরণের ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে রাহানা' র প্রাক্তন শিক্ষক কামরুল সাহেব বলেন যে, সুদূর অতীত থেকেই এই জনপদটি ছিল শিক্ষা-দীক্ষা-জ্ঞান-মহিমায় শীর্ষস্থানে। ' না' বলে কোন শব্দ এই জনপদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হত না। অর্থাৎ ' সব পেয়েছি' র দেশ হল ' রাহানা' । আর পথহীন-উপায়হীনের পথ ও উপায় হল এই স্থান। আর সেই জন্যই এ ' রাহানা' । আপাত ' রাহানা' শব্দটি নেতিবাচক কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এটি একটি গূঢ় অর্থবহ ইতিবাচক শব্দ।

চতুঃসীমা: উত্তরে হিসাবী, দক্ষিণে আমডাঙা(রংমহল), পূর্বে সোলেমানপুর ও পশ্চিমে রামপুর অবস্থিত।

যোগাযোগ ব্যবস্থা: রাহানার বুক চিরে ৩৪নং জাতীয় সড়ক উত্তর-দক্ষিণে চলে গেছে। এই গ্রামটির (দুদিক থেকেই) ১ কিমি এর মধ্যে ৩৪ নং জাতীয় সড়ক। জাতীয় সড়কের উভয় পাশেই রাহানা বাস-ষ্টপেজ অবস্থিত। মুহুর্মুহু বাস-অটো-টোটোসহ অসংখ্য যানবাহন সহজলভ্য। আর এই সহজলভ্য যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্যই বোধ করি শিক্ষা-দীক্ষায় এই গ্রামটি এত উন্নত। কলকাতা-জাগুলি বা কলকাতা-

কৃষ্ণনগর গামী যেকোনো বাসে উঠে রাহানা মোড়ে নেমে রাহানা-১ ও রাহানা-২ গ্রামে ঢোকে যায়।

নানা সম্প্রদায়ের কথা: আগেই বলেছি রাহানা মুসলিম অধ্যুষিত গ্রাম- উচ্চ অভিজাত মুসলিম সম্প্রদায়ের বাস। এছাড়া এখানে বাস করে কয়েক ঘর ' কাহার' ও ' দাস' উপাধিধারী তথাকথিত নিম্ন সম্প্রদায়ের মানুষ। ' চক্রবর্তী' উপাধিধারী একঘর ব্রাহ্মণও বাস করে তবে এই পরিবারটি স্বাধীনতার পর বিনিময় করে এখানে এসেছে।

আদি বাসিন্দা: রাহানা গ্রামে আদিবাসীদের মধ্যে ভুলু মোড়ল, আফতাব উদ্দিন হাজী, জুম্মান হাজী, মহম্মদ হাজীর বংশধরেরাই উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত পরিবারের পূর্ব পুরুষেরা কবে, কোথা থেকে এসে এখানে বসতি গড়ে তুলেছিল তা আজ আর জানা যায় না।

ভুলু মোড়লের কথা: রাহানার আদিবাসীদের মধ্যে প্রথমেই ভুলু মোড়লের কথা উল্লেখ করতে হয়। ভুলু মোড়লের ' ভুলু' নামটি যে প্রকৃত নাম নয় তাতে কোন সন্দেহ নেই তবে তাঁর প্রকৃত নাম কি ছিল তাও জানা যায় না। একান্ত সাক্ষাৎকারে ভুলু মোড়লের প্রকৃত নাম সম্পর্কে জানতে চাইলে তাঁর অন্যতম নাতি সেখ সাইফুদ্দিন মাস্টার বলেন- ' আমিও আমার দাদা' র(পিতামহ) নাম ভুলু মোড়ল হিসাবেই জেনে আসছি। এমনকি জমিদারির(গাঁতিদারি) দলিল- দস্তাবেজেও তিনি ' ভুলু মোড়ল' নামেই পরিচিত। তবে তিনি লিখতেন সেখ ভুলু মোড়ল।' সাইফুদ্দিন সাহেবের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, এই গ্রামের জমিদার (আসলে গাঁতিদার) ছিলেন দোর্দণ্ড প্রতাপী ভুলু মোড়ল। তিনি কীভাবে জমিদারি (গাঁতিদারি) লাভ করেছিলেন তা কিন্তু জানা যায় না। যেভাবেই তা লাভ করুন না কেন, জমিদার ভুলু মোড়ল কয়েকশো বিঘা ভূ- সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। গোবরডাঙ্গার জমিদারের অধীনে ' মধ্যস্বত্বভোগী' হিসাবে ছিলেন। গোবরডাঙ্গার জমিদারবাবুরা মাঝে মাঝেই তাঁর বাড়িতে ' পদধূলি' দিতেন। ভুলু মোড়ল তাঁর কাছারি বাড়িতে বাবুদের আদর- আপ্যায়নের কোন ত্রুটি রাখতেন না- খানা- পিনা- গানা- আমোদ- আহ্লাদ সবই হতো। বাবুরা খুশি হয়ে ' নজরানা' নিয়ে ফিরে যেতেন।

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

জমিদারি সীমানা: কয়েকশো বিঘা ভূসম্পত্তির মালিক ছিলেন ভুলু মোড়ল তা আগেই উল্লেখ করেছি। এই বিপুল পরিমাণে ভূ-সম্পত্তির একটা অংশ নিজে রেখে দিয়ে বাকি সিংহভাগই তিনি প্রজাবিলি করেছিলেন বেশকিছু গ্রামে। সেসব গ্রামের মধ্যে রাহানা, রামপুর, আমডাঙ্গা, মথুরাপুর, কৈপুকুর অন্যতম। এইসব গ্রামের খাজনা আদায় করবার জন্য কর্মচারী ছিল আর হিসাব-নিকাশ করবার জন্য ছিল নায়েব-গোমস্তা। ছিল সুদৃশ্য ' দলুজ' সেখানে দিনের বেলা কাছারি বসত আর রাতের বেলা সেটা ' শালিসি ঘর' হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এই শালিসি ঘরে হতো আলাপ-আলোচনা আর বিচার-শালিসি। তৎকালীন সময়ে ভুলু মোড়ল ছিলেন রাহানা গ্রামের একজন দোর্দণ্ড প্রতাপী জমিদার। তাঁর বিক্রমে বাঘে-বলদে একঘাটে জল খেত। তাঁর ভয়ে প্রজারা সর্বদা তটস্থ হয়ে থাকত, পান থেকে চুন খসার উপায় ছিলনা। অপরাধীর প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর মানুষ। কোন অজুহাতেই অপরাধী তথা অন্যায়কারীকে ছেড়ে দিতেন না। দলুজখানায় বাদী-বিবাদী উভয়কেই ডেকে পাঠাতেন। প্রত্যেকের অভিযোগ খুব মন দিয়ে শুনতেন। তারপর বিচার করে সিদ্ধান্তে আসতেন। অপরাধীর অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী শাস্তি মিলত। ভুলু মোড়লের রায় দানের পর কারো কোনো ট্যা-ফোঁ করবার এতটুকু সাহস হত না। ' জমিদারবাবু' র শাস্তি-জরিমানা মাথা পেতে নিয়ে যে যার বাড়ি ফিরে যেত।

আগেই বলেছি, ভুলু মোড়ল একজন দোর্দণ্ড প্রতাপী জমিদার ছিলেন আর সেই জমিদারি রক্ষার্থে লাঠিয়াল পুষেছিলেন। নিজে ছিলেন দুঃসাহসিক-বেপরোয়া এবং মামলাবাজ। তাঁর স্বার্থে ঘা লাগলে তিনি কাউকে ছেড়ে কথা বলতেন না, এমনকি তাঁর উপরের জমিদার গোবরডাঙ্গার জমিদারদেরও ছেড়ে কথা বলতেন না। প্রয়োজনে তিনি তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেন। এমনকি প্রয়োজনে মামলাতে লড়তেও পিছপা হতেন না। এরকম এক মামলার কাহিনী শুনিয়েছিলেন তাঁরই অন্যতম উত্তরসূরী সেখ ইফতিকারুল। কাহিনীটা এরকম- গোবরডাঙ্গার জমিদার বাবুদের সঙ্গে ভুলু মোড়লের দহরম মহরম থাকলেও স্বার্থের ক্ষেত্রে ভুলু মোড়ল ছেড়ে কথা বলতেন না। কোন একবার জমিজমা সংক্রান্ত ঝামেলা বাধে। সেই ঝামেলা আদালত পর্যন্ত গড়ায়। শুরু হয় মামলা। কেউ কম যাননি- এদিকে গোবরডাঙ্গার দোর্দণ্ড প্রতাপী জমিদার আর অন্যদিকে আমডাঙা-রাহানার প্রবল বিক্রমী গাঁতিদার ভুলু মোড়ল। কেউই হার স্বীকার করতে চান না। তাতে যতদিন মামলা চলে চলুক। হ্যাঁ, দীর্ঘ ১২বছর মামলা চলেছিল। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই- মামলায় ভুলু মোড়ল জিতে গেলেন। জয়ের আনন্দে মহাভোজ দিলেন। আনন্দ-উৎসব করলেন। গোবরডাঙ্গার

বাবুদের তা কানে গেল। একে মামলায় পরাজয় তার ওপর এমন মহোৎসব- জমিদার বাবুরা রাগে ফেটে পড়লেন। সামনে পেলেই ভুলু মোড়লকে গুলি করে মারেন। একদিন সুযোগও এসে গেল-

ভুলু মোড়লের মামলা জয়ের খবর জমিদারবাবুদের মায়ের কানেও চলে গেল। তিনি এই ভুলু মোড়লকে দেখতে আগ্রহী হলেন। একদিন খবর পাঠানো হল ভুলু মোড়লের কাছে। জমিদারের মা ডেকে পাঠিয়েছেন ভুলু মোড়ল না গিয়ে পারলেন না। জমিদার বাড়িতে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই ' সেজবাবু' জানতে পারলেন। আর যায় কোথায়? ভুলু মোড়লকে দেখেই তিনি ভয়ঙ্কর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন, হাতে তুলে নিলেন বন্দুক। ভুলু মোড়লকে খতম করেই ছাড়বেন। সেজবাবুর মা সেখানেই ছিলেন, কি ঘটতে চলেছে তাঁর বুঝতে এতোটুকু বাকি রইল না। মুহূর্ত দেরি না করে ছেলের সামনে এসে দাঁড়ালেন, হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে চিৎকার করে উঠলেন- ' না! এঁকে মারতে পারবি না। আজ ইনি আমার অতিথি। আমিই ডেকে এনেছি। এই অতিথিকে রক্ষা করা আমার দায়িত্ব।'

মায়ের এহেন রূপ দেখে দোর্দণ্ড প্রতাপী সেজবাবু একেবারে চুপ হয়ে গেলেন। আর উচ্চবাচ্য না করে অন্যত্র চলে গেলেন। ভুলু মোড়ল সে যাত্রায় বেঁচে গেলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জমিদার -গিন্নি তথা সেজবাবুর মা তদ্বির করে ভুলু মোড়লকে মধ্যাহ্ন ভোজ করিয়ে তবেই ছেড়েছিলেন।

জমিদার মহল: গ্রামের জমিদার বলে কথা- ঠাঁট-বাট তো সেইরকম হওয়া চাই! তা নাহলে প্রজারা সমীহ করে চলবে কেন? জমিদার বলে মান্য করবে কেন ? আর তা ছাড়া জমিদারের ' আভিজাত্য' বলে একটা কথা আছে- সেটাতো মেইন্টেইন করে চলতে হবে! আর সেই কারনেই অন্যান্য জমিদারের মত ভুলু মোড়লও বিশাল এক মহল নির্মাণ করেছিলেন। সেইসময়ে ইট-ভাটা ছিল না অথচ একটা ' মহল' নির্মাণ করতে বিপুল পরিমাণে ইটের প্রয়োজন। উপায়? সেই প্রাচীন পদ্ধতি- পাঁজা পুড়িয়ে ইট তৈরি। ভুলু মোড়লও তাই করলেন। বাইরে থেকে লোক আনিয়ে, মাটি কাটিয়ে পাঁজা পোড়ালেন। এত বিপুল পরিমাণে পাঁজা পোড়ানো হয়েছিল যে, সেই মাটি কাটা জায়গাটায় বিশাল এক পুকুরই হয়ে গেল। নাম হল ' ইটখোলার পুকুর' । চল্লিশ শতক জমির সেই পুকুরটি এখনও আছে। পাঁজা পুড়ল, ইট হল আর সেই ইট দিয়ে মানুষ

সমান ভিত দিয়ে নির্মিত হল মহল- ভুলু মোড়লের জমিদার বাড়ি। নির্মিত হল বিশাল এক 'দুলুজ' (বৈঠকখানা যা কাছারি হিসেবে ব্যবহৃত হত)। সেই মহল এবং দুলুজ অতীতের সাক্ষী হয়ে সার্ধশতবর্ষের জীর্ণ-শীর্ণ অবয়ব নিয়ে এখনও দাঁড়িয়ে আছে। দোর্দণ্ড প্রতাপী জমিদার ভুলু মোড়লের নীরব সাক্ষ্য দিয়ে চলেছে। মোড়লের উত্তরসূরীরা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে বেশিরভাগই আধুনিক দালান-কোঠা নির্মাণ করে বাস করছেন। একটি শরিক সেই 'মোড়ল-মহল' আগলে পড়ে আছে। মহলটার দিকে তাকালেই মনে হয়-অতীতের কাঠামোয় বর্তমানের জীবন স্পন্দন!

কৃষিকাজ: ভুলু মোড়ল শুধু ছড়ি ঘুরিয়েই জমিদারি চালাননি, রীতিমতো তিনি স্বয়ং কৃষিকাজও করেছেন। তবে সেটা ধনী কৃষকের কৃষিকাজ। শেখ সাইফুদ্দিন সাহেবের বক্তব্য অনুযায়ী, ভুলু মোড়ল এতবড় একজন কৃষক ছিলেন যে, তাঁর কয়েক জোড়া বিশালাকৃতির বলদ ছিল যে বলদগুলো কিনে আনা হয়েছিল বিহারের শোনপুর মেলা থেকে। নিজ দখলে রাখা বিপুল পরিমাণে কৃষিজমি সেইসব বলদের সাহায্যে চাষবাস করা হতো। কৃষিকাজের জন্য ১২/১৫ জন কৃষিমজুর সারা বছর ধরে রাখা হত। মোড়লের ছিল বিশাল আকৃতির গোয়ালঘর, ছিল গোয়াল-ভরতি দুধালো গাভী। এইসব গাভীদের দেখাশোনা করবার জন্য রাখা হয়েছিল একাধিক 'মাহিন্দার' ও অন্য কাজের লোক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শুধুমাত্র মোড়ল বাড়ির দুধের চাহিদা মেটাবার জন্যই এসব গাভী পোষা হয়েছিল। কথিত আছে, প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় দুধ ছাড়া অতিরিক্ত দুধ শানের ঘাটে ফেলে দেওয়া হতো আর এই ফেলার কাজটি মোড়ল -গিন্নি স্বয়ং করতেন। দুধের মত এমন পুষ্টিকর, মূল্যবান খাদ্যটি কেন ফেলে দিতেন তার কোনো ব্যাখ্যা মেলেনি।

ভুলু মোড়লের গুপ্তধন: ভুলু মোড়লের বিপুল পরিমাণে কৃষিকাজ ছিল তা আগেই উল্লেখ করেছি। সেই বিপুল পরিমাণ কৃষিকাজের ফলস্বরূপ বিপুল পরিমাণে ধান উৎপাদিত হতো। সেই উৎপাদিত ধান রাখার জন্য ছিল ৯টি সুদৃশ্য ধানের গোলা। গোলাগুলো উঠানে সারি সারি বসানো ছিল। গোলাগুলো ধানে ভরে যেত। সেই ধান সারা বছর ধরে বিক্রি করা হতো। রফিপুর, রন্ধনগাছা, আমডাঙ্গা ইত্যাদি গ্রামের ধান-ব্যবসায়ীরা ধান কিনতে আসত। এই ধান বিক্রয়কে কেন্দ্র করেই একবার ঘটে গেল এক অভাবিত-অত্যাশ্চর্য ঘটনা। ঘটনাটা এই রকম -

তখন ভুলু মোড়লের এন্তেকাল হয়ে গেছে। কিন্তু কোন কিছু থেমে নেই, আগের মতই চাষবাস ইত্যাদি কাজকর্ম চলছে। ধান বিক্রিবাটাও চলছে। সেবারও ব্যবসায়ীরা ধান কিনতে এসেছে। কথাবার্তা সেটেল হবার পর তারা গোলায় ঠেলে উঠেছে। বস্তা-ভরতি করে তারা গোলা থেকে ধান নামিয়ে আনছে। প্রচুর ধান - সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। একদিনে আর কত বস্তা নেওয়া যায়! কিন্তু ঘটনা হল এই -

তারা যে পরিমাণে একদিনে ধান নিয়ে থাকে এবার তার তুলনায় কয়েক গুণ নিয়ে গেল। শুধু তাই নয়, মোড়লবাড়ির আপাত আর ধান বিক্রির প্রয়োজন না থাকলেও ব্যবসায়ীরা যেতে আসতে লাগলো এবং বারবার তাগাদা দিতে লাগলো যাতে আবার ধান বিক্রি করে। ভুলু মোড়লের উত্তরসূরীদের সাফ কথা- এখন আর তাঁরা ধান বিক্রি করবেন না। কিন্তু কে শোনে সে কথা! ব্যবসায়ীরা এখানকার সব ধানই কিনে নিয়ে যেতে চায়, প্রয়োজনে কিছু দাম বেশি দিয়েও। তাতেও জমিদার বাড়ির 'বাবু'রা রাজি নন। তাঁদের একটাই কথা- প্রয়োজন হলে ডেকে পাঠিয়ে ধান দেবেন। না, একথাও ব্যবসায়ীরা শুনতে চাইল না- তারা এবার অন্য পথ ধরল- তৎকালীন ধানের বাজারে দর যা ছিল তার কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিল। জমিদার বাড়ির লোক তো তা শুনে অবাক- এরা বলে কি! পাঁচ টাকার ধান পঞ্চাশ টাকায় কিনবে? মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? 'বাবু'দের এহেন মন্তব্যে ব্যবসায়ীরা বলে যে, তারা খুব বড় অর্ডার ধরেছে, ধান লাগবেই তা সে যত চড়া দামেই হোক না কেন। বাবুরা আর কোন কথা বলেন না, তারা রাজি হয়ে যান। ব্যবসায়ীরা প্রায় গোলা খালি করে ধান কিনে নিয়ে যায়।

এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই 'বাবু'দের কানে এসে পৌঁছালো এক বিস্ময়কর খবর- সেই সব ধান ব্যবসায়ী রাতারাতি লক্ষপতি হয়ে উঠেছে। বাড়ি-গাড়ি-বিপুল পরিমাণে জমিজায়গা করে ফেলেছে। এরা যেন এক একজন ছোটখাটো জমিদারে পরিণত হয়েছে। এ যেন আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হওয়া! বিষয়টা কারো কাছেই স্বাভাবিক ঠেকলো না- সামান্য ধান-ব্যবসায়ীর হঠাৎ লক্ষপতি হয়ে ওঠা! এ তো আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ! এমন খবর কানে যেতেই 'বাবু'দের টনক নড়ে গেল। বিদ্যুৎ চমকের মত মাথায় এক চিন্তার স্রোত বয়ে গেল-তবে কি! পরপর গোলাগুলোয় ঠেলে উঠলেন। একটা গোলার ভিতরে ঢুকেই চমকে গেলেন, সবিস্ময়ে দেখলেন কিছুটা ধান পড়ে আছে আর সেই ধোনের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য 'মোহর'! বুঝতে আর এতটুকু দেরি হল না ব্যবসায়ীদের লাখপতি হবার পিছনের

ইতিহাস। বাবুরা লোক লাগিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে যে তত্ত্ব এবং তথ্য জানতে পারলেন তা রূপকথার গল্পকেও হার মানিয়ে দেবে। বিষয়টা এইরকম ----- ধান ব্যবসায়ীরা প্রতিবছর গোলা-ভরতি ধান থেকে কয়েক কুইন্টাল ধান কিনে নিয়ে যায়। গোলা সম্পূর্ণ খালি হয় না। ফলে নিচেকার ধান নিচেতেই পড়ে থাকে। ভুলু মোড়ল মারা যাবার পর ধান চাষ অনেক কমে আসে। এবার গোলার নিচে পর্যন্ত টান ধরে। আর সেখানেই ঘটে যায় বিস্ময়কর ঘটনা- ধানের নিচ থেকে মোহরের বস্তা বের হতে থাকে। সুচতুর ব্যবসায়ীরা আরো কিছু না জানিয়ে চুপিসারে সেই মোহর ধানের বস্তায় ধান সমেত ভরতি করে নেয়। বারো আনা ধান আর চার আনা মোহরে বস্তা ভরে ওঠে। এরপর দাড়িপাল্লায় ওজন করে বাড়িমুখো হাঁটা দেয়। এখন তো বুঝতে অসুবিধা নেই কেন ব্যবসায়ীরা দশ-বিশ গুণ বেশি দর দিয়ে ধান কিনে নিয়ে যেত। এসব দেখে বাবুরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন কিন্তু কিছুই করার নেই-খাঁচা থেকে পাখি উড়ে গেছে! কিন্তু প্রশ্ন হল-গোলার মধ্যে এত বিপুল পরিমাণে (কয়েক বস্তা) মোহর এলো কোথা থেকে? এই প্রশ্নের উত্তরটা পরে পাওয়া গিয়েছিল। উত্তরটা হলো এই - ভুলু মোড়ল ওরফে ভুলু ভূ- স্বামী সারা জীবন যা উপার্জন করেছিলেন সেসব মোহরে পরিবর্তিত করেছেন আর প্যাকেট বস্তা ভর্তি করে ধানের গোলায় ধানের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছেন। সেই সময়কার প্রেক্ষাপটে এটাই ছিল স্বাভাবিক, গুপ্তধন সুরক্ষিত রাখবার এত বড় নিরাপদ স্থান তৎকালে বোধ হয় আর দ্বিতীয়টি ছিলনা। ভুলু মোড়ল সেটাই করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি তাঁর উত্তরসূরী কাউকেই তা জানাননি কিংবা জানাবার অবকাশ পাননি। কালের নিয়মে একদিন তিনি চলে গেলেন, পিছনে রেখে গেলেন রাশি রাশি গুপ্তধন। আর সেই ধন ভোগে এল কিনা সামান্য ক' জন ধান ব্যবসায়ীর! একেই কি বলে ' কার কপালে কে ভোগ করে! '

রাহানার পুষ্করিণী: রাহানা গ্রামে ছোট-বড় গোটা ২০/২৫ পুকুর লক্ষ্য করা যায়। সেসবের মধ্যেই কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পুকুর হল- ১। বড়পুকুর, ২। হাটপুকুর, ৩। শানের পুকুর, ৪। নতুন পুকুর, ৫। ইটপুকুর, ৬। কামার পুকুর, ৭। জোড়াপুকুর, ৮। হাজী সাহেবের পুকুর, ৯। রহিম বক্সদের শানের পুকুর, ১০। এনামুলের পুকুর, ১১। নাসিরুদ্দিন মাস্টারের পুকুর।

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

বড়পুকুর: গ্রামের উত্তর দিকে ৩৪ নং জাতীয় সড়ক সংলগ্ন এই পুকুরটি বিশালাকৃতির পুকুর। সাড়ে তিন একর জলকর ও সাড়ে তিন একর পাড় বিশিষ্ট এই পুকুরটির মালিক হলেন সারা গ্রামের মানুষ তবে এককালে এই পুকুরের সিংহভাগটাই ছিল ভুলু মোড়লের। প্রায় বর্গক্ষেত্র এই পুকুরটি গ্রামের প্রাচীনতম পুকুর। পুকুরটি কে, কবে আর কেনই বা খনন করেছিলেন তা আজ আর জানা যায় না এমনকি বর্তমান পুকুর মালিকরাও কিছু বলতে পারেন না। এইটুকু জানা যায় যে, পুকুরটি বহুকাল ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল। পুকুরের জলের উপরে এতটাই ' দাম' জমেছিল যে, সেই দামের উপর দিয়ে মানুষ হাঁটাচলা করতে পারত। দাম সরিয়ে গ্রামের মানুষ অনেকেই মাছ ধরত। ৮/১০ কেজি ওজনের রুই-কাতলাও পাওয়া গিয়েছে এমন প্রত্যক্ষদর্শী এখনও জীবিত আছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পুকুরের পুরো পাড়টাই ' কবরস্থান' হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে বহুকাল ধরেই।

তেঁতুল-শিমুল কথা: বড় পুকুরের উত্তর-পূর্ব দিকে দুটি বিশালাকৃতির বৃক্ষ লক্ষ্য করা যায়-একটি তেঁতুল আর অন্যটি শিমুল। বৃক্ষ দুটির সারা অবয়বে প্রাচীনতার চিহ্ন বিদ্যমান। তেঁতুল- শিমুল বৃক্ষ দুটি এই গ্রামের প্রাচীনতম বৃক্ষ তা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন। বৃক্ষ দুটির বয়স জানতে চাইলে ভুলু মোড়লের উত্তরসূরী তথা তাঁর নাতি অশীতিপর বৃদ্ধ সেখ সাইফুদ্দিন সাহেব বলেন যে, তাঁর পিতাও ছোটবেলায় ওই একই রকম দেখেছেন। আদিবাসিন্দাদের অন্যতম নুর উদ্দিন সাহেব (৬০) বলেন যে, তাঁর দাদু গাছ দুটি একই রকম দেখেছেন। বৃক্ষ দুটি যে বহু প্রাচীন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তালগাছের কথা: তাল হলো গ্রাম-বাংলার অন্যতম উল্লেখযোগ্য ফলা তালগাছ হলো অন্যতম ব্যবহার্য বৃক্ষ। গ্রামে অতীতে মাটির ঘরের ' আড়া' , খুঁটি, চৌকাঠ লাঙলের শিশা, ডোঙা- নৌকাসহ অসংখ্য জিনিস তৈরি হতো তাল গাছ থেকে। পুরনো ও পরিপক্ব তালগাছের কাঠ সাল-সেগুনকেও হার মানায়। একাঠ যেমন শক্ত তেমনি দীর্ঘস্থায়ী। এক কালে গ্রামীণ জীবনে এই গাছ, গাছের ফল এবং রস ছিল অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু কালের নিয়মে অন্যান্য গ্রামীণ সম্পদের মত তালগাছও আজ বিলুপ্তির পথে। রাহানা গ্রামও এর বাইরে নয়- এই গ্রামে মাত্র কয়েকটি গাছ এখনো টিকে আছে। সেসবের মধ্যে দক্ষিণপাড়ায় ' তালতলা' র মাঠে তিনটি গাছ অর্ধশত বর্ষ

আয়ু নিয়ে এখনও দাঁড়িয়ে আছে। গাছ তিনটির মালিক হলেন আব্দুল হাফিজ মন্ডল নামে জনৈক ব্যক্তি। প্রসঙ্গত বলি, এই তিনটি গাছের তাল খুবই উৎকৃষ্ট মানের হয়। পূর্বপাড়ায় 'শানপুকুর' ধারে একটি মাত্র তালগাছ এখনও দাঁড়িয়ে আছে। সাত রাজার ধন এক মানিক! গাছটি বয়সের ভারে শীর্ণ তা বলাই বাহুল্য। গ্রামে আতাউল নামে জনৈক ব্যক্তির বাড়িতে একটি মধ্যবয়সী তালগাছ লক্ষ্য করা যায়। গাছটির বিশেষত্ব হলো- এটি এখনও বাবুই পাখিদের আশ্রয়-স্থল। সারা বছরই কিছু-না-কিছু বাবুই পাখির বাসা লক্ষ্য করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই বাবুই পাখি আশ্রয় এবং নিরাপত্তার অভাবে গ্রামবাংলা থেকে ক্রমশ বিলুপ্তির পথে।

বাগান: রাহানা একটি প্রাচীন জনপদ তা বলাই বাহুল্য। সেই প্রাচীন জনপদে ফলফলাদির প্রাচীন বাগান থাকবে না তা কখনো হয় নাকি! না, তা হয় না। আর তা হয় না বলেই রাহানায় প্রাচীন আম কাঁঠালের বাগান লক্ষ্য করা যায়। সেসব বাগানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ১। হাসনার বাগান। এই বাগানটি গ্রামের পশ্চিমাংশে অবস্থিত ছিল। হাসান নামক জনৈক ব্যক্তির ছিল বাগানটি। ৩০/৪০ টি বিশালাকৃতির আমগাছ বিশিষ্ট এই বাগানটি পরবর্তীকালে মালিকানা বদল হয়ে কাজী ফকির আহমদ তথা নুর উদ্দিন মন্ডলের সম্পত্তিতে পরিণত হয়। বছর চল্লিশ আগে আম গাছ গুলো কেটে ফেলা হয়। একটি প্রাচীন আমবাগানের ইতি ঘটে। এই বাগানটি ছাড়াও সুলতানের বাগান, নাসিরুদ্দিনের বাগান, রহিম বক্সদের বাগান ছিল উল্লেখ করার মতো আমবাগান। সেইসব প্রাচীন বাগানগুলো কালের নিয়মে ধ্বংস হয়ে গেছে। সেসবের জায়গায় উন্নত জাতের আমের কলম বসিয়ে নতুন বাগান তৈরি হয়েছে। বর্তমানে রাহানা গ্রামে এই ধরনের ২০/২৫ টি আমবাগান লক্ষ্য করা যায়।

গোরুহাট: বহুদিন আগে বর্তমান রাহানা মাদ্রাসার কাছে একটি 'গোরুহাট' ছিল। এখানে দূর-দূরান্ত থেকে গরু-বাছুর নিয়ে আসত এবং কেনাবেচা করত। সেই হাটটা বহুকাল আগেই উঠে যায়। কবে এবং কেন উঠে যায় সে ইতিহাস আজ আর জানা যায় না।

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

ভোজন রসিক: কালো দাস - ফকির দাসের বাবা সুকো কানা ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণির ভোজন রসিক। দেহে ছিল তার অসুরের মত শক্তি। তার সেই শক্তির বহু নজির তিনি দেখিয়েছেন। গ্রামের আবুল, আফতাব উদ্দিন হাজী সাহেব, আনোয়ার আলিও বিপুল পরিমাণে খেতে পারতেন।

সমাজ সেবক: রাহানা গ্রামে সমাজসেবা ও দানের ক্ষেত্রে হাজী মহম্মদ আলী উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর প্রচেষ্টায় রাহানা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। শুধু তাই নয়, উক্ত মাদ্রাসা যাতে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হয়ে উঠতে পারে তার জন্য তিনি তাঁর বড়পুকুরের ছয় আনা অংশ মাদ্রাসার নামে লিখে দেন। রাহানা প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি 'এজমালি' সম্পত্তি দান করেন। হাজী মহম্মদ আলির এইসব দানের কথা মাথায় রেখেই গ্রামের মানুষ তাকে মসজিদের সম্পাদক করেছিলেন। আর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা সমিতির তিনি ছিলেন অন্যতম সভ্য। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই তাঁর পুত্র হাজি ফকির আহমদ মসজিদের জন্য দশ শতক জমি দান করেছিলেন। তিনি মসজিদ সম্পাদকও হয়েছিলেন।

কাহারপাড়া: রাহানা গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে 'কাহার' সম্প্রদায়ের হিন্দুদের বাস। অতীতের কয়েক ঘর কাহার বর্তমানে একটি পাড়ার আকার ধারণ করেছে - কাহারপাড়া। একটি প্রশ্ন খুব স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়- মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামে কাহার সম্প্রদায়ের হিন্দুদের বসতি কীভাবে গড়ে উঠলো? এরা কি এখানকার আদিবাসিন্দা? নাকি অন্য কোথাও থেকে এসে এখানে বসতি গড়ে তুলেছিলেন? এলে, কবে আর কেনই বা এসেছিলেন? কি এদের পরিচয়?- এমন অনেক প্রশ্নই মাথাচাড়া দিয়ে ঠেলে ওঠে। আর এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে অবশ্যই অতীতে পাড়ি দিতে হবে। এখনো পর্যন্ত যা জানা যায় তা হল এই কাহার সম্প্রদায়ের হিন্দুরা বহিরাগত। কবে, কোথা থেকে এরা এসেছিলেন তার সঠিক তথ্য না জানা গেলেও এটা জানা গেছে রাহানার আদিবাসিন্দাদের অন্যতম জোরদার জমিদার ভুলু মোড়ল এদেরকে এনে গ্রামে জমি দিয়ে বসিয়েছিলেন। আর সেই বসানোর কাজটি হয়েছিল কমবেশি দেড়শো বছর আগে। ভুলু মোড়ল এদেরকে কোথা থেকে এনে বসিয়েছিলেন

তা আজ আর জানবার উপায় নেই, কাহার সম্প্রদায়ের মানুষেরা তাদের আদি বাসভূমির কথা বেমালুম ভুলে গেছেন। অদূর ভবিষ্যতে জানা গেলে তা অবশ্যই উল্লেখ করা হবে। জমিদার (আসলে মধ্যস্বত্বভোগী) ভুলু মোড়ল কেন এনে বসিয়েছিলেন তা মোটামুটি জানা গেছে। কারণটা হলো এই - অতীতে গ্রামাঞ্চলে যানবাহন বলতে ছিল মূলত গরুর গাড়ি। এছাড়া ধনীদের জন্য ছিল পাল্কি । এক কথায়, গরুর গাড়ি আর পাল্কিই ছিল অতীতে গ্রাম-বাংলার যানবাহন। গরুর গাড়ির গাড়োয়ান স্বজাতি মুসলিম মিললেও পাল্কি বাহনের বাহক মেলে না- পাল্কি সাধারণত বইত কাহার সম্প্রদায়ের হিন্দুরা। জমিদার ভুলু মোড়লের বাড়িতে পালকি থাকবে এ তো স্বাভাবিক ব্যাপার। আর এই পাল্কি বহন করবার জন্য বাহক দরকার। সেই বাহকেরাই হলেন এই কাহাররা। কাহারদের দূর থেকে এনে এখানে বসাবার এটা যেমন একটি কারণ আর একটি কারণও ছিল। কারণটি হলো-জমিদারি সুরক্ষা। হ্যাঁ, এই কাহারদের আরেকটি বড় পরিচয় হলো-এরা হলেন সুদক্ষ লেঠেল বা লাঠিয়াল। দাঙ্গা-হাঙ্গামার মহড়া নিতে এদের জুড়ি মেলা ভার! আর একথাও একশো ভাগ ঠিক যে, বিষয় বিবাদ ডেকে আনে। জমিদারি হল সেই বিষয়ের বিষবৃক্ষ। এই বিষবৃক্ষের জন্যই দিনরাত দাঙ্গা-হাঙ্গামার মুখোমুখি হতে হয় জমিদার/ গাঁতিদার/ তালুকদার/ মধ্যস্বত্বভোগী- সকলকেই। ভুলু মোড়ল তা থেকে আর বাদ যাবেন কেন! তাঁরও তো জমি, জমির সীমানা, বাঁশঝাড়, পুকুর, বিল - দখল-বেদখল নিয়ে কারবার। প্রতিপক্ষ তো থাকবেই আর তাদের মোকাবিলাও তো করতে হবে! কথায় বলে- লাঠি যার জমি তার। অতএব, বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করতে এবং তা বাড়াতে লেঠেল ছাড়া গতি নেই। সুতরাং পুষতেই হবে। আর এই কারণেও ভুলু মোড়ল কাহারদের এনে জায়গা দিয়ে নিজ গ্রামে বসিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত বলি, অন্যান্য জমিদার/ গাঁতিদার/ তালুকদার/ মধ্যস্বত্বভোগীদের মত ভুলু মোড়লও পাল্কিবাহক তথা লেঠেল দের এনে একেবারে সদরে রাস্তার ধারে বসালেন অথচ নিজে বাস করতে লাগলেন একেবারে গ্রামের ভিতরে মাঝখানে যেখানে যাতায়াতের পথ (রাস্তা) বড় সংকীর্ণ, মূল সড়কের সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন- এমন এক ঘুলঘুলির মধ্যে বাস করতে লাগলেন ভুলু মোড়ল। কেন? তাঁর কি সুপ্রশস্ত সড়কের পাশে কোন জায়গা ছিল না? উত্তরে বলি- নিশ্চয়ই ছিল, গ্রামের সম্পত্তির অধিকাংশ তো তাঁর। তিনি ইচ্ছা করলেই ৩৪ নং জাতীয় সড়কের ধারে এসে বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ করে বাস করতে পারতেন। কিন্তু তা করেননি। যে যুক্তিতে অন্যান্যরা করেননি তিনিও ঠিক সেই একই যুক্তিতে রাস্তার ধারে অট্টালিকা নির্মাণ

করেননি। যুক্তিটা হল এই - বাইরের শত্রু যদি আক্রমণ করতে আসে তবে প্রথমেই ওই কাহারদের সামনে পড়তে হবে। তাদের সঙ্গে লড়াই করে তবে জমিদার-মহলে ঢুকতে হবে। অর্থাৎ এই কাহারেরা হলেন জমিদারের রক্ষাকবচ। কাহার-লেঠেল সুরক্ষা বলয়ের মধ্যে নিরাপদে-নিশ্চিন্তে জমিদার বাবু জমিদারি চালাতে পারেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: ১। খলিল আহমদ ২। সেখ সাইফুদ্দিন ৩। কামরুল মন্ডল ৪। নুর উদ্দিন মন্ডল ৫। গৌরচন্দ্র মাল

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

আঁকিবুঁকিতে কলরব

দেবজ্যোতি গোস্বামী

আলিসা গাজী

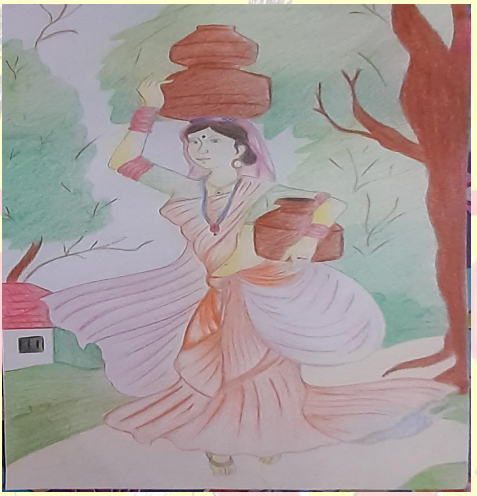

মধুমিতা ধাড়া

আলিসা গাজী

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

পায়েল ঋষি দাস

রাফিকা খাতুন

সাহিত্য সম্ভার ২০২০

বৃহত্তর কলরব পরিবার

সফল হাউলি, বসিরউদ্দিন মন্ডল, আলফা গাজী, আলিশা গাজী, তানিয়া সুলতানা, মুন্সি শবনম, সবনম সুলতানা, মধুমিতা ধাড়া, সুমাইয়া ইয়াসমিন, রুবিনা ইয়াসমিন, সবনম সুলতানা, জয়দীপ প্রামানিক, অরিজিত বিশ্বাস, পৌলমী ঘোষ, জসীমউদ্দীন, জসিমউদ্দিন মন্ডল, সহেলী পারভীন, সুজানা খাতুন, অর্পিতা কর্মকার, প্রিয়া মোড়ল, তুলি মুখার্জি, অনিশ কর্মকার, রাফিকা খাতুন, পায়েল ঋষি দাস, সোহানা ইয়াসমিন, আশিক উল্লাহ, চৈতালি বেরা, বিদিশা পাড়ুই, রুকসানা খাতুন, অপর্ণা সামন্ত, শান্তনু ঘোষ, সারফাজ উদ্দিন ইসলাম, সাহিল হক, জুবের মণ্ডল, হাসানুর মণ্ডল, আজিজুল মণ্ডল, নিসার হামদুন, ডলি শবনম, জাহেদুর রহমান, নেহালা বেগম।

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

১) সুরুচি সম্পন্ন যে কোন লেখা ' কলরব' - এ প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে।

২) কবিতা ৪০ লাইনের ও গল্প এবং প্রবন্ধ ৩০০০ শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৩) Unicode font - এ মেইল বডিতে টাইপ করে বা ডকুমেন্ট ফাইল করে পাঠাতে হবে।

৪) লেখা সম্পূর্ণভাবে নির্বাচিত হবে নির্বাচক মণ্ডলীর দ্বারা। লেখা ছাপা না হলে ' টিম কলরব' লেখা ফেরত ও কোন রকম ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য বাধ্য থাকবে না।

৫) লেখা জমা বা যে কোন রকমের পরামর্শ দেওয়ার প্রদান বা আর্থিক সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন -

কলরব এডুকেশনাল অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটি

এন.এইচ. ৩৪, আমডাঙ্গা, উত্তর ২৪ পরগনা

পিনঃ ৭৪৩২২১, পশ্চিমবঙ্গ

ই-মেলঃ kolorobteam@gmail.com

বথ্যাঃ ৮২৭৬৮৩৯৩৮০

সাহিত্য সম্ভার ২০২০